

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

(ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা)



শ্রীবিনয়কুমার সরকার

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

মূল্য ২।০ আনা

প্রকাশক :—

ঐনলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি, এ

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

২৭নং (মোতাল) কলেজ ষ্ট্রীট দার্কট

কলিকাতা

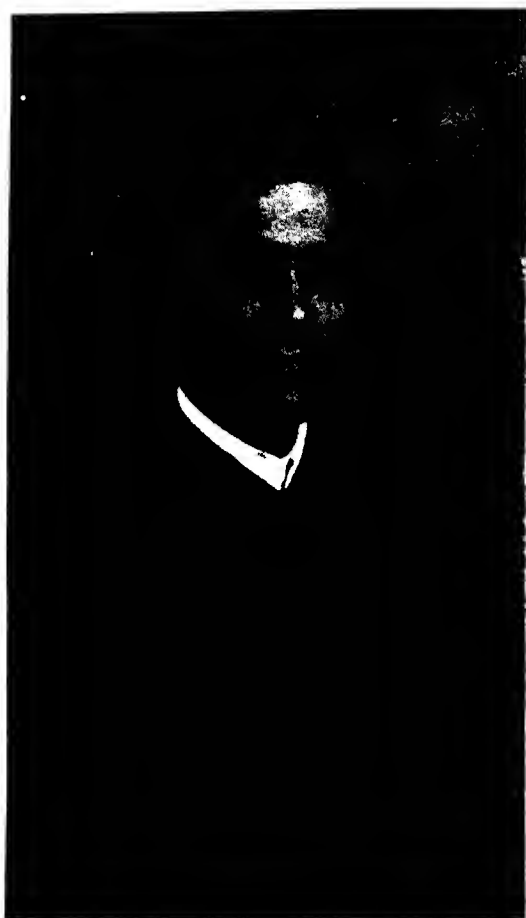
প্রিন্টার :—

ঐশ্বর্যচন্দ্র মাস্তা

বেঙ্গল প্রেস

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা



श्रीदिनय्यकुमार सरदार

অনুবাদকের ভূমিকা

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিড্রিশ এঙ্গেলস্

ধন-বিজ্ঞানে যুগান্তর

(১)

ভারতে যাহারা ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট জাম্মাণ্ লেখক ফ্রিড্রিশ (ফ্রেডরিক্) এঙ্গেলসের রচনাবলী অজানা জিনিষ নয়। এঙ্গেলস্-প্রণীত “বিলাতী মজুর-শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা” নামক গ্রন্থ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনগণের পারিবারিক আয়-ব্যয় এবং সমাজের অন্যান্য আর্থিক তথ্য বিষয়ে জগতের সর্বত্র জ্ঞানলাভের যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহার জন্য সুধীগণ এঙ্গেলসের এই গ্রন্থের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। নরনারীর জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দতা মাপিবার বাস্তব যন্ত্র এঙ্গেলসের প্রদর্শিত পথেই আজও সকল মহলে কায়ম করা হইতেছে।

জাম্মাণির সমাজ-চিন্তায় এঙ্গেলসের ঠাই খুব উচু। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দর্শনে দুইজন জাম্মাণ্, ইহুদী ইয়োরোমেরিকায় নামজাদা হন। একজনের নাম কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩)। দার্শনিক হেগেলের আলোচনা-প্রণালীর বিকস্কে কলম ধরিয়া ইনি ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে এক

নবযুগের সূত্রপাত করেন। অধিকন্তু খাঁটি ধন-বিজ্ঞান এবং সমাজ-তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বহু বিষয়ে ইহার রচনাবলী জার্মান পণ্ডিত-মহলের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে।

মজুর এবং দরিদ্র লোকেরা ক্রমশঃ কার্ল মার্কসকে যুগাবতার-জ্ঞানে পূজা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান আজকাল কেবলমাত্র জার্মানিতেই আবদ্ধ নয়। ইয়োৰোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড,—জগতের সকল দেশেই—“ওঁ কার্ল মার্কসায় নমঃ” বলিয়া মজুরেরা, মজুর-প্রতিনিধিরা এবং সমাজ-লেখকেরা কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে।

কার্ল মার্কসের সমঘকার অপর জার্মান-ইহুদী সমাজ-দার্শনিকের নাম ফাডিনাণ্ড লাসাল্ (১৮২৫-১৮৬৭)। ১২১৮ সালে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া এবার্টের সভাপতিত্বে যে রাষ্ট্রীয় দল জার্মানিতে রাজত্ব করিতেছে সেই দলের আদি পুরুষই লাসাল্। জার্মান জাতি লাসালকে “সোসিয়ালডেমোক্রেটিশে পার্টাই”র (বা সমাজ সাম্যের দলের) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানে। ১৮৬৩ সৃষ্টাকে জার্মানিতে সর্বপ্রথম মজুর-পরিষৎ স্থাপিত হয়।

মজুর-সমাজকে আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল লাসালের জীবনের সাধনা। লাসাল্ প্রাচীন গ্রীক-দর্শন এবং রোমান আইনকানুন বিষয়ক গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুখী-মহলে যশ পাইয়াছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতি মজুরি এবং অন্ত্যস্ত আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণেও তাঁহার দক্ষতা সেইরূপ যশই পাইয়াছে।

মার্ক্সের সঙ্গে লাসালের কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রে কাজকর্মও চলিয়াছিল। লাসাল্‌ মার্ক্সকেই গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু-শিষ্যরূপ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ মার্ক্সে এবং এঙ্গেল্‌সেই বেশি মাত্রায় পাকিয়া উঠিয়াছিল। মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স্‌ “হরিহরআত্মা” ছিলেন, এইরূপ বলিলেই ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক বুঝা যাইবে। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এঙ্গেল্‌স্‌ ছিলেন খৃষ্টান, অর্থাৎ ইহুদী নন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের প্রথম দেখা হয়। মার্ক্সের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর; এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহার দুই বৎসরের ছোট। ইহারা দুইজনে মিলিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে “জুনিয়ার নিখ্যাতিতদের নিকট” কমিউনিষ্টদের (ধন-সাম্য-পন্থীদের) ইস্তাহার প্রকাশিত করেন। মার্ক্স-প্রবর্তিত একাধিক সংবাদপত্রে এঙ্গেল্‌স্‌ সর্বদাই লেখকরূপে হাজির থাকিতেন। মার্ক্সের মৃত্যু পর্যন্ত পূরাপুরি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দুই জনের বন্ধুত্ব বজায় ছিল।

এই চল্লিশ বৎসরের ভিতর কার্ল মার্ক্সের নামে বহুসংখ্যক পুস্তিকা, বক্তৃতা, গ্রন্থ, সমালোচনা, তর্কবিতর্ক ইত্যাদি রচনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির কোন্‌ কোন্‌টায় কতখানি লেখা এঙ্গেল্‌সের এবং কতখানি মার্ক্সের নিজের তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে গভীর গবেষণায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই তথ্য হইতেই স্বাধাণির ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং জুনিয়ার ধন-বিজ্ঞানে, সমাজ-তত্ত্বেও “দরিদ্র নারায়ণের” পূজার এঙ্গেল্‌সের কৃতিত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

কার্ল মার্কসের “ডাস্ কাপিটাল্” (বা পুঁজি) গ্রন্থে প্রচলিত ধন-বিজ্ঞান-বিজ্ঞার তীব্র সমালোচনা আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাইবার পূর্বেই মার্কসের মৃত্যু হইয়াছিল। সম্পাদনের ভার ছিল এঙ্গেল্সের হাতে। এঙ্গেল্সের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই দুই খণ্ডে এঙ্গেল্সের স্বাধীন হাত প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যে গ্রন্থ মার্কস-নীতির গীতাস্বরূপ তাহার অনেক স্থলেই এঙ্গেল্সের কলম কাজ করিয়াছে।

এঙ্গেল্সের গ্রন্থ

(১)

যখনই আজকাল যেখানে মার্কসকে যুগাবতার বলি হইতেছে, সেখানে তখনই এঙ্গেল্সও পূজা পাইতেছেন। এই সূত্রে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেল্স যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে “ডার উরশুং ডার কামিলিয়ে ডেস্ প্রিকাট্ আইগেণ্টুম্ উণ্ড্ ডেস্ ষ্টাটেন্” (পরিবার, নিজস্ব এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি) নামে। তাহার এক বৎসর পূর্বে মার্কসের মৃত্যু হইয়াছে।

এঙ্গেল্স লিখিয়াছেন :—“এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমি প্রকারান্তরে একটা উইল-মার্কিক কাজ করিতেছি। মর্গ্যানের অমূল্যজ্ঞানগুলিকে ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন একজন যে-সে লোক নন। তিনি স্বর্গগত মহাপুরুষ কার্ল মার্কস্। ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা

মার্কসের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালী। এই স্খাখ্যা প্রণালী কুটাইয়া তুলিতে আমিও অনেক কাল ধরিয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই প্রণালী দার্শনিক সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তিত হয়।

“এক্গে মর্গ্যান্ আমেরিকার আদিমবাসীদিগের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সেই প্রণালীই পুনরায় আবিষ্কার করিয়াছেন। “বার্ক্সার” সভ্যতার সঙ্গে “উংকর্বে”র যুগের তুলনায় মর্গ্যান্ প্রায় মার্কসের সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। এই কারণেই মার্ক্স মর্গ্যানের তথ্যগুলি গ্রহণ করিয়া নিজ দর্শনকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

“আমার বন্ধুবর নিজের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিয়া বাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামূরূপ কাজ করিয়া আমি একটা যথাসাধ্য ঠাই পূরণের ব্যবস্থা করিলাম। তবে মার্ক্স মর্গ্যানের কথা লইয়া যেখানে যেখানে টিখনী বা টীকা করিয়া গিয়াছেন সেগুলি পূরাপূরি ব্যবহার করিতে ছাড়ি নাই।”

“কাজেই বর্তমান গ্রন্থও মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স্‌ দুই জনেরই সম্মান এইরূপ ধরিয়া না লইলে গ্রন্থের জন্মকথা পরিষ্কার হইবে না।”

(২)

এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহার রচনাকে “পরিবার, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি” নামে প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থে প্রথম বিবৃত হইয়াছে পরিবার বা বিবাহ পদ্ধতি ও যৌন সম্বন্ধের ইতিহাস। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় গেন্‌স্‌ বা গোষ্ঠী-প্রথার সমাজ-শাসন।

তাহার জন্ম আমেরিকার “ইণ্ডিয়ান” (এবং বিশেষরূপে ইরোকোয়া) জাতির প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনায় ঠাই পাইয়াছে।

এঙ্গেল্সের তৃতীয় কথা গোষ্ঠীর ভাঙন বা রাষ্ট্রের জন্ম। ইণ্ডিয়ান সমাজের লোকেরা গোষ্ঠী-কেন্দ্র ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদের সমাজে রাষ্ট্রের চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের জন্ম-কথা টুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্ম প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক, রোমান, কেন্টিক এবং জার্মান জাতির স্বতিশাস্ত্র ও সংহিতাগুলি আলোচনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়গুলার তালিকা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই গ্রন্থের মুখ্য কথা নয়। মুখ্য কথা পরিবার, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র এই তিন জীবনকেন্দ্রের ইতিহাস। এই কারণে বাংলা ভাষায় এঙ্গেল্সের রচনা “পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের জন্ম-কথা” নামে প্রচারিত হইল।

নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি গ্রন্থে মুখ্য কথা নয় বটে, কিন্তু এই বিষয়ই এঙ্গেল্সের “প্রাণের কথা”। সেই প্রাণের কথাটা গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের যেখানে সেখানে পাঠকের কান স্পর্শ করে। বস্তুতঃ ধনদৌলতের আকার-প্রকার মানব-জাতির শৈশব-কালে কখন কেন ও কিরূপ ভাবে বদলাইয়াছে তাহার আলোচনা করাই এঙ্গেল্সের উদ্দেশ্য ছিল। আর্থিক ইতিহাসের কোন্ স্তরে ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে কথা এই গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে বিবৃত হইয়াছে।

খাটি ধনবিজ্ঞান-বিজ্ঞা বলিলে যে সাহিত্য নজরে আসে, এই গ্রন্থকে সেই সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলিবে না। এই রচনা নৃতত্ত্ববিজ্ঞার মহলেই ঠাই পাইবার যোগ্য। নৃতত্ত্বের

তথ্যগুলার উপরে আর্থিক ব্যাখ্যা চালাইলে যে-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা এঙ্গেল্‌স্‌ এখানে সেই তত্ত্বের প্রচারক। সমাজ-দর্শন, সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বস্তু প্রাচীন মানবের জীবন-কথায় বা পুরাকাহিনীতে যতখানি পাওয়া যাইতে পারে, সেই দর্শন ও সেই ইতিহাসই বর্তমান কেতাবের দান।

“নৃতত্ত্ব” বিজ্ঞা

নৃতত্ত্ব দুই শাখায় বিভক্ত :—শারীরিক ও সামাজিক। এক শাখায় পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপিয়া-জুপিয়া তুলনা করিয়া মাহুষের উৎপত্তি, শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞাকে কম্পারেটিভ অ্যানাটমির (বা তুলনা-মূলক অস্থি-বিজ্ঞার) এবং জীব-বিজ্ঞানের জের বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অপর বিভাগের পণ্ডিতেরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নর-নারীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, লেন-দেন, স্বতীশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, স্ব-কু ইত্যাদি জীবনের সকল খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। সহজে এই বিভাগের নৃতত্ত্ববিদগণকে লোকাচারতত্ত্ববিৎ বলা চলে। ধর্ম, শিল্প, ধন-দৌলত, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা-মূলক বিজ্ঞানগুলি সবই এই সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যার সামিল।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, “ইতিহাস” নামে বা-কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে সবই নৃতত্ত্ব। কিন্তু পারিভাষিক হিসাবে এইখানে আর-একটা প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে। অতি সাবেক কাল, মাছাতার আমল, প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ইত্যাদি সময়কার মানব-কথা অর্থাৎ মানব-সভ্যতার গোড়াটা লইয়া বাহারা অহুসন্ধান চালাইতেছেন একমাত্র তাঁহাদিগকেই নৃতত্ত্বের গবেষক বলা হয়।

অধিকন্তু বর্তমান জগতের বিভিন্ন জনপদে যে সকল “আদিম” অহুসৃত, অসভ্য জাতি “সভ্যতার শৈশবাবস্থায়” জীবিত রহিয়াছে তাহাদের আচার ব্যবহার এবং স্বধর্মের সকল প্রকার অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে সকল অহুসন্ধানকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁহারাও নৃতত্ত্ববিদরূপে পরিচিত। এই হিসাবে পর্য্যটক, ভৌগলিক আবিষ্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক নৃতত্ত্বের সংসারে নাম করিয়া থাকেন।

মর্গ্যানের সিদ্ধান্ত

(১)

মর্গ্যান্ লোকটা কে? চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই লেখক আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে তথ্য অহুসন্धानে ব্যাপৃত ছিলেন। ইরোকোআদের কুটুম্ব-সম্বন্ধ বা আত্মীয়তার প্রথা সম্বন্ধে ইনি ১৮৭১ সালে যে-সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে গোটা লোকাচারতত্ত্ব, বিবাহ-পদ্ধতি এবং সামাজিক নৃতত্ত্বে এক নবযুগ সূত্র হয়। ইহার সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম “এন্থ্রোপ সোসাইটি” (বা প্রাচীন সমাজ)। “স্ট্রাচ্ছেজ” (বা সহজ) অবস্থা হইতে মানবজাতি কোন্ পথে “বার্কার” সভ্যতা অতিক্রম করিয়া “উৎকর্ষে”র স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে সেই তথ্যগুলি নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থ ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মর্গ্যানের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, মানব-সমাজে এককালে

“দলগত” বিবাহ অর্থাৎ অবাধ যোনিসংস্রব প্রচলিত ছিল। এই অবাধ সংস্রবে বিধি-নিবেধ কার্যে হইতে থাকে। ক্রমশঃ গেন্‌ বা গোষ্ঠী-প্রথা দেখা দেয়। গোষ্ঠী-নীতি আবিষ্কার করা মর্গ্যানের দ্বিতীয় কীর্তি। গোষ্ঠী সমরকুজ জীবন-কেন্দ্র। এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ। গোষ্ঠী পরিচালিত হইত প্রথম প্রথম নারীর তরফ হইতে “জননী-বিধি”র নিয়মে। সেই “জননী-বিধির” গোষ্ঠী আজও চলিতেছে ইরোকোয়া সমাজে এই গেল মর্গ্যানের তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

“নারীর আমল” গোষ্ঠীধর্ম হইতে পরে উঠিয়া যায়। তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় “পুরুষ-বিধি” এবং পুরুষাধিপত্য। গ্রীক-রোমান্ এবং জার্মান্ সমাজগুলার প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্রে পুরুষ-প্রাধান্তশীল গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানই দেখিতে পাওয়া যায়। মর্গ্যানের এই আবিষ্কার প্রাচীন ইরোরোপের ইতিহাস-রচনায় যুগান্তর আনিয়াছে।

(২)

এই চার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই মর্গ্যান্ আলোচনা খতম করেন নাই ! “উৎকর্ষে”র যুগ সম্বন্ধে অর্থাৎ যে যুগের ভরা জোআরে বর্তমান জগতের “সভ্য” নরনারী বসবাস করিতেছে—সেই যুগের জীবন-যাত্রাকে ইনি চরম ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। লাভের লোভই এই যুগের ধনোৎপাদনের গোড়ার কথা,—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ধনজীবীরা আর কিছু চিন্তা করে না,—ইহাই মর্গ্যানের মতে উৎকর্ষশীল মানবের মূল মন্ত্র। স্বরাসী সোশ্যালিষ্ট ফুরিয়ে যে-ভাবে বর্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, মর্গ্যান্ও সেইরূপই করিয়াছেন।

“উৎকর্ষে”র যুগকে গালাগালি দেওয়াই মর্গ্যানের শেষ কথা নয়। একটা ভবিষ্য সমাজের স্বপ্নও তাঁহার মাথায় ছিল। কোথায় একটা অল্পমত আদিম অসভ্য জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বৃত্তান্ত-প্রকাশ এবং প্রাচীন ইয়োরোপের মাঙ্কাতার আমলের গ্রীক-রোমান্ জ্ঞানার্হাদের জীবন কথার আলোচনা, আর কোথায় বর্তমান মানবের জগৎ সমাজসংস্কার, পরিবার-সংস্কার, আর রাষ্ট্র-সংস্কারের মোসাবিদা ! সমাজ-সংস্কারক হিসাবে মর্গ্যান প্রায় মার্কসের বিপ্লব-পথেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ, মর্গ্যানের মতে ভবিষ্য মানব সেই মাঙ্কাতার আমলেরই যৌথসম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীধর্মের এক নবরূপ প্রকটিত করিবার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পাণ্ডিত্য

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। ইহার ইংরেজি সংস্করণ বাহির হয় ১৯০২ সালে। অত্যাশ্চর্য ভাষায় ইহার তর্জমা পূর্বেই হইয়াছিল। কিন্তু কি মর্গ্যানের আবিষ্কারগুলো, কি এঙ্গেল্‌স-মার্ক্‌সের আর্থিক ব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই।

সেকালের কোনো ভারতীয় লেখক এই সকল তথ্য বা তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবিষয়ক আর্থিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলো এই মর্গ্যান-মার্ক্‌স-প্রবর্তিত সমাজ-বিজ্ঞানের আওতায় আনিয়া পরখ করিতেও কোনো ভারতীয় গবেষক চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। রামমোহন, বঙ্কিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ

বিবেকানন্দ ইত্যাদির প্রবন্ধাবলীতে সে যুগের দৌড় জরীপ করা চলিতে পারে।

ভারতে যা-কিছু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অল্পসন্ধান প্রায় সবই মাত্র ১৯০৫ সালের সম সম কালে এবং পরে দেখা দিয়াছে। রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র ইত্যাদির ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অধিকন্তু বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া যুবক-ভারত ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যার জন্তও সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইয়োরামেরিকান গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হইতেছে! কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে ভারতীয় মাক্কাতার যুগকে যাচাই করিবার দিকে অথবা মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বুঝিবার দিকে কোনো চেষ্টা আজ পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশের কুজাপি ত নাই-ই, ভারতের কোথাও দেখি না।

বিষয় "প্রাচ্যামি"

(১)

একদম নাই বলিলে ভুল হইবে। কেননা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকদের কয়েকখানা ইংরেজি কেতাব বাহির হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে যে যে অংশ প্রাচীন তথ্যগুলার খাঁটি বিবরণ মাত্র সেই সকল অংশ প্রত্নতত্ত্ব-হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানেই বিদেশী—বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান তথ্যের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনার ইঙ্গিত মাত্র আছে সেইখানেই গোড়ায় গলদ ধরা পড়ে।

লেখকগণ প্রাচীন ভারতকে বিলকূল নষ্ট-চাড়া ভূখণ্ডরূপে প্রচারিত করিবার জন্য বিজ্ঞান-সাধনায় ত্রুটি হইয়াছেন। অথবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলার সন-তারিখ, “জাতিভেদ”, স্তর-বিজ্ঞান বা যুগধর্ম সম্বন্ধে ক্রক্ষেপ না করিয়াই ইহারা ভারতীয় “অদেবী সমাজের” স্বধর্ম, বিশেষত্ব, স্বাভাব্য ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ যে-সকল অচুঠান-প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সকল জাতিরই “সামান্য ধর্ম” মাত্র সেইগুলোকেও অতি মাত্রায় ভারতাত্ম্য ও প্রাচ্য-জীবনের প্রতিমূর্তিরূপে প্রচারিত করা হইতেছে। চিত্রকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি “রসে” সমালোচনায়ও এই বিষাক্ত “প্রাচ্যামি”র জয় জয়-কার চলিতেছে।

(২)

এইরূপ ভ্রমাত্মক আলোচনা পথ দেখাইয়াছেন ইয়ো-রোমেরিকার প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ “ওরিয়েন্টালিষ্ট” পণ্ডিতগণ। তাঁহাদের জুড়িদারস্বরূপ পাশ্চাত্য, বিজ্ঞতা-জাতীয়, সাম্রাজ্য শাসক, “কলোনিয়ালিষ্ট” (উপনিবেশতন্ত্রী) রাষ্ট্রকেরাও সমাজ-বিজ্ঞানের বর্তমান দুয়বস্থার জন্য দায়ী। এই দুই শ্রেণীর লোক প্রায় এক শ’ বৎসর ধরিয়া পূর্বকে পশ্চিম হইতে ফারাক্ করিয়া রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুনিয়ার যেতাজ-প্রাধান্তের যুগে, যেতাজদিগকে “একঘরে” করিয়া রাখা যেতাজ বিজ্ঞান-সেবীদের স্বার্থ এবং স্বধর্ম। পশ্চিমের চিন্তা আর পূর্বের চিন্তে কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য আছে এ কথা স্বীকার করিলে পশ্চিমাদের ইচ্ছা রক্ষা হয় না। পশ্চিমাদের এই ঘোরতর প্রাচ্য-বিশেষই তথাকথিত “প্রাচ্যামি”র জনক।

তুলনামূলক সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় তুল কেম অবশ্য
করিয়াছে এবং এই বিজ্ঞানের সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে
পারে, তাহার আলোচনা মৎপ্রণীত “ফিউচারিজম্ অব ইয়ং
এশিয়া” বা “যুবক এশিয়ার ভবিষ্যবাদ” (লাইপ্‌সিগ্‌ ১৯২২)
গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গেল গোটা সভ্যতা-বিজ্ঞান বা
সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা।

সমীপ ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও দিকান্তগুলার কিম্বৎ
বাহির করিবার জন্য “পলিটিকাল ইন্‌স্টিটিউশান্‌স্‌ অ্যাণ্ড
গেয়েরিজ্‌ অব্‌ দি হিন্দুজ্‌” অর্থাৎ “হিন্দুজাতির শাসন-পদ্ধতি
ও রাষ্ট্রনীতি” (লাইপ্‌সিগ্‌ ১৯২২) নামক গ্রন্থ প্রচারিত
হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতসম্প্রদায় ভালায় মন্ডয় গ্রীক,
রোমান্‌ এবং জার্মান্‌দেরই সমকক্ষ ছিল—এই কথা সেই গ্রন্থের
প্রাণ। বর্তমান ভারত অথবা ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে এই যেভাবে
কোনো কথা বলি নাই।

ভবিষ্যবাদের দর্শন

ভবিষ্য ভারত কোন্‌ পথে চলিবে ? এই সম্বন্ধে যাহার যেরূপ
খুশী তিনি সেইরূপ আদর্শ প্রচার করিতে অধিকারী। গোটা
হুনিয়া কোন্‌ পথে চলিবে ? এই সম্বন্ধে যেমন প্রত্যেক লেখক,
সমাজ-সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক বা প্রপাগাণ্ডিষ্ট নিজ নিজ মত জাহির
করিতো—সমগ্র সম্বন্ধেও ভবিষ্যবাদীরা সেইরূপ করিবে ইহা
স্বাভাবিক। স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিবে কে ? যাহার মাথায়
কিছু কিছু মগ্জ আছে, সেই এক-একটা দল পুঙ্ক করিতে
অধিকারী।

কিন্তু তাহা বলিয়া কোনো-একটা পথকে “পূর্ববী” এবং অপর কোনো পথকে “পশ্চিমা” দাণে চিহ্নিত করিতে বসিলে তর্ক-বিতর্কের আখড়ায় আসিয়া পাক্সা কষিতে হইবে। এই আখড়ায় আদর্শ, ভাবুকতা, মানবজাতির আশা, সমাজ-সংস্কারকের স্বপ্ন বা পীরবরের বাণী খাটে না। এখানে খাটে কেবল তথ্য, বাস্তব তথ্য, যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতেছে তাহার নিরেট বিবরণ। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় সকল প্রকার জীবন-কেন্দ্রের সন-তারিখ-সম্বন্ধিত এবং দফার দফায় তুলনা-মূলক ইতিহাস বা নৃতত্ত্ব।

ধরা যাউক যেন চতুর্থা চালাইয়াই ভবিষ্য ভারত স্বর্গে উঠিবে। অথবা যেন পল্লী-কেন্দ্রেই ভারতের ভবিষ্য-বিকাশ ঘটিতে বাধ্য অথবা যেন কুটীর-শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, অথবা যেন ভবিষ্য-ভারতে রাষ্ট্র শাসন চলিবে পল্লী-পঞ্চায়তেরই বিধানের। ভবিষ্যবাদীরা এই চার দফায় ভারতীয় জীবন গড়িয়া তুলুন—আপত্তি কি? কিন্তু এই চার দফার কোনোটাকে ভারতীয় “আধ্যাত্মিকতার”ই বিশিষ্ট আবিষ্কার বলা যাইতে পারে কিসের জোরে? এই “চার মহা সত্য” জগতের অন্যান্য দেশে কোনো কোনো যুগে নরনারীর জীবন-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে নাই কি?

এই “সত্য চতুষ্টয়”ই যদি আধ্যাত্মিকতা এবং মানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন হয় তাহা হইলে দুনিয়ার আদিম, অসভ্য “বার্বার,” অহুন্নত জাতিগুলা চরম মাজায় আধ্যাত্মিক এবং সভ্যতাসীল নয় কি? তাহা হইলে প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক, রোমান, আর্দাণরা এবং মধ্য যুগের পর ফ্যাক্টরি যুগের কলচালিত শিল্প-

ব্যবহার আমল পর্যন্ত ইয়োরোপীয় খুঁটানরা আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে কেন ?

তাহা হইলে পাশ্চাত্য-সংসারের সোশ্যালিষ্ট, পন্থীরা এবং বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট বা যৌথ-সম্পত্তি-পন্থী দনসাম্যধর্মীরা কি দোষ করিল ? তাহা হইলে লেনিন্-ট্রট্‌স্কিপ্রবর্তিত বোলশেভিক্‌ ক্রিয়া কম-সে কম আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে চরমে গিয়া ঠেকে নাই কি ? তাহা হইলে লেনিন্-ট্রট্‌স্কির “গুরু গুরু” জার্মাণ্-ইহুদীর বাচ্চা কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এবং ভারত-ধর্মের প্রতিমূর্তি নয় কি ? পূর্নই বা কোথায় ? পশ্চিমই বা কোথায় ?

তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হইলে ভারতবাসী নিজ নিজ স্বাভি-নীতি-ধর্ম-অর্থ-কাম-মোকশাগুণার দিকে এক নতুন চোখে দৃষ্টিপাত করিতে সুরু করিবে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে যুবক-ভারত বহু বুজ্‌কুকি এবং কুসংস্কার বর্জন করিতে শিখিবে। তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান-বিজ্ঞা কিছু কিছু করিয়া ভারত-সন্তানের পেটে পড়িতে থাকিবে।

মর্গ্যান, মার্ক্‌স্‌, বা এঙ্গেল্‌স্‌ কাহারও মত বা বাণীই বেদ-বাক্য নয়। সকলের কথাই তথ্যের জোরে কবিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু ইহাদের রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের সমাজ-চিন্তা পুষ্ট হইয়াছে। এখনো এইগুলার দাম বিজ্ঞানের বাজারে ঢের। এই কারণে ভারত-সন্তানের পক্ষে এইগুলা জানিয়া রাখা দরকার। ১৯২৪ সালের পূর্বে এঙ্গেল্‌স্‌

গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য কর। এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থ এতদিনে বাংলা ভাষায় পাওয়া উচিত ছিল।

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে “প্রাচীন সমাজ” সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। সম্ভ্রুতি কয়েক বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে এই সকল গবেষণার ফল নানা গ্রন্থে প্রচারিত হইতেছে (১৯২০-২২) রবার্ট লোহিস, আর্থার গোডেনহাইজার এবং মিনি গডার্ড এই তিন জন লেখকের রচনাবালী পাঠ করিলে মর্গ্যানের পরবর্তী কালের সকল সিদ্ধান্ত ইংরেজিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের চূষক-প্রকাশ এই ভূমিকায় চলিতে পারে না।

ইতিহাসের “আর্থিক ব্যাখ্যা”

(১)

মানব-জাতির শৈশব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা এঙ্গেলসের গ্রন্থের প্রথম কথা। তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস হিসাবে এই রচনা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর এক তথ্য হইতে এই কেতাব সুধী-মহলের শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। সে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা বা সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার তরফ্।

এই “আর্থিক ব্যাখ্যা” “ভৌতিক” ব্যাখ্যা ইত্যাদি ধরণের “ব্যাখ্যা”টা কি চীজ? এঙ্গেলসের গ্রন্থ স্বয়ংই এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রয়োগ-ক্ষেত্র। কেতাবটা ঘাটিলেই “ফলেন পরিচীযতে।” সেই ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই কেতাব বাংলায় দেখা দিল।

ভারতবাসীর পক্ষে “আর্থিক ব্যাখ্যা” ইঙ্গম করা কিছু কঠিন। কেননা লেখায়, বক্তৃতায়, পাঠশালায়, বাক্যবিতণ্ডায়, কবিতায়,

ইতিহাসে, খবরের কাগজে, মায় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সভায় সভায় ও আমাদের পণ্ডিত এবং জননায়কগণ আমাদের কাছে দুই পুরুষ ধরিয়া একটা মাত্র বুখ্‌নি শেখাইয়া আসিয়াছেন। সেই বুখ্‌নির মোটা কথা এই—“হিন্দু-মুসলমান আমলে নর-নারীরা ইহলোকের ধার ধারিত না। তাহারা পরলোক লইয়াই মগ্‌ণ থাকিত। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ ছিলেন প্রামাণ্য আত্মিক। ভৌতিক জগৎটা তাহাদের জ্ঞান ও কর্মের বহির্ভূত ছিল। যদিও বা কিছু অন্তর্গত ছিল তাহাও ধর্মব্যবস্থার মধ্যে নয়।”

(২)

প্রাচীন ভারতের লোকগুলা যে মাছুষ ছিল, ইহাদের যে রক্ত-মাংসের শরীর ছিল, অতএব রক্ত-মাংসের স্বার্থ হিন্দু-মুসলমানদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিত—এই কথা বিশ্বাস করা আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাহারা ছিলেন বোধ হয় প্রায় সকলেই ইতিহাসের “আত্মিক ব্যাখ্যার” ধুরন্ধর, অধ্যাত্মবিদ্যার পাড় বিশেষ। সভ্যতার এবং মানব-জীবনের একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য মুহুর্তেও বহুকাল চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুখ্‌নিটাই বোধ হয় ভারতীয় সমাজ-সংস্কারক এবং ইতিহাস-লেখক-মহলে অতিমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল।

এই একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যার উপর চাবুক লাগানো হইয়াছে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত মংগ্রীত “পজিটিভ ব্যাক্‌গ্‌রাউণ্ড অব্‌ হিন্দু সোসিয়োলজি” (অর্থাৎ হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব-ভিত্তি) নামক গ্রন্থে (পানিনি-কার্য্যালয়, এলাহাবাদ)। এই

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২১ সালে । ভারতীয় মানুষের ক্ষিধে পায়, ভারতীয় মানুষ হাওয়ার উড়িয়া বেড়ায় না, পায়ে হাঁটিয়া চলে, ভারতীয় মানুষ জমি-জমা লইয়া মারামারি করে, ভারতীয় মানুষ লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চায়, ভারতীয় মানুষ “একাতপজ্ঞঃ জগতঃ প্রকৃৎসং” কাষনা করে, ভারতীয় মানুষ সম্ববদ্ধ হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করে, ভারতীয় মানুষ স্ত্রী-পুত্রের জন্ত সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করিতেও অভ্যস্ত,—এই সকল অতি মামূলি বস্তু এই গ্রন্থের তথ্য ।

“ট্রান্সেণ্ডেন্টাল্” বা অতীন্দ্রিয় তরফ্টাকে ফুলাইয়া তুলিলে হিন্দুজীবন, হিন্দুধর্ম, প্রাচ্য ধর্ম, প্রাচ্যের সভ্যতা বৃদ্ধিতে পারা যাইবে না । ইতিহাস-রচনায় প্রচলিত “অতীন্দ্রিয়ামি” বা “আধ্যাত্মিকামি”র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ করিবার জন্তই ভারতীয়দের বাস্তবনিষ্ঠা প্রদর্শিত করা হইয়াছে । করাসী দার্শনিক কোং-প্রবর্তিত “পজিটিভ্” শব্দের দ্বারা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে । প্রত্যক্ষ, বাস্তবিক, “লোকায়ত”, ইহলৌকিক, ভৌতিক, “মেটিরিয়ালিষ্টিক্” সাংসারিক, “ইক্‌নমিক্” “আর্থিক” —এসব শব্দ একই অর্থের এপাশ ওপাশ মাত্র বিবৃত করে । সম্প্রতি জার্মান ভাষায় প্রকাশিত “ডিশাউংলেবেন্স-আনশাউং । ডেস্ ইণ্ডার্স্” (ভারতীয় জীবন-সমালোচনা) গ্রন্থেও (লাইপৎসিগ্, ১৯২৩) বিজ্ঞানমহলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

(৩)

“পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড” গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাসের বাস্তব

বা ভৌতিক (এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক) “ভিত্তি” যাত্রের সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের আর্থিক বা ভৌতিক “ব্যাখ্যা” বলিলে যাহা বুঝায় তাহা “ভিত্তি” যাত্রের সমান নয়। এই ভিত্তিটাকে জীবনের, সভ্যতার এবং ক্রমবিকাশের “কারণ” রূপে প্রদর্শন না করা পর্যন্ত আর্থিক “ব্যাখ্যা” জারি করা হইয়াছে বলা হইবে না।

অর্থাৎ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের কতকগুলো তথ্য ইতিহাস-গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে ছড়াইয়া দিলেই সভ্যতার আর্থিক “ব্যাখ্যা” করা হইল না। কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় এই ব্যাখ্যার আসল কথা। খাওয়াপরা ব্যবস্থা দ্বারা, অন্নসংস্থানের উপায়ের দ্বারা, সোজা কথায় ভাত-কাপড়ের প্রভাবে ছনিয়ার ধর্ম, সুকুমার শিল্প পারিবারিক রীতিনীতি, সৌজন্য, শিষ্টাচার এবং রাষ্ট্রশাসনের বিধি-নিষেধ সবই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, —এই কথা যে-সকল ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন একমাত্র ইত্যাহারই সভ্যতার ভৌতিক “ব্যাখ্যা” প্রচার করিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইতালীয় ইতিহাস-দার্শনিক হিব্রো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই ভৌতিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কস্-এঙ্গেলস্ প্রচারিত “ডাস্ কোমুনিষ্টশে মানিফেস্ট্” অর্থাৎ ধনসাম্যধর্মীদের অহুসাশন বা ইত্যাহার (১৮৬৭) নামক পুস্তিকায় এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর মূলস্রোতগুলো জগতে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বিলাতে থোরোল্ড রোজান্ নামক প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিদের “ইকনমিক্ ইন্সট্রাক্শন্স অন্ড্ হিষ্টরি” এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর পূর্বাগর ইতিহাস এবং

সমালোচনা নিউইয়র্কের অধ্যাপক সেলিগ ম্যানের গ্রন্থে ব্রষ্টব্য।
ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ এবং রিষ্ট প্রণীত “ইস্তোআরাদে দোক্ত্রিন্
জেকোনোমিক্” গ্রন্থের শেষ অর্ধে এই সকল চিন্তা-প্রণালীর
পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ সুপরিচিত।

প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় মানব-সভ্যতার উপর
ভাত-কাপড়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ বর্তমান
জগৎকে “আত্মিক ব্যাধ্যা,” আধ্যাত্মিকামি এবং অতীজিয়ামির
কবল হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান জগতের মাথাও
অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

অন্নচিন্তা ও দর্শন-সাহিত্য

(১)

“সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!”—এই
গুঁতোর চরম গুঁতো হইতেছেন ভাতকাপড়ের টান, “অন্নচিন্তা
চমৎকারা”। একথা আজকালকার দিনে কোনো ভারতবাসীকে
এমন কি ফর্সা-কাপড়জামা-পরা পরীক্ষাদ-পাশকরা মস্তিষ্কজীবী
“ভদ্রলোক”দিগকেও—চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার দরকার
নাই। ইয়োরোমেরিকায় কোনো নরনারীই এই বিষয়ে অন্ধ
নয়। সভ্যতার “আর্থিক ব্যাধ্যা” বিংশ শতাব্দীর এক প্রথম
স্বতঃসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, দুনিয়ার “হাভাতে” “হাঘরে” দরিদ্র
নির্ধ্যাতিত প্যারিয়াদের পক্ষে ইহাই একমাত্র বেদান্ত।

যাহারা চাষ-আবাদে জীবন ধারণ করে, তাহাদের “স্বধর্ম”
অর্থাৎ রীতিনীতি লেনদেন শাসন-শোষণ—একপ্রকার। আবার
যাহারা জানোয়ার চরাইয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলে তাহাদের ধরণ-
ধারণ “আত্মিক” জীবনও আর একপ্রকার!

সেইরূপ যাহারা “রোজ আনে রোজ খায়” তাহারা বিশ্ব-শক্তিকে এক চোখে দেখে। আবার যাহারা যে জিনিষ তৈয়ারী করে সেই জিনিষ খায় না, সেইগুলার বদলে বাজার হইতে আর-একপ্রকার জিনিষ “কিনিয়া” আনিয়া খায়, আবার কিছু কিছু জমাইয়াও রাখে; তাহাদের নিত্যকর্ম-পদ্ধতি, তাহাদের দর্শন, তাহাদের জীবন-সমালোচনা, তাহাদের বিশ্বদৃষ্টি (“হেস্ট্যান্‌শাউঙ”) অন্তবিধ।

আবার চাষ-আবাদের ফলে বা আওতায় যে বিবাহ-পদ্ধতি, যে শিল্পকলা, যে ভগবদ্ভক্তি দেখা দেয় অথচ কোনো প্রকার ধন-সৃষ্টির ফলে বা আওতায় ঠিক সেইরূপভাবে এইসব না গজাইতেও পারে। শিল্পকর্ম হাতের জোরে চলিলে একধরণের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই শিল্পই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইলে দর্শন, সাহিত্য, স্নকুমার শিল্প, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধ, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, সবই নবরূপে দেখা দেয়। গল্লীস্বরাজ নামক সমাজ-শাসন বা রাষ্ট্রশাসন যে-ধরণের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের প্রতিমূর্তি নগরকেন্দ্র ঠিক সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভান নয়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২)

এইসকল বিভিন্নতা ও পার্থক্যের ভিতর জগতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম দিক ভেদ নাই। শাদা চামড়া, লাল চামড়া, কাল চামড়া, হলুদে চামড়ার প্রভেদও নাই। ধনোৎপাদনের প্রণালী দুনিয়ার যত জায়গায় এবং যত যুগে একপ্রকার, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তিগুলা তত জায়গায় এবং তত যুগে একজাতীয় সমশ্রেণীভূক্ত প্রতিষ্ঠান।

বাম্প-চালিত শিল্প-বাণিজ্যের যুগারম্ভ পর্যন্ত কি এশিয়া, কি ইয়োরামেরিকা সকল ভূখণ্ডের মানবজাতিই এক “আদর্শে” চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকা বর্তমানে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে হাতের জোরে এবং মাখার জোরে। এই সৃষ্টিকার্য্যে এশিয়া এক কাঁচাও সাহায্য করিতে পারে নাই। এই যুগে এশিয়াবাসীর মগজ্ পচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান জগৎ সৃষ্ট হইবামাত্র ইয়োরামেরিকা প্রায় ষোল আনাই বদলাইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আজ গতাহুগতিকপন্থী এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকান-দিগকে কোনো মতেই চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

তবে ইয়োরামেরিকার আবিষ্কৃত বর্তমান জগৎটা এশিয়ায়ও আসিয়া হাজির হইয়াছে। চীন, জাপান, ভারত, পারস্ত, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের যেখানে যতখানি এই বর্তমান জগতের প্রভাব দেখা যায় সেইখানে ততখানি এশিয়ান নরনারী ইয়োরামেরিকানদের “মাসতুত ভাইয়ের” মতনই চলা-ফেরা করিয়া থাকে। ঈম এঞ্জিন্ হইতে বোলশেপ্সিজম্ পর্যন্ত বর্তমান জগতের সকল “সমস্তাই” আজ খাটি প্রাচ্য স্বদেশী মাল।

রক্তমাংসের স্বধর্ম্ম

মার্কস্-এঙ্গেল্স্ প্রচারিত স্বতঃসিদ্ধগুণা অগ্ন্যান্ত বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধসমূহেরই অনুরূপ। প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধেরই সীমানা আছে। আজকালকার বিজ্ঞান-জগতে আইনষ্টাইনের “রেলেক্টিভিটি” বা আপেক্ষিকতা দিগ বিজয় লাভ করিয়াছে। আইনষ্টাইনের তত্ত্বটা যদিও বুঝি না তাঁহার বোলটা ব্যবহার করিতে ভয় পাইতেছি না। এই পারিভাষিক হিসাবে বলিতে চাই যে, আর্থিক ব্যাখ্যা-প্রণালীর স্বতঃসিদ্ধগুণাও “রেলেক্টিভি” অর্থাৎ আপেক্ষিক।

মার্কস-এঙ্গেলসের কটর সেবকেরা অবশ্য এইসকল সহজের আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। ইহারা একবগ্গা লোক, অশেষবাদী, “মোনিষ্টিক”। কিন্তু বর্তমান লেখক মানবজীবনকে কোনো এক খুঁটায় খাড়াভাবে দেখিতে বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে অপারগ। এক সঙ্গে বহু শক্তি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে। এই বহুত্বের ভিতর শারীরিক কাঠামু, শরীরের শক্তিয়োগ, রক্তমাংসের স্বর্ধ্ব, সংগ্রামধর্মের স্বাস্থ্যভিত্তি, আর্থিক মেরুদণ্ড, “দেহাত্মকবুদ্ধির” বস্তুতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত শক্তিগুলার ইচ্ছা খুব বড়। জগতের পণ্ডিতেরা ভৌতিক ধর্মের ইচ্ছা সহজে দিতে রাজি নন। সেই সকল অধ্যাত্মনিষ্ট একবগ্গা পণ্ডিতের একদেশদর্শিতা ধ্বংস করিবার জন্য সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার, এমন কি সময় সময় একবগ্গা আর্থিক ব্যাখ্যারও, প্রয়োজন আছে। “যেমন কুকুর, তেমন মূগুর।”

এই প্রয়োজনটা ভারতে যতই বুঝা যাইতে থাকিবে ততই সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, পরিবার, সামাজিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য জীবন-কেন্দ্রগুলো বৃদ্ধিবার পক্ষে যুবক ভারত দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে। অধিকন্তু ভবিষ্য ভারতকে কোন্ পথে চালাইলে কত চালে কিস্তীমাং হইবে তাহার অনেক সন্দেহই এই আর্থিক-ব্যাখ্যা-সমন্বিত ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিস্কার হইয়া আসিবে। এই ব্যাখ্যাই যুবক-ভারতে যুগান্তরের দ্বিতীয় স্তর গঠন করিবে। ভারতীয় “যৌবন পূজা”র আন্দোলনে অতীত-নিষ্ঠা এবং ভবিষ্য-বাদ দুইই নবরূপে দেখা দিবে।

এইসকল বিষয় “বর্তমান জগৎ” গ্রন্থের নানাখণ্ডে ঠারে

ঠোরে উত্থাপন করিয়াছি। সুবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিবার সুযোগ ও সময় জুটে নাই। কিন্তু এঙ্গেলসের গ্রন্থে বাঙ্গালী পাঠক নবীন ইতিহাস-বিজ্ঞানের রস এক খাটি ফোয়ারার স্রোতেই—বস্তুতঃ স্বয়ং ভগীরথের তত্ত্বাবধানেই—চাখিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন। যাহারা ইংরেজি জানেন না বা কম জানেন তাঁহাদের কাজে আসিলেই এই অনুবাদ-গ্রন্থ সার্থক হইবে। *

শ্রীবিনয়কুমার সরকার ।

* লুগানো, সুইটসারল্যান্ড

৮ই এপ্রিল, ১৯২৪

সূচীপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা

কার্ল মাক্স ও ফ্রিড্রিশ এঙ্গেলস্

ধনবিজ্ঞানে যুগান্তর	১০
এঙ্গেলসের গ্রন্থ	১৮০
“নৃ-তত্ত্ব”-বিজ্ঞা	১১০
মর্গ্যানের সিদ্ধান্ত	১১০
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পাণ্ডিত্য	৫০
বিষাক্ত “প্রাচ্যামি”	৫০
ভবিষ্যবাদের দর্শন	৫১০
তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান	১০২
ইতিহাসের “আর্থিক ব্যাখ্যা”	১৮০
অন্নচিন্তা ও দর্শন-সাহিত্য	১১৮০
রক্তমাংসের স্বধর্ম	১১০

প্রথম অধ্যায়

মার্ক্সাতার আমল

মর্গ্যানের “প্রাচীন সমাজ”	১
মানবজাতির “সহজ” বা প্রাকৃতিক যুগ	৩
মানবজাতির “বার্কার” বা গোড়াপত্তনের যুগ	৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবারের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ—বিবাহতত্ত্ব

কুটুম্বজ্ঞান ও বিবাহ-পদ্ধতি ১৪

নৃত্যের গোড়ার কথা	১৬
বাথোফেনের “জননী-বিধি”	২০
জানোয়ারদের “যৌন-বিধি”	২১
যুথ বনাম যোনি	২৩
প্রাচীন মানবের সম্ব-গঠন	২৫
অবোধ যোনি-সংসর্গ	২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ভাইয়ে বোনে বিবাহ (সম-রক্তজন্মের যৌন সংশ্রব)	৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—“পুনালুয়া” পরিবার	৩৩
অবোধ বিবাহে বাধা	৩৩
ইরোকোজাদের “সেকাল”	৩৫
গোষ্ঠীপ্রথার উৎপত্তি	৩৯
অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহের দল	৪১
মর্গ্যানের ভুল	৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জোড় পরিবার	৫০
বিবাহে বিধি-নিষেধ	৫১
নারীর আমল	৫৩
দলগত বিবাহের জের	৫৬
পশু পালনের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব	৬২
“জননী-বিধি”র বিরুদ্ধে পুরুষের বিরোধ	৬৬
পুরুষাধিপত্যের জন্ম	৭১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—এক পতি-পত্নী-স্ব-মূলক পরিবার	৭৭

হোমারের গ্রীক সমাজ	৭৮
স্পার্টা ও আথেন্স	৮০
বারাকপার উৎপত্তি	৮৫
রোমান ও জার্মান	৯০
পুরুষ-নারীর অসাম্য	৯৪
সমাজ-বিপ্লব	১০২
যোনির টান	১০৫
ভবিষ্যতের পরিবার	১১৫

তৃতীয় অধ্যায়

ইরোকোআদের গোষ্ঠী-প্রথা

“গেন্স্”	১১২
গোষ্ঠী-শাসন	১২১
“কাজী”	১২৮
“জাতি” (“টাইব”)	১৩১
সংযুক্ত-জাতি	১৩৬
সেবাল ও একাল	১৪০

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীক সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা

মাক্কাতার আমলের গ্রীক নরনারী	১৪৬
গ্রোটের গ্রহে গোষ্ঠী-লক্ষণ	১৪৭
পরিবার-কেন্দ্র গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের মূল নয়	১৫০
গ্রোটের ভুল	১৫১
মার্ক সের টিগনী টিটকারি	১৫৩

“ক্রাজী” ও জাতি	১৫৪
হোমার সাহিত্যের “জাতি”-শাসন	১৫৬
“বাসিলিউস্” ও “রাজ”-পদ	১৫৯
“রাজা” কাকে বলে ?	১৬১
হোমারীয় সমাজ “প্রাক-রাষ্ট্রীয়” জীবন-কেন্দ্র	১৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থেনিয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

“বীর-যুগ”	১৬৭
থিসিউস্-সংহিতা	১৬৯
ঋণ-কাহ্নন	১৭২
যুগ্মবতার সোলোন	১৭৯
গণতন্ত্রী স্বরাজের পরিপূর্ণ যুগি	১৮৩
“অনধিকারী” গোলাম শ্রেণী	১৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমাণ সমাজে গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

নগর-প্রতিষ্ঠার কাহিনী	১৯১
গেট্টি-শাসন	১৯২
নব্বসেনের ভুল	১৯৬
বহির্কিবাহ না আন্তর্কিবাহ ?	১৯৮
“কুরিয়া” বা রোমাণ “ক্রাজী”	২০৩
“সেনেট” ও “কুরিয়া”-সভা	২০৪
“রেক্‌স্” কি “রাজা” ?	২০৫
“পাব্লিসিয়ান” ও “অনধিকারী” “প্লেব”	২০৭

সাহিত্য-সংহিতার শ্রেণী-বিভাগ	...	২০২
"সেতুবিদ্যা"র বিধানে ধন-তত্ত্ব	...	২১০
রোমাণ গণতন্ত্রের আর্থিক ইতিহাস	...	২১২

সপ্তম অধ্যায়

কেন্টিক ও জাম্বাণ জাতির গোষ্ঠী-প্রথা	২১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ—আয়ল্যাও, হেলস্ ও স্বইল্যাও	২১৫
"জোড়-পরিবার"	২১৫
"সেপ্ট" ও "রুম্বাল"	২১৮
হ্যান্টার স্বটের "রুয়ান"-সাহিত্য	২২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জাম্বাণ সমাজ	
জাম্বাণদের "জেনেওলোজিয়া"	
এবং "কুনি"	২২২
মামা-ভাগ্নে	২২৫
জাম্বাণ সমাজে "জননী-বিধি"	২২৮
তাসিতুসের "জাম্বাণিয়া"	২৩০
পরিবার ? না "পলী ?"	২৩২
জাম্বাণদের কৃষি-শিল্প বাণিজ্য	২৩৬
সার্কজনিক-সভা	২৩৮
লড়াই-সঙ্গার ও "কজিয়-জেলী"	২৪১

অষ্টম অধ্যায়

জাম্বাণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি	
"জাম্বাণিয়া মায়া"র নরনারী	২৪৪
"রোমাণ" সমাজে জমিদার ও গোলাম	২৪৮

জাৰ্জাণ্দের রাজত্ব	২৫৬
জাৰ্জাণ্ কিষাণদের দুর্গতি *	...	২৫৭
"বার্কার" রক্তের স্বার্থ	...	২৬৩

নবম অধ্যায়

"বার্কার" জীবন ও "উৎকর্ষ"

অথাত: স্থব জিজ্ঞাসা	২৬৮
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্শের আদিম রূপ	২৬৯
"জানোআর-চাষে" আর্থিক বিপ্লব	২৭২
কৃষি ও শিল্পের আবিষ্কার	২৭৩
পুরুষ প্রাধান্তের স্বত্বপাত	২৭৫
লোহার আর্থিক প্রভাব	২৭৭
গোষ্ঠী-নীতির ক্রমিক লোপ	২৭৯
বিনিময় ও শ্রম-বিভাগ	২৮১
মুদ্রার আবির্ভাব	২৮৪
সমাজে নবশক্তি	২৮৭
রাষ্ট্র কাহাকে বলে ?	২৮৮
অসাম্য ও ধন-তন্ত্রের ইতিহাস	২৯৩
তথাকথিত গণ-তন্ত্র	২৯৬
আর্থিক স্বাধীনতার যুগ	২৯৭
"উৎকর্ষে"র ধন-নীতি	২৯৯
আধুনিক সভ্যতার স্ব-কৃ	৩০১
মানবজাতির ভবিষ্যৎ	৩০৪

পরিবার, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র

প্রথম অধ্যায়

মাস্কাতার আমল

মর্গ্যানের “প্রাচীন সমাজ”

মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ লুইস মর্গ্যান প্রণীত “এন্ট্রেক্ট সোসাইটি” বা “প্রাচীন সমাজ” নামক গ্রন্থ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত বাথোফেন প্রণীত “মুটার রেট” বা “জননী-বিধি” নামক গ্রন্থে এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের আইন-ব্যবসায়ী ম্যাকলেনানের “প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা” নামক গ্রন্থে আদিম মানব সমাজে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির আলোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মর্গ্যানই সর্বপ্রথম সাবেক কালের সামাজিক ক্রম-বিকাশের ধারাবাহিক-সঙ্গত রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রাণ-বিজ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার ডাক্তারদের যে কীষ্টি, ধন-বিজ্ঞান বিজ্ঞান ক্রম-বিকাশে কার্ল মার্ক্সের যে ঠাই, মানবজাতির নৈশব অবস্থার ইতিহাস সম্বলন বিষয়ে মর্গ্যানকে সেই কীষ্টি ও ঠাই দিতে হইবে।

মানবজাতির শিশুকাল তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ “স্নাক্সেন্স” অর্থাৎ “সহজ” বা প্রকৃতির অবস্থা। “স্নাক্সেন্স” শব্দে সাধারণতঃ বাহ্য বৃত্তায় বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা বুঝিতে হইবে না। এইজন্য “প্রাকৃতিক”, “সহজ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা গেল। দ্বিতীয়তঃ, “বার্কারিয়ান,” অর্থাৎ বার্কীর বা গোড়া-পত্তনের অবস্থা। “বার্কারিয়ান” শব্দেরও প্রচলিত অর্থ এই ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়। ভারতীয় “বর্কর” শব্দের যে অর্থ তাহাও এখানে চলিবে না। ‘বার্কীর’ বলিয়া একটা “যোগরুচ” শব্দ গড়িয়া লওয়া গেল। সোজাসোজি ইহার অর্থ ধরিয়া লইলাম “গোড়াপত্তন।” পরবর্তী আলোচনায় বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা বাহির হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ, “সিস্টিনিজেন্সন” বা উৎকর্ষের অবস্থা। এই “সিস্টিনিজেন্সন” শব্দটাও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটা শব্দ-স্বরূপ ব্যবহার করা গেল। আটপৌরে ভাবে এই শব্দে আমরা সভ্যতা, ভব্যতা, শিষ্টাচার, “শীল” ইত্যাদি যে সকল বস্তু বুঝিয়া থাকি সেই সব কথা এখানে মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, এই কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের “সহজ” এবং “বার্কীর” অবস্থাকে চলতি ভাষায় “অ-সভ্য”, “বর্কর”, “অশিষ্ট”, ইত্যাদি রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভুল করা হইবে।

মর্গ্যানের কেতাবে প্রথম দুই স্তরেরই বিশেষ বিশ্লেষণ আছে। তৃতীয় স্তরের পূর্বাভাব মাত্র তাঁহার আলোচ্যবিষয় ছিল। প্রত্যেক স্তরকেই তিনি আবার পরপর তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন। ঋণ্ডা পরার উপায় বাহির করিবার পথে যাহা যেমন যেমন গুণাদি দেখাইয়াছে তেমন তেমন স্তরগুল্যকে বীচু,

মাঝারি এবং উচ্চ রূপে বিবৃত করা হইয়াছে। মর্গ্যানের বিবেচনার ঋণগ্রহণের উপায় বাহির করিবার পথে মানুষ যত ওস্তাদ হয় ততই ছুনিয়ার উপর মানুষের দখল বাড়িয়া যায়। যে যুগে অন্ন-সংস্থান অক্ষুণ্ণ ও সহজভাবে নিশ্চয় হইয়াছে সেই সেই যুগে মানুষের কাজ-কর্ম একটা উল্লেখযোগ্য গৌরব-গর্কের অধিকারী হইতে পারিয়াছে। মানবজাতির পারিবারিক বা যৌন-সম্বন্ধের ক্রম-বিকাশ বিষয়েও এই অন্ন-সংস্থানের উপায় আবিষ্কার করিবার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মানবজাতির “সহজ” বা প্রাকৃতিক যুগ

১। নিম্নস্তর। এই যুগকে মানব সমাজের শৈশব অবস্থা বলিতে হইবে। মানুষ তখন তাহার আদিম জন্ম-নিকেতনেই বসবাস করিত। গ্রীষ্ম-প্রধান জনপদের নানা অঞ্চলে ছিল তাহাদের জীবন-কেন্দ্র। অনেক সময় তাহারা গাছে গাছে কাটাইতে বাধ্য হইত। বস্ত্র আনোয়ারের আক্রমণ হইতে আশ্রয় করা অল্প গাছ তাহাদের পক্ষে ছিল দুর্গ বিশেষ। কল মূল ছিল তাহাদের খাদ্য। পরস্পর মনোভাব প্রকাশ করিবার অল্প ধ্বনির উৎপত্তি এই যুগের এক বড় ঘটনা। আজ-কাল অগতে যে সকল জাতি জ্যান্ত রহিয়াছে অথচ সাবেক কালে যে সকল জাতি অগতে মাথা তুলিয়াছিল তাহাদের কাহারো পূর্বপুরুষের কোন্টি “সাহস্রজ” বা সহজ যুগ পর্য্যন্ত চৈকেনা। এই যুগটা হাজার হাজার বৎসর চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা তাহার আবু মাথা অসম্ভব। মানুষ আনোয়ার জাতিরই বংশধর,—এই কথাটা মানিয়া লইলে তাহার

আদি শৈশবের নিম্নতম স্তরটা সবচেয়ে বিনা আশঙ্কিতেই এই বিবরণ স্বীকার করা সম্ভব।

২। মধ্যস্তর। শৈশব পার হইয়া মানুষ “সহজ” যুগের মধ্যস্তরে পা ফেলিবার সময় মাছ, কাঁকড়া, শামুক এবং অন্যান্য জলজ জীবের ব্যবহার শিক্ষা করে। আগুনের ব্যবহারও মানুষ এই স্তরেই শিখিয়াছিল। আগুন এবং মাছজাতীয় খাদ্যের সাহায্যে মানুষ জল-বায়ুকে খানিকটা বেশে আনিতে থাকে। নদী, সমুদ্র অথবা হ্রদের কিনারা ধরিয়া সে জগতের নানান স্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। এই বিচরণের যুগেই প্রান্তর-যুগের প্রাচীনতম যন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হইত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই সমুদয় যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে “সহজ” যুগের নর-নারী দেশ দেশান্তরে জীবন-কেন্দ্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

আগুনের সাহায্যে তাহার সর্বত্র নয়া নয়া খাদ্য পরখ করিতে পারিত। গরম ছাইয়ে পুড়াইয়া অথবা এমন কি উননে পুড়াইয়াও তাহার ক্রমশঃ শাক-সব্জী জাতীয় বস্তু খাইবার উপায় আবিষ্কার করে। জানোয়ার শিকার করিবার জন্ত বন্য, খাঁড়া ও অন্যান্য যন্ত্র আবিষ্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে মাংসও আহাৰ্য্য তালিকায় ঠাই পাইতে থাকে। অনেক কেসে আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে, বহু সমাজ একদম শিকারের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করিত। এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ শিকারের ফল নেহাৎ অনিশ্চিত।

তবে খাদ্যব্যয়ের আবিষ্কার সর্বদাই সহজ নয়। অধিকতর প্রকৃতি এই জগির জোগান সবচেয়েও অত্যধিক দুঃস্বপ্ন নয়।

কাজেই মাহুয স্বজাতীর মাহুয খাইতেই স্বক করিয়া দেয়। মাহুয খাওয়াটা বোধ হয় “স্বাস্থ্য” যুগের দ্বিতীয় স্তরের আবিষ্কার। বহুকাল ধরিয়া এই অনুষ্ঠান চলিয়া আসিয়াছে। বর্তমান জগতেও অষ্ট্রেলিয়া এবং পলিনেশিয়া দ্বীপের আদিম-বাসীরা মাহুযকে খাদ্যদ্রব্য বিবেচনা করিয়া থাকে।

৩। উচ্চস্তর। তীর-ধনুকের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে “সহজ” মাহুয মধ্যস্তর ছাড়াইয়া উঠে। এই উচ্চস্তর স্তরে জানোয়ারের মাংস তাহার নিত্য খাদ্যের অন্তর্গত হয়। শিকার ছিল এই স্তরের নিত্যকর্ম পদ্ধতি। ধনুর্বিদ্যা একটি জটিল ও কঠিন বিদ্যা। দড়ি, জ্যা, ফলা ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে পারা অনেক মাথা খাটাইবার উপর নির্ভর করে। এই সকল বস্তু আবিষ্কার করিতে যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার হয় এবং তাহার ফলে যে সকল শিল্প বাহির হইয়া পড়ে তাহার দ্বারা একই সঙ্গে আরও বহুবিধ আবিষ্কারের পথ খুলিয়া গিয়াছিল।

তীর-ধনুকের যুগেই মাহুয গ্রামে গ্রামে বসতি বসাইতে শুরু করে। স্বাস্থ্যবোর উপর বাছাই ও শাসন ইত্যাদি দেখা দেয়। কাঠের বাসন-কোসন এবং যন্ত্রপাতি এই যুগেরই জিনিষ। তখনও তাঁত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু হাতে সূতা কাটিবার এবং কাপড় বুনিবার কৌশল মানব-সমাজে দেখা দিয়াছিল। বেতের চূপড়ী, ধামা, ডালা ইত্যাদি বুনিতে ওস্তাদি দেখানো এই স্তরের এক বিশেষত্ব। অধিকন্তু মাহুয পাথরের যন্ত্রগুলো বসিয়া মাজিয়া ছুঁচোল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মধ্যস্তরের পাথরগুলো তৌতা ছিল কাজেই উচ্চস্তরকে নব্য-প্রস্তর যুগ বলা হয়।

নব্য-প্রস্তর যুগের ছুঁচোল পাথরের কুড়াল মাহুযের ইতিহাসে

এক অতি বিপুল “আবিষ্কার” বিশেষ। প্রাচীন-তর কালের আবিষ্কৃত আগুনের সঙ্গে কুড়ালের সংযোগে মানুষ গাছ খুঁদিয়া নৌকা বাহির করিয়াছিল। গাছ চিড়িয়া তক্তা আবিষ্কার করা এবং তাহার দ্বারা ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করাও নব্য-প্রস্তর যুগেরই কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য এই সকল রকমারি আবিষ্কারের আবেষ্টনেই তীর-ধনুকের উৎপত্তি হয়।

উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল ইণ্ডিয়ান নর-নারী বাস করে তাহাদের জীবনে প্রাথমিক তীর-ধনুকের আনুষঙ্গিক সকল প্রকার কলা ও বিজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মাটির বাগন ব্যবহার করিবার কায়দা এখনো রপ্ত করিতে পারে নাই।

এইখানে সভ্যতা বিকাশের দ্বারা সম্বন্ধে একটা নূতন প্রচার করা যাইতে পারে। “সহজ” যুগে মানুষের পক্ষে তীর-ধনুকের যে দাম “বার্কার” যুগে লোহার তলোয়ারের সেই দাম। সেই দামই আবার “সিম্বলিজেডন” বা উৎকর্ষের যুগে বন্ধুকের। এই তিন যুগেই মানুষ বিশ্ব-বিজয়ের হাতিয়ার পাইয়াছে।

মানবজাতির “বার্কার” বা গোড়া পত্তনের যুগ

১। নিম্নস্তর। মাটির বাগন ব্যবহার করিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে নর-নারী “সহজ” যুগের উপরের ধাপে পদার্পণ করে। “সহজ” যুগের উচ্চতম স্তরে বোধ হয় মানুষ বেতের অথবা কাঠের বাগন-কোসন আগুনের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেছিল। এই জন্য পথ চুঁড়িতে চুঁড়িতে কাদা মাটি দিয়া বাগনগুলিকে লেপিবার কৌশল আবিষ্কৃত

হইয়া থাকিবে। অল্পকালের ভিতর মাটির বাসনই বাধীনভাবে একটা নয়া আবিষ্কার স্বরূপ নর-সমাজে প্রবর্তিত হয়।

মাটির বাসন আবিষ্কার করা পর্যন্ত জগতের সকল দেশেই মানুষ বোধ হয় এক পথে ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জনপদে হ্রদত ক্রম-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন রীতি দেখা দেয় নাই। কিন্তু “বার্কার” যুগে মানবজাতির ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। এই যুগে দেশে দেশে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সুযোগ কাজে লাগাইতে দাইয়া মানুষ তাহার জীবন গঠন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রকটিত করিয়াছে।

জানোয়ার পুষ্টিতে পারা “বার্কার” যুগের সর্বপ্রথম বিশেষত্ব। জানোয়ারকে পোষ মানাইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তাহাকে নানাবিধ আটপোরে কাজে লাগানো বার্কার মানবের মস্ত কৃতিত্ব। ঠিক এই ধরনেরই আর এক প্রতিদ্বন্দ্ব—চাষ-আবাদ করিয়া উদ্ভিদকে “পোষ মানানো,” শাক-সব্জী, গাছ-গাছড়ার উপর মানুষের দখল বসানো। এইখানে জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে হইবে।

পুরাণো ছনিয়ার অর্থাৎ পূর্ব-গোলার্ধে (এসিয়ায়, ইরোরাপে, আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলেশিয়ায়) ছিল পোষ-মানার উপযুক্ত প্রায় সকল প্রকার জীবজন্তু। আর চাষ-আবাদের যোগ্য সকল প্রকার গুহাই যাত্র একটা ছাড়া ছিল এই গোলার্ধে। অপর পক্ষে তথাকথিত নয়া ছনিয়ার অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে ছিল যাত্র একটা ভরপারী পোষযোগ্য জানোয়ার। নাম তাহার লামা। এইটুকু যাত্র দক্ষিণ আমেরিকার অতি সঙ্গীর্ণ জনপদের জীব। আর

গোটা আমেরিকা ভূখণ্ডে জয়িত যাত্র এক শত,—তুট্টা। অবশ্য এটা খাতি হিসাবে উচ্চতম শ্রেণীর শত সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক স্বযোগের বিভিন্নতার জন্য বার্কারেরা দুই গোলার্ছে বিভিন্ন পথে জীবন-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে লাগিল। কাজেই বার্কার যুগের স্তরে স্তরে দেশ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তর-বিকাস দেখিতে পাই।

২। মধ্যস্তর। পূর্ব গোলার্ছের নর-নারী এই স্তরে পা ফেলে জীবজন্তু পোষ মানাইতে। পশ্চিম গোলার্ছের এই স্তর হুক হয় চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে। “আতোব” অর্থাৎ রোদে পোড়া ইট এবং পাহাড়ী পাথর দিয়া ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করাও আমেরিকায় এই স্তরের ঘটনা।

পশ্চিম দুনিয়া অর্থাৎ আমেরিকার ক্রম-বিকাশই প্রথম আলোচনা করা যাইতেছে। কেন না ইয়োরোপীয়েরা যখন এই মূলুক আবিষ্কার করে তখন পর্যন্ত এই জগতের বার্কারেরা মধ্যস্তরেই জীবন ধারণ করিতেছিল।

মিসিসিপি নদীর পূর্বাদিকে—অর্থাৎ বর্তমান মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পূর্বাদিকে তখনকার ইণ্ডিয়ানরা ছোট ছোট বাগানে চাষ চালাইত। তুট্টা এবং কুমড়া, শশা, ধরমুজ ইত্যাদি শস্তের আবাদ করিত। তাহারা কাঠের বাড়ীতে বাস করিত, পল্লীগুলি দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহারা “বার্কার” যুগের নিম্নতম স্তরের সাক্ষী।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের—বিশেষতঃ কলম্বিয়া নদীর দুই ধারকার ইণ্ডিয়ানরা তখনও “সহজ” যুগ ছাড়াইয়া “বার্কার” যুগে পা দেয় নাই। তাহারা মাটির বাসন ব্যবহার করিত না। চাষ-আবাদও তাহাদের জানা ছিল না।

কিন্তু বর্তমান যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে-নিউ মেক্সিকো প্রদেশে,—মেক্সিকো দেশে, গোটা মধ্য আমেরিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে যে সকল ইণ্ডিয়ানকে ইয়োরোপীয়েরা আবিষ্কার করে তাহারা ছিল “বার্কার” যুগের মধ্যস্তরের নর-নারী। তাদের “আডোব” অথবা পাথরের গড়া ঘর-বাড়ীগুলি দুর্গের মতন দেখাইত। ভিন্ন আবহাওয়া এবং জনপদের অমূরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপন্ন করিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল। তাহারা বাগ-বাগিচায় কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের ব্যবস্থা করিয়া চাষের উন্নতি সাধন করিত। মেক্সিকানরা “টাকী” মূর্গা এবং অস্ত্রান্ত চিড়িয়া পুথিত। “লামা” ছিল পেরু ইণ্ডিয়ানদের পোষমানা জানোয়ার।

লোহা ছাড়া অস্ত্রান্ত ধাতুর ব্যবহারও ইহাদের জানা ছিল। কিন্তু লোহার অভাবে ইহারা পাথরের যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। স্পেনদেশের দখলে আসিবার কালে ইহারা পরবর্তী শতাব্দীর জীবন গড়িয়া তুলিবার স্বযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

পূর্ব-গোলার্ধে বার্কায়েরা দুধ দুহিতে শিখিয়া মধ্যস্তরে উঠিয়াছিল। যে সকল জানোয়ার দুধ দেয় আর যাহাদের মাংস খাওয়া যায় এইরূপ জানোয়ারের “চাম” ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত! উদ্ভিদের চাম এই গোলার্ধে প্রচলিত হয় নাই।

জানোয়ারের “চাম” করিতে-করিতে পশু-পালক দল বাড়িয়া যাইতেছিল। দলগুলা ক্রমশঃ এত ছড়াইয়া পড়ে যে, হয়ত এই উপায়ে এসিয়ার সেমিট এবং “আর্বা” জাতিরা অস্ত্রান্ত বার্কায় জাতি হইতে কারাক হইয়া যায়। ইয়োরোপের এবং এসিয়ার

ভাষাগুলার ভিতর জানোয়ারের নাম অনেক কেজেই একরূপ। কিন্তু উদ্ভিদের নামগুলো এশিয়ায় ও ইয়োরোপে পৃথক্। চাষ-আবাদ শিখিবার পূর্বেই বার্কীর সমাজে ভাগাভাগি হইয়াছিল এই কারণে বিশ্বাস করা চলে।

পশু-পালনকারীরা বহুকাল পর্য্যটকের সমাজেই জীবন ধারণ করিত। ইউক্রেতিস এবং তাইগ্রিস দরিয়ার উপকূলে, ভারতের সমতল অঞ্চলে, মধ্য এশিয়ার অক্সাস এবং আক্জার্ভেস-মাতৃক জনপদে, রুশিয়ার ডন এবং ডনিপার নদীর দুইধারে পর্য্যটক সমাজগুলো জানোয়ার চাষের সুন্দর সুযোগ পাইয়াছিল।

জানোয়ার পুষ্টিতে অভ্যস্ত হইয়াই বার্কীরের দল এই সকল প্রকৃতির অল্পগৃহীত অঞ্চলের দাম বৃদ্ধিতে শিখে। বন-জঙ্গলময় আর শীতের দৌরাণে মৃতপ্রায় ভূখণ্ডে পশুপালন সহজসাধ্য নয়। নদী-মাতৃক উর্বর ভূমির গুণ ক্রমশঃ ইহারা পশুপালনের কাজে লাগাইতে শুরু করে। পরে জানোয়ারগুলোকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই ইহারা শস্তের চাষ শিখিয়া থাকিবে। উদ্ভিদ হইতে মাহুষের খোরাকও যে জুটিতে পারে এই ধারণা বার্কীরদের মাথায় প্রথমে জন্মিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

মাংস এবং দুধ খাইয়া আর্ধ্য এবং সেমিট নর-নারী পুষ্ট হইতে থাকে। এই দুই আহাৰ্য্য দ্রব্য ইহাদের কলেবর দৃঢ় এবং সুস্থ রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। সন্তান সন্ততির শারীরিক উৎকর্ষ মাংস এবং দুধের দ্বারা বিশেষ রূপেই সাধিত হয়। নিউমেক্সিকো প্রদেশের পুয়েরো-“ইণ্ডিয়ান” নিরামিষাশী। ইহাদের মাথা মাছ-মাংস খাওয়া “ইণ্ডিয়ান”দের চেয়ে ছোট।

এই যুগে মাছ-খাওয়া প্রথা বার্কীর সমাজ হইতে লুপ্ত হয়।

আজকাল এই রীতি কোথাও কোথাও একটা ধর্মের অঙ্গরূপে চলিয়া থাকে মাত্র। কখনো কখনো বা মাহুদ-খাওয়া কাণ্ড একটা দৈব দাওরাই বিশেষ।

৩। উচ্চত্তর। লোহা-ঘটিত ধাতু পোড়াইতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে বার্বারেরা এই স্তরে পা দেয়। মানবজাতি পরে অন্ধর আবিষ্কার করিয়া লিখিতে শুরু করিয়া এই স্তর ছাড়াইয়া “সিভিলি-জেশন” বা উৎকর্ষের কোঠায় উঠিয়াছে।

এই স্তরের পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র পূর্ব-গোলার্ধে। পূর্ববর্তী সকল যুগে মাহুদ বাহা কিছু করিয়াছে সকলগুলা একত্র করিলেও এই স্তরের কীত্তির সমান হইবে না। এই যুগে প্রাচীন-তম গ্রীসের “বীর”গণ তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। রোম নগরের ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত ইতালির জাতিগুলি এই স্তরে জীবন ধারণ করিয়াছিল। ল্যাটিন ঐতিহাসিক তাসিভাস-বিবৃত ভার্মাণ জাতি এবং “স্কিথিড”-যুগের স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরাও এই যুগেরই সাক্ষী।

এতদিনে আমরা সর্বপ্রথম লোহার লাঙ্গলের সাক্ষ্য পাই। জানোয়ারে টানা হালের সাহায্যে চাষ চলিত। তাহার ফলে প্রচুর খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইত। চাষের জন্যই বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমিন তৈয়ারী করা হইয়াছিল। কাঠ কাটা, আগাছা উড়াইয়া দেওয়া, এসব লোহার কুড়াল এবং লোহার কোদাল ভিন্ন সম্ভবপর হইত না।

এই সকল উন্নতির ফলে লোক সংখ্যা বাড়িতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে “বসতি” গড়িয়া উঠে। ভূমির চাষ করিতে অভ্যস্ত হইবার পূর্বে দু চার লাখ লোক একত্র এক সমাজে

এক নিয়মে বসবাস করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

বার্কার জীবনের চরম কীর্তি গ্রীক হোমারের কাব্য সাহিত্যে চিত্রিত রহিয়াছে। বিশেষভাবে “ইলিয়াদ”-গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। লোহার যন্ত্রপাতি উন্নত হইয়াছে। কাপড়, কুমারের ঢাকা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাছেরা তেল এবং মদ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে। ধাতুজ দ্রব্যে শ্রুতুমার শিল্পে সৃষ্টি পরি-ক্ষুণ্ট। গাড়ী, রথ, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ঘর-বাড়ী, নগর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণে নানা কৌশল দেখা দেয়। দেওয়াল-ঘেরা নগর, দুর্গ-রক্ষিত নগর এই ছিল তখন-কার বার্ক্যারদের সামাজিক জীবন-কেন্দ্র। সাহিত্য-বীর হোমার এই যুগেরই মহাকবি। প্রাচীন গ্রীক দেব-দেবী এই সমাজেরই আবিষ্কার। রোমান সেনাপতি সীজার অথবা ঐতিহাসিক তাসিতুস জার্মান-সমাজ সম্বন্ধে যে বিবরণ ল্যাটিন ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরা এই হোমারীয়-যুগের প্রাথমিক অবস্থা দেখিতে পাই। গ্রীকেরা যে যুগটা পার হইয়া গিয়াছে জার্মানরা সেই যুগটার হাতেখড়ি দিতেছে,—এইরূপ পরিচয় লইলে জীবন-বিকাশের ধারাটা সহজে বুঝা যাইবে।

মর্গ্যানের অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া গেল। কথাগুলো সূত্রাকারে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

১। “সহজ” যুগ,—প্রাকৃতিক বস্তুগুলা মানুষ এই যুগে তাঁবে আনিতে শিখে। এইগুলা নিজ দখলে আনিবার কাজে সাহায্য করিবার জন্যই মানুষ কতকগুলো যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলে।

২। “বার্ক্যার” যুগ,—এই যুগে মানুষ জানোয়ার পুষ্টিতে এবং

উদ্ভিদ চাষ করিতে শিখে। অধিকন্তু নানা কৌশলে প্রকৃতির স্বাভাবিক দানগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইয়া দেওয়া বার্ষিক সমাজের অন্ততম কীর্তি।

৩। “উৎকর্ষের” যুগ,—প্রকৃতিকে কৃত্রিম উপায়ে আরও কল-বর্তী করিয়া তোলায় মানুষের ক্ষমতা প্রসূক্ত হইয়াছে। এই শক্তি স্ককুমার এবং আটপোরে শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র রূপে দেখা দিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবারের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহতত্ত্ব, কুটুম্বজ্ঞান ও বিবাহ-পদ্ধতি

নিউ ইয়র্ক প্রদেশে ইরোকোয়া নামক “ইণ্ডিয়ান” জাতি পুঞ্জের বাস। এই জাতির একটার নাম সেনেকা। এই সেনেকা ইরোকোআদের সমাজে মার্কিন পণ্ডিত মর্গ্যান বহুকাল বসবাস করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি “সেনেকাদের একজনা” রূপেই পরিগণিত হন।

সেনেকাদের সমাজে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীকে বিবাহ করিত। এক নারীর বহু স্বামী অথবা এক পুরুষের বহু পত্নী— এই প্রথা প্রচলিত ছিল না। বিবাহের বন্ধন অতি সহজেই হুই তরফ হইতেই ছিঁড়িয়া ফেলা সম্ভব ছিল। স্ত্রী-বর্জন বা স্বামী-বর্জন বিশেষ কঠিন ছিল না।

এই ধরনের পরিবারের বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন চিনিয়া লইতে বিশেষ কোন কষ্ট বয়স্কদের দরকার হইত না। কিন্তু আমরা এই সকল শব্দে যে ধরনের কুটুম্বিতা বুঝিয়া থাকি ইরোকোআরা ঠিক সেই ধরনের কুটুম্বিতা বুঝিত না। ইহাদের

পারিবারিক জীবনে আর কুটুম্ব জ্ঞানে এক বিচিত্র অমিল দেখিতে পাই।

ইরোকোআরা পুত্র কন্যা বলিলে নিজের ছেলে মেয়ে ত বুঝেই অধিকন্তু ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও এই সমাজে পুত্র কন্যা রূপে অভিহিত হয়। ভ্রাতৃপুত্র এবং ভ্রাতৃপুত্রীরাও ইরোকোআকে পিতা বলিয়া ডাকে। কিন্তু ভগ্নির ছেলেমেয়েরা তাহার পক্ষে ভগ্নির পুত্র কন্যাই বটে, আর ইহারাও তাহাকে মামা বলিয়া ডাকে।

অথচ ইরোকোআ নারী তাহার নিজের ছেলেমেয়েকে যে নামে ডাকে তাহার বোনের ছেলেমেয়েকেও সেই নামেই ডাকে। আবার বোনের ছেলেমেয়েরাও তাহাকে মা বলিয়াই ডাকে। কিন্তু তাহার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা তাহার নিকট ভাইপো ভাইজীই বটে, আর ইহারাও তাহাকে পিসি বলিয়া জানে।

এদিকে দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে ভাই-বোন বলিয়া জানে। আবার দুই বোনের ছেলেমেয়েরাও পরস্পর পরস্পরকে ভাইবোন বলিয়া ডাকে। কিন্তু বোনের ছেলে-মেয়েরা ভাইয়ের ছেলেমেয়েদিগকে, আর ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা বোনের ছেলেমেয়েদিগকে সাধারণ ভাইবোন বলিয়া ডাকে না। মামাত, পিস্তৃত ভাই বোন শব্দ এই সম্বন্ধের পরিচয় দেয়।

ইরোকোআ সমাজের আত্মীয়তা সূচক শব্দগুলার নিকট এক দূর সম্বন্ধত বুঝাই অধিকন্তু রক্তের ঐক্য পার্শ্বক্যও এই সকল শব্দে পরিভাররূপে ধরা যায়।

ইরোকোআদের ভাবাসম্পদ আশ্চর্যজনক। আত্মীয়তাসূচক শব্দগুলার দ্বারা এক এক ব্যক্তির শতাধিক কুটুম্বের পরিচয়

লগ্না যায়। মার্কিন ইণ্ডিয়ানদের মতনই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের কুটুম্বাচক শব্দগুলো যারপরনাই ব্যাপক। দক্ষিণাত্যের ড্রাবিড় এবং উত্তর ভারতের গৌড় জাতীয় নরনারীর সমাজে আমেরিকার সেনেকা জাতীয় শব্দের জুড়িদার অনেক। প্রায় দুই শত ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয়ের জন্ত তামিল এবং ইরোকোয়া সমাজে একই প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আবার, কি আমেরিকায়, কি দক্ষিণ ভারতে,—বিবাহ পদ্ধতির নিয়মে যে ধরণের আত্মীয়তা কায়েম হইবার কথা, ঠিক সেই ধরণে উহা কায়েম হয় না। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের একটা বিরোধ দেখা যাইতেছে।

এই ধরণের বিচিত্র আত্মীয়তা, সামাজিক সম্বন্ধ বা কুটুম্ব-জ্ঞানের কারণ কি? পারিবারিক জীবনে আর কুটুম্ব-জ্ঞানে বিরোধ আসিল কোথা হইতে? আমেরিকায়, এশিয়ায়, এমন কি আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায়ও,—একদম ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নরনারীর ভিতর একই ধরণের কুটুম্ব-জ্ঞান দেখা যাইতেছে। আবার এই কুটুম্ব-জ্ঞানের সঙ্গে পারিবারিক পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই তথ্যের একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বাহির করা আবশ্যক।

ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাক্লেনান এই সকল আত্মীয়তা-বাচক শব্দগুলিকে নিরর্থক শব্দ মাত্র রূপে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টা গভীর ভাবে উন্মোচন করিতে চেষ্টা করাই কর্তব্য। বাপ, ছেলে, ভাই, বোন ইত্যাদি শব্দে নেহাৎ পাছাপাছেরে সমানমূল্যক শব্দ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। কেননা এই সকল সমাজে শব্দগুলার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা

সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জ্ঞানও অর্জিত আছে। ম্যাক-লেনান সেদিকে নজর না দিয়া তুল করিয়াছেন।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত হাওয়াই দ্বীপগুলার উনবিংশ-শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই সেনেকা-তামিল (আমেরিকান ড্রাবিড়) ধরণের “কুটুম্ব-জ্ঞান-ওয়ালা” পরিবার বসবাস করিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপবাসীদের নিজ “কুটুম্ব-জ্ঞান”টা তাহাদের পারিবারিক জীবনের অঙ্গরূপ নয়। সেনেকা-তামিল সমাজে পারিবারিক সম্বন্ধে আর কুটুম্ব-জ্ঞানে যেমন একটা অমিল আছে, হাওয়াই সমাজেও সেইরূপ পারিবারিক সম্বন্ধে আর কুটুম্ব-জ্ঞানে একটা অমিল দেখা যায়। হাওয়াই দ্বীপে ভাই এবং বোনের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ভাই বোন বলিয়া জানে। ইহাদের জনক জননীর সকল ভাই বোনই ইহাদের হিসাবে বাপ মা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এখানকার “পরিবার জীবনটা” সেনেকা-তামিল-দের “কুটুম্ব-জ্ঞানে”র সঙ্গে মিলে।

অর্থাৎ সেনেকা সমাজে পারিবারিক জীবন আগাইয়া আসিয়াছে কিন্তু কুটুম্ব-জ্ঞান এখনও কোনো সাবেক কালের পারিবারিক জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। সেই সাবেক কালের পরিবার হাওয়াই সমাজে দেখা যাইতেছে। আবার হাওয়াই সমাজের কুটুম্ব-জ্ঞান আরও কোনো পুরাণো পারিবারিক জীবনের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সেই পুরাণো পারিবারিক জীবনের পরিচয় দুনিয়ার কোনো সমাজে আজকাল পাওয়া যাইবে কিনা সম্ভেহ। কিন্তু নিশ্চয়ই জগতের কোথাও না কোথাও এইরূপ পরিবার ছিল। তাহা না হইলে তাহার অঙ্গরূপ বৃত্তান্তের গোড়ার কথা কুটুম্ব-জ্ঞান আসিল কোথা হইতে ?

এই সমস্তই জবাব দিয়াছেন মর্গ্যান। তাঁহার মতে পরিবার, বিবাহ পদ্ধতি, রক্তসম্বন্ধ সর্বস্বাই বদলাইতেছে। পারিবারিক জীবন বা যৌন সম্বন্ধ কোনো এক খুঁটার দাঁড়াইয়া নাই। জী পুরুষের যোগাযোগ স্তরে স্তরে উঠিতেছে। গোটা সমাজ যেমন এক ধাপ ছাড়াইয়া আর এক ধাপে গিয়া ঠেকিতেছে নরনারীর পারিবারিক ভিত্তি বা বিবাহ প্রথাও সেইরূপ এক ধাপ ছাড়াইয়া আর এক ধাপে গিয়া পৌছিতেছে।

কিন্তু আত্মীয়তা, সামাজিক সম্বন্ধ বা কুটুম্ব-জ্ঞানকে মর্গ্যান গতিশীল পরিবারের উন্টা বিবেচনা করেন। সামাজিক সম্বন্ধে বড় শীঘ্র নড়ন চড়ন দেখা যায় না। কুটুম্ব-জ্ঞান যারপরনাই স্থিতিশীল। পারিবারিক জীবনে মহা পরিবর্তন সাধিত হইবার অনেক পরে হয়ত আত্মীয়তা সম্বন্ধে নরনারীর হ'স হয়। সামাজিক সম্বন্ধে পরিবর্তন গড়াইতে বহু দিন লাগে। এক কথায়, পরিবার চলিতেছে, কুটুম্ব-জ্ঞান দাঁড়াইয়া আছে।

জাৰ্মান ধনবিজ্ঞানবিৎ কাল মার্কস্ এই উপলক্ষ্যে একটা সাধারণ সূত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন :—“কুটুম্ব-জ্ঞান, সামাজিক সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাই মানব জীবনের একমাত্র স্থিতিশীল, কুন্তকর্ণ নয়। জগতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অস্থাপন, ধর্ম-পদ্ধতি এবং দার্শনিক মতবাদ সবই এইরূপ গতিহীন। এই অচলান্বতন-জ্বলাকে নড়ুন চড়ুন সহাইতে অনেক সময় লাগে।”

পরিবার ক্রমে ক্রমে বদলাইতে থাকে। কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধ “জীবাশ্ম” পরিণত হয়,—অর্থাৎ “সেকেলে” “বাপদাদাদের আমলের” একটা কিছু থাকিয়া যায়। ফরাসী জীবতত্ত্ববিৎ হিবে প্যারিসের নিকট “মাসু'পিয়ান” (খলে-বাহী) জানোয়ারের

(বধা কাকাক) কতকগুলো হাড় পাইয়াছিলেন। সেইজন্য দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ক্রমে কোন যুগে কাকাক-জাতীয় জানোয়ারের আবাস ছিল। সেইরূপ নৃত্য-বিভার আলোচনায়, যখনই আমরা কোথাও কোন প্রকার আত্মীয়তার সন্ধান পাই তখনই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সেই আত্মীয়তার সাক্ষী স্বরূপ একটা পারিবারিক জীবন সেখানে ছিলই ছিল। পুরাণো পরিবারপ্রথা, বিবাহপদ্ধতি বা যৌনসম্বন্ধ আবিষ্কারের পক্ষে আত্মীয়তা, কুটুম-জ্ঞান বা সামাজিক সম্বন্ধ (এবং সেই সকল সম্বন্ধবাচক শব্দগুলো) বিশেষ সহায়।

ইরোকোয়া সমাজে তাই এবং বোন কোনো মতেই একই ছেলে মেয়ের বাপ মা বিবেচিত হইবে না। কিন্তু হাওয়াই সমাজে হইয়া থাকে। অবশ্য দুই সমাজেই যে কোনো ছেলে বা মেয়ের একাধিক বাপ এবং একাধিক মা দেখিতে পাই। এইরূপ বিচিত্র পারিবারিক গঠনের কথা সুদী-সমাজে পূর্বে জানা ছিল না।

এতদিন পণ্ডিতেরা তিন প্রকার পরিবার গঠনের কথা জানিতেন। প্রথমতঃ, যে পরিবারে এক পুরুষের এক স্ত্রী; দ্বিতীয়তঃ, যে পরিবারে এক পুরুষের বহু স্ত্রী; এবং তৃতীয়তঃ, যে পরিবারে এক স্ত্রীর বহু স্বামী। কিন্তু সেনেকা এবং হাওয়াই নরনারীর পারিবারিক জীবন আবিষ্কৃত হইয়া মাত্র বুঝা গেল যে, ভগতে এমন যুগও গিয়াছে যখন একই সঙ্গে একপুরুষের বহু স্ত্রী এবং একই স্ত্রীর বহু স্বামী থাকিত। তাহা না হইলে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে বহু পুরুষকে বাপ এবং বহু স্ত্রীকে মা বলিবে কেন? অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা তখন সমাজের সাধারণ বা বোধ

কথাটা অনেকাংশে ঠিক। কিন্তু জানোয়ারদের দৃষ্টান্ত হইতে মানুষের অতীত যুগ সম্বন্ধে কোনো মত প্রচার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক-পুরুষ-পাখী জী-পাখীর সঙ্গে স্থির ভাবে “যর করে”। তাহার কারণ গর্ভাবস্থায় জী-পাখী একদম অসহায়। এইরূপ শারীরিক কারণে শিরদাঁড়াওয়ালা জীবজন্তুগণা যৌন সংসর্গ সম্বন্ধে অনেকটা বাধাবোধি মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পাখীর সমাজে এক-পতিষ বা এক-পত্নীষ রহিয়াছে বলিয়া মানুষের সমাজেও প্রাচীন কালে সেইরূপ ছিল এরূপ ভাষা চলিতে পারে না। মানুষ পাখীর সমান নয়।

এক-পত্নীষ বা এক-পতিষ যদি “পরম ধর্ম” বিবেচিত হয় তাহা হইলে বিষ্ঠার পোকা জগতে অধিতীয়। এই পোকা ৫০, ৬০, বা ২০০ টা গিটের সমষ্টি বিশেষ। প্রত্যেক গিটেই পুরুষ এবং জী যৌনি এক সঙ্গে বর্তমান। প্রত্যেকটাই দিনরাত সন্তানের জন্ম দিয়া থাকে। এক পোকার সঙ্গে অন্য কোনো পোকার মেলামেশার দরকার হয় না। কাজেই বহু-পত্নীষ বা বহু-স্বামীষ ইত্যাদি “পাপ ধর্ম” ইহার ত্রিসীমানার আসিতে পারে না।

কিন্তু শুভপায়ী জানোয়ারদের সমাজে কি দেখি? যৌন সংসর্গের অন্তিম রূপ। অবাধ ভোগ দেখা যায়। একটা দলের সঙ্গে আর একটা দলের যোগাযোগ দেখা যায়। একটা পুরুষের ভোগে বহু জীকে দেখিতে পাই। অবশ্য এককম খাটি এক-পত্নীষ।

কটা জীর ভোগে বহু পুরুষ বহু একটা দেখা যায় না। অর্থাৎ বহু-পতিষ প্রথাটা মানুষেরই খাস আবিষ্কার। তবে ইরোরাপের জী “কুকু” (কোকিল), ওলা একই

হাতুতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন মরদের সঙ্গে বসবাস করে। কিন্তু “কুকু”দের এই প্রথাকে মানব-সমাজে প্রচলিত বহু-পতিত্বের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কেননা মানব-সমাজে একই বাড়ীতে একটা জীব সঙ্গে বহু পুরুষ একত্র ঘর করে। পুরুষেরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধু ভাবেই মিলে মিশে। কিন্তু পুরুষ “কুকু”রা কোনমতে এক ঠাই হইলে কামড়াকাষড়ি করিয়া মরে।

জানোয়ারদের ভিতর বানরগুলিই মানবজাতির নিকট আত্মীয়। এই বানর-সমাজেও অশেষ প্রকার যৌন সংসর্গের রীতি দেখা যায়। বানরদের ভিতরও আবার যেগুলো “অ্যাডু-পয়েন্ড” অর্থাৎ বিলকুল মাহুকেরই মাসতুত ভাই স্বরূপ তাহাদের যৌন সংসর্গ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। লভূর্ণ্যো বলেন, এগুলির ভিতর বহু পত্নীত্ব প্রায়ই দেখা যায়। সোভিয়েতের মতে ইহারা এক পত্নীক। “মানব-সমাজের বিবাহ পদ্ধতি” নামক গ্রন্থে (১৮২০) ফ্রেডার মার্ক “অ্যাডু-পয়েন্ড” সম্বন্ধে যে সকল তথ্য দিয়াছেন তাহার জোরেও একটা শেষ যীমাংসা করা কঠিন।

মূধ বনাম বোনি

লভূর্ণ্যো কাজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভক্তপারী জীবের সমাজে মাথা বা বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে যৌন সংসর্গের কোনো সম্বন্ধ নাই। কন্নাসী পণ্ডিত এম্পিরা তাঁহার “সোসিয়েতে জাণিমালা” (পঞ্চ সমাজ) গ্রন্থে (১৮৭৭) খোলাখুলি বলিয়াছেন — “মূধ বা দলই জানোয়ারদের ভিতর চরম সমাজ-কেহ। মূধত্বের বোধ হয় কতকগুলো পরিবারের সম্বন্ধে। কিন্তু মূধের

সঙ্গে পরিবারের আদায় কাঁচকলার সম্বন্ধ। দুইয়ের ক্রমবিকাশের গতি উন্টা দিকে।”

এম্পিনার মতটা আরও বিশেষরূপ বিবৃত হইতেছে। ইনি বলেন—“পরিবার যদি দৃঢ় হয় তাহা হইলে যুধ শিথিল হইবে। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন যেখানে নরম অর্থাৎ যেখানে যৌন সংসর্গ অবাধ চলিতে পারে সেখানে যুধ খুব প্রবল। যুধ গড়িয়া উঠিতে পারে কখন? যখন ব্যক্তির পরিবারের বন্ধন হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। এই কারণেই পাখীর সমাজে যুধ দেখা যায় না। কিন্তু শুভ্রপায়ী জানোয়ারদের ভিতর মাঝে মাঝে যুধ দেখিতে পাই। তাহার কারণ এই যে, ইহারা মাঝে মাঝে পরিবারের বাঁধাবাধি হইতে ছাড়া পায়। আসল কথা—দল বা যুধ গড়িয়া উঠিবার বিকল্পে প্রধান বাধা পারিবারিক টান।”

এম্পিনার মত আরও তলাইয়া বুঝিলে জানোয়ারদের সামাজিক ক্রমবিকাশের শক্তিগুলা হাতে হাতে ধরা পড়ে; তিনি এই উপলক্ষ্যে আরও বলিয়াছেন :—“লক্ষ্য করিয়া দরকার নাই। বেশ স্পষ্টভাবে স্বীকার করা উচিত যে, পরিবারের চেয়ে উচ্চ কোনো সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে পারে কেবল তখন,—যখন পারিবারিক জীবনটাই অনেক বদলাইয়া যায়! পারিবারিক টান অটুট রহিয়াছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চতর দলগত জীবন-কেন্দ্র বেশ শক্তভাবেই গড়িয়া উঠিল একরূপ হইতে পারে না।”

জানোয়ারদের ভিতর দল এই জন্তই বড় বেশী স্বাধীন হয় না। পুরুষগুলা নিজ জী সঘনো অস্তিত্ব পুরুষের একত্বতার সহিতে পারে না। কাকেই দল শীত শীত ত্যাগিয়া যায়। অন্ততঃ পক্ষে যৌন সংসর্গের কল্পে নবের অতিশয় লোপ পায়। তখন পুরুষেরা

নিজ নিজ জী লইয়া “একলা ঘর” করে। পরস্পর হিংসা করা
জানোআর-জীবনের বিশিষ্ট কথা।

প্রাচীন মানবের সংগঠন

প্রাচীন কালের মানব-সমাজকে জানোআরদের সমাজের সঙ্গে
তুলনা করা চলে কি? কোনো মতেই না। জানোআরের
জীবনে পরিবারই আসল কথা, কিন্তু প্রাচীন মানবের জীবনে
আসল কথা দল বা সমাজ বা সম্ব। তখনকার দিনে মাছুষ
নেহাৎ অসহায় অবস্থায় ছিল। জগতের অসংখ্য বিপজ্জনক
শক্তিপূর্ণ হইতে আত্মরক্ষা করা ছিল তাহার জীবনের প্রধান
কাজ। এই অবস্থায় কোনো জীর সঙ্গে “একলা ঘর করা”
তাহার পক্ষে অসাধ্য এবং অসম্ভবই ছিল। নানা ব্যক্তি সমবেত-
ভাবে জীবন-যাত্রার, অল্প দৃঢ়বদ্ধ হইলেই প্রাচীনকালে মানবের
পক্ষে জীবন ধারণ সম্ভবপর হইত। অতএব জানোআর-সমাজের
দৃষ্টান্তকে প্রাচীন মানব-সমাজের সাক্ষী বা জুড়িদার বিবেচনা
না করিয়া ঠিক তাহার উল্টা বিবেচনা করাই কর্তব্য।

প্রাচীনকালে মাছুষেরা এইরূপ বড় বড় দল পড়িতে পারিয়া-
ছিল কি করিয়া? প্রধান কারণ এই যে, পুরুষেরা জীতোপ সম্বন্ধে
পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া মরিত না। জী লইয়া হিংসা
করিতে থাকিলে মাছুষের বৃথগুলা জানোআরদের বৃথের মতনই
দুর্বল থাকিত; তাহা-হইলে মাছুষের সমাজে বহুকালব্যাপী দল
কোনো মতেই তিষ্ঠিতে পারিত না। জানোআরদের বৃথের মতন
মাছুষের সামাজিক কেজ্জুলাও কণে কণে তাকিয়া বাইত।

কল্লনা, অজ্ঞান বা জানোআরদের সঙ্গে তুলনা হাড়িয়া দিয়া

খাটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভর করিলে বাস্তবিক পক্ষে মামল জাতির বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে কি দেখিতে পাই? প্রাচীনতম কালের নরনারী “দলে দলে” বিবাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। এক সমাজ, গোষ্ঠি বা কেন্দ্রের সকল পুরুষের সঙ্গে অপর কোনো সমাজ, গোষ্ঠি বা কেন্দ্রের সকল স্ত্রীর বিবাহ হইত। অর্থাৎ ঐ দুই দলের যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারীর স্বামী বিবেচিত হইতে পারিত। এই ব্যবস্থায় পুরুষে পুরুষে অথবা নারীতে নারীতে “পর-স্ত্রী” বা “পর-পুরুষ” লইয়া হিংসা এক প্রকার জন্মিতেই পারিত না। পরবর্তীকালে বহু-পতিত্ব প্রথার পরিচয় পাই। এই ব্যবস্থায়ও পুরুষে পুরুষে হিংসার কেন্দ্র নাই বলিলেই চলে। কাজেই জানোয়ারের জীবনে এইরূপ বহু পুরুষের এক স্ত্রী-ভোগ দেখা যায় না।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের ভোরে যে সকল দলগত বিবাহ প্রথার বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে তাহার ভিতর অনেক সামাজিক জটিলতা এবং কিছুতকিমাকার ইয় বর ল দেখা যায়। ইরোকোয়া এবং হাওয়াই সমাজের বিচিত্র কুটুম্ব-জ্ঞান এবং বিবাহ-প্রথার আর কুটুম্ব-জ্ঞানের অমিল দেখিয়া সেই সকল অদ্ভুত কাণ্ডের কিছু কিছু ধারণা করিতে পারি। তাহার ফলে স্বতঃই বিশ্বাস করিতে প্ররম্বিত হয় যে, এই সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম প্রথার পূর্ববর্তী কালে অপেক্ষাকৃত সরল যৌনসংসর্গের যুগ ছিল। সেই যুগকে “অবাধ বিবাহের কাল” বলা যাইতে পারে।

জানোয়ারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লভূর্ণো আমাদিগকে অবাধ যৌনসংসর্গের বিপক্ষে প্রমাণ দিতেছিলেন। কিন্তু জানোয়ার

জীবনে হিংসা প্রবৃত্তির আলোচনা করিতে করিতে আমরা ঠিক-
তাহার উন্টা সিঁদান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। বুঝিতেছি “প্রাগৈতি-
হাসিক” যুগে যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো স্ত্রীকে ভোগ করিতে
অভ্যস্ত ছিল।

অবাধ যৌনসংসর্গ

“অবাধ যৌনসংসর্গ” কাহাকে বলে ? এক কথায়,—বর্তমান
মানবের সমাজে সুপরিচিত বাধাবিহীন বা আপত্তিগুলা তখনকার
দিনে প্রচলিত ছিল না। হিংসা একটা মস্ত বাধা। প্রাচীনতম
অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালে হিংসা পরিবার দিকে মানুষের
খেয়াল বা সুযোগ ছিল না। হিংসা না করাই জীবনসংগ্রামের
প্রধান অস্ত্র বিবেচিত হইত। হিংসা পরবর্তী কালে মানব-সমাজে
দেখা দিয়াছে। হিংসা বলিলে পর-স্ত্রী সম্বন্ধে লোভ এবং নিজের
স্ত্রীকে পরপুরুষ হইতে সামলাইয়া রাখা এই দুই মনোভাব বুঝিতে
হইবে।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আজকালকার দিনে
ভাইয়ে বোনে, মায়ে বেটায় অথবা বাপে-মেয়েতে যৌনসংসর্গ
প্রায় সর্বত্রই মহাপাপ, অশুভ বা কুরুত্ব। কিন্তু তখনকার দিনে
এই দিকেও কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। ভাইয়ের পত্নী হইত
বোন। বর্তমান জগতেও কোনো কোনো সমাজে সম্মানসম্মতিয়া
জনকজননীর সঙ্গে যৌনসংসর্গ চালাইয়া থাকে। বেরিং প্রণালীর
অধিবাসী কাক্সিরাং, আলাস্কার কাদিয়াক, এবং কানাডার তিরে
জাতি এইরূপ বাপেমেয়ের এবং মায়েপোষের সংসর্গ মানিয়া চলে।
এইরূপ সংসর্গ চিলেওয়ে “ইণ্ডিয়ান”, চিলি দেশের কুকু,

কারিবিদ্যান জনপদের অধিবাসী এবং ইম্বোচীনের কারেন ইত্যাদি সমাজেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাচীন গ্রীক, রোমান, পার্শিয়ান, পারসীক, হুণ ইত্যাদি জাতীয় “পুরাণে” এই সংসর্গের গল্প অনেক আছে।

এই সংসর্গগুলোকে মানব জাতি অর্ধপ্রাচীন কালে পাপ বলিয়া “আবিষ্কার” করিয়াছে। কিন্তু এই আবিষ্কারের পূর্বে অথবা যে সমাজে এই আবিষ্কার সাধিত হয় নাই সেই সমাজের বিবাহ প্রথা বা পারিবারিক জীবনকে অবোধ যৌনসংসর্গের পঙ্কতি বলা হইতেছে। এইখানে আর একটুকু পরিষ্কার হওয়া আবশ্যিক। যে-কোনো নারী যে-কোনো পুরুষের ভোগ্যা—এই সামাজিক ব্যবস্থায় সর্বদাই একটা নিয়মবিহীন শৃঙ্খলাবিহীন যৌনসংসর্গের বিধান চলিতেছে এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। এই ব্যবস্থায়ও কিছুকালের জন্য এক এক জোড়া পুরুষ-স্ত্রী একত্র ঘর বা সহবাস করিতেছে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ বর্তমানকালে যেখানে যেখানে “দলে দলে বিবাহ” প্রথা দেখা গিয়াছে সেইখানেই বেশীরভাগ এইরূপ “স্কেড পরিবার”ই নজরে পড়িয়াছে।

হেটোরমার্ক তাঁহার “বিবাহ পদ্ধতির ইতিহাস” নামক গ্রন্থে জগতে কখনো অবোধ বিবাহ বা বাধাবিহীন যৌনসংসর্গের যুগ ছিল না এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে একমাত্র সেই সমাজকেই “বিবাহ” বলা যাইতে পারে যে ব্যবস্থায় পুরুষ এবং স্ত্রী অন্ততঃ প্রথম সম্বন্ধের জন্য পর্যাপ্ত একত্র বসবাস করে। কিন্তু “অবোধ যৌনসংসর্গ” বলিলে অথবা “দলে দলে বিবাহ” বলিলে যাহা বুঝায় তাহাতেও এইরূপ হেটোরমার্ক-বিসৃত “বিবাহ” প্রচলিত থাকি অসম্ভব নয়।

অবাধ যৌন সংসর্গে মোটের উপর তিনপ্রকার সংসর্গ বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ, “জোড়” পরিবারে বসবাস। দ্বিতীয়তঃ, সম্বানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত পুরুষ নারীর একত্রে বসবাস। ইহা “জোড়” পরিবারেই অন্তর্গত। তৃতীয়তঃ, একদম উচ্ছৃঙ্খল সর্ব-বাধাহীন বাধ্যবাধকতাহীন দায়িত্বশূন্য স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গ। সাধারণতঃ এই তৃতীয় অবস্থাকেই অবাধ যৌনসংসর্গের একমাত্র দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটরূপ চিন্তা করা ভুল।

হেস্টারমার্ক বলেন,—সমাজের বিধিনিষেধের বহির্ভূত সকল প্রকার বাধ্যবাধকতাহীন উচ্ছৃঙ্খল যৌনসংসর্গকে বিবাহ বলা চলে না। এই ব্যবস্থায় নাকি কোনো ব্যক্তির চিন্তা স্বাভাবিক-রূপে খেলিতে পারে না, বরং ইহার প্রভাবে ব্যক্তিগত মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি লুপ্ত হইবারই কথা। তাঁহার মতে, যে সমাজে বিধিনিষেধ নাই সেই সমাজ বেজ্ঞাবৃত্তির আশ্রয়দাতা।

কিন্তু হেস্টারমার্কের এই মত গ্রহণীয় নয়। বেজ্ঞালয়ের আবহাওয়া মনে রাখিয়া প্রাচীন মানবের জীবনযাত্রা বুঝিতে অগ্রসর হওয়া অবिवেচকের কার্য্য। বর্তমান মানব যাহাকে হিংসা বলে সে প্রবৃত্তি প্রাচীন মানবের ছিল না। বর্তমান মানব যে সংসর্গকে “ইনসেট” নামক গহিত পাপ বিবেচনা করে, প্রাচীন মানবের চিন্তায় সেই ধারণা জন্মে নাই। বর্তমান মানবের ধারণায় যাহা উচ্ছৃঙ্খল “লাইসেন্স” বিশেষ, যাহা কুনীতি, দুর্নীতি, ব্যভিচার বা বেজ্ঞাবৃত্তি মাত্র—প্রাচীন মানবের চোখে তাহা অন্তরূপ বিবেচিত হইত। এই সকল কথা মনে রাখিলেই “মাস্কাতার আমলের” সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি, লেনদেন এবং পারিবারিক ভিত্তি বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হইবে।

ভাইয়ে বোনে বিবাহ (সমরসংসর্গের যৌন সংশ্রব)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবশ্য যোনিসংসর্গ ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। এই ক্রমিক লোপ নানা আকারে দেখা দেয়। বিভিন্ন পারিবারিক প্রথার ভিতর যোনিসংসর্গের ভিন্ন বাধা বা বিধিনিষেধ প্রকটিত হয়।

মর্গ্যানের মতে সর্বপ্রথম যে পারিবারিক প্রথা গড়িয়া উঠে তাহাকে “বংশগত” পরিবার বলা চলে। একজন পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করিল। ইহাদের পুত্রকন্যারা পরস্পর বিবাহ করিবে। তাহাদের পুত্রকন্যারা অর্থাৎ প্রথম পরিবারের পৌত্র পৌত্রীরাও পরস্পরে বিবাহ করিবে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে বংশের ভিতরই ভাই বোনের বিবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে সন্তান সন্ততির বিবাহ নিষিদ্ধ। ঠাকুরদা ঠান্ডির সঙ্গেও নাতি নাতনীদের বিবাহ নিষিদ্ধ।

এই বিধিনিষেধের ব্যবস্থায় এক ভাইয়ের সঙ্গে মাত্র এক বোনের বিবাহ চলিতে পারে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না। বড়দা, ছোটদা, মেজদা, খুড়তুত ভাই, ভাণ্টতুত ভাই, মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই, ইত্যাদি ভাই পর্যায়ে যেরূপে কোন পুরুষ ঐ ধরনের বোন পর্যায়ে কোনো স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারে। “বংশগত পারিবারিক প্রথা” আসল কথা ভাই-বোনের যোনিসংসর্গ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মান সমাজতত্ত্বক অপেরহালেকের দ্বারা প্রাচীন ঋগ্বেদনাট্য (টিউটনিক) “নিবেলুড” পুরাণ

অবলম্বন করিয়া শিল্প প্রসিদ্ধ গীত-নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচনায় ভাইয়ে বোনে প্রেমের কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে। সম-সাময়িক নীতিজ্ঞদের আওতায় হ্যাগার একটা বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় দেখিতে পাই :—“ভাই বিবাহের যোগ্য। বোনকে জ্বরূপে আলিঙ্গন করে, এই অদ্ভুত ঘটনা। জগতে কেহ কখনো দেখিয়াছে শুনিয়াছে কি? হ্যাগারের দেবদেবীরা “নবরচিত” উচ্ছৃঙ্খল প্রেম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বস্তুতঃ করিতেছেন। বস্তুতঃ হ্যাগার এইখানে প্রাচীন সমাজের রীতি-নীতি ভুল বুঝিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি নিবেলুড পুরাণাবলীর নব্বটা ঠিক ধরিতে পারেন নাই।

১৮৮২ সালের প্রকাশিত সংস্করণে হ্যাগারের ভুল দেখাইয়া মার্কস্ বলিয়াছেন :—“মাক্কাতার আমলে বোনই ছিল ভাইয়ের পত্নী। আর ইহাই ছিল তখনকার দিনের নীতিসম্মত বিধান।” হ্যাগারের একজন ফরাসী সমালোচক মার্কের বিরুদ্ধে জানাইয়া-ছিল যে, “এগিসড্রেকা” নামক টিউটনিক পুরাণে লোকি ক্রুয়াকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন :—“নির্লজ্জ বেহায়া তুই! দেবতাদের সম্মুখে তুই তোরা ভাইকে আলিঙ্গন করিয়াছিস্!” তাঁহার মতে সেই পুরাণে ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ। হ্যাগার এই পুরাণের তথ্যই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে বাস্তবিক ঠিক উল্টা। এগিসড্রেকা পুরাণটা প্রাচীন বটে, কিন্তু সেটা তাহার পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় নেহাৎ নবীন। সেই প্রাচীনতর সমাজে যে রীতি নীতিসম্মত ছিল তাহা এই নবীন পুরাণে নিম্নিত হইয়াছে। সেই সমাজটার নিয়ম বুঝিতে না পারিয়া হ্যাগার গোলে পড়িয়াছেন।

“এগিন্ড্রেকা” পুরাণে আরও ভাই-বোনের বিবাহ কাহিনী আছে। “বন” দেশের দেবতারা ভাইয়ে বোনে বিবাহ দেয়। কিন্তু “অস” দেশের দেবতারা তাহার বিরোধী। কাজেই টিউটনিক পুরাকাহিনীর যে চিত্র “এগিন্ড্রেকা”তে পাওয়া যায় তাহাতে যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব চলিতেছে বুঝিতে হইবে।

ছায়াবেরের মতন ভুল মহাকবি গোটেও করিয়াছিলেন। গোটে তাঁহার “বায়াজের” নামক কাব্যে “দেবদাসী” প্রথাটি আধুনিক চোখে দেখাইয়াছেন। প্রাচীন সমাজে নারীর সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি “বায়াজেরকে” প্রায় বেষ্ঠায় পরিণত করিয়াছেন।

ভাই-বোনের যৌন-সংসর্গ জগতে আর দেখা যায় না। বংশগত বিবাহ বা সমরস্কন্ধ যৌনসংজ্ঞাব একদম লুপ্ত হইয়াছে। নেহাং আদিম অবস্থার জনসমাজেও এই প্রথার অস্তিত্ব নাই। তবে সমগ্র পলিনেশিয়ায়, হাওয়াই সমাজের আত্মীয়জ্ঞান, কুটুম্বিতা ইত্যাদি আজও যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা চলে যে, কোন না কোন দিন সেই প্রথা এই সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ধরণের বংশগত বিবাহ প্রথা পায় হইয়াই প্রাচীনতম অবাধ যৌনসংসর্গের নিয়ম পরবর্ত্তী কালে অভ্যস্ত প্রথার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুনালুয়া পরিবার

বংশগত বিবাহের প্রথায় বাপমার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ। অবাধ বিবাহে এই প্রথম বাধা। ভাইয়ে বোনে সংসর্গ নিষেধ বিবাহের ইতিহাসে দ্বিতীয় বাধা।

কিন্তু এই নিষেধ জারি হইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। ভাই বোনদের বয়স সাধারণতঃ প্রায় সমান। কাজেই সংসর্গের যৌক অতি সহজ ও স্বাভাবিক।

অবাধ বিবাহে বাধা

প্রথমেই মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে। প্রথমে মাত্র দু'এক পরিবারে এই বাধা সৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ বাধাটা সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছিল বিবেচনা করা চলিতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পর্য্যটকেরাও হাওয়াই সমাজে কয়েক স্থলে ভাই বোনের বিবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক একে একে খুড়তুত, মাসতুত ইত্যাদি অশ্রান্ত ভাই পর্য্যায়ের পুরুষের সঙ্গে সেই শ্রেণীর কস্তার যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মর্গ্যান বলেন :—“ভাই বোনের যোনিসংসর্গ বন্ধ করিয়া মানবজাতি প্রকৃতিকে নির্বাচনের কর্মক্ষেত্রে—অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে বিজয় লাভের এক বড় অস্ত্র কায়ম করিয়াছিল।” যে সকল জাতি এই নিষেধ মানিত তাহারা অবাধ বিবাহশীল জাতিগুলাকে ছাড়াইয়া—এমন * কি জোড় পরিবারওলা সমাজকেও পেছনে ফেলিয়া ক্ষুদ্র অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

এই নিষেধই পরবর্তী কালে “গেন্স,” “গেনোস” বা গোষ্ঠী প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে; জগতের সকল “বার্কার” সমাজে গোষ্ঠীর প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম গোষ্ঠীর স্তর ছাড়াইয়া উৎকর্ষের যুগ প্রথম শুরু করে।

মাকাতার আমলে পরিবারগুলা চিরকাল এক অঞ্চল ঘোঁষ সমষ্টি রূপে টিকিতে পারে নাই। কয়েক পুরুষের ভিতরই ভাগাভাগি শুরু হইয়াছিল। “বার্কার” যুগের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘোঁষ সমবেত পরিবারজীবন চলিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও পরিবার বৃদ্ধির একটা সীমানা ছিল। বৃহত্তম পরিবারগুলাও একটা নির্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইত না। ক্রমসক্রম খাওয়াপরা ব্যবস্থা করার প্রয়োজনেই পারিবারিক আয়তনের সীমারেখা টানা হইয়া পড়িত।

ক্রমশঃ বোনিসংসর্গে বিধিনিষেধ দেখা দিল। “শীল” জ্ঞান সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। মায়েদের পেটের ভাই বোনদের ভাগাভাগি হওয়া, আলাদা আলাদা থাকা, স্বনীতির অঙ্গ বিবেচিত হইল। খাওয়াপরা, ভাগবাটোআরার সঙ্গে ভাই-বোনদের পৃথক্-করণ পারিবারিক ও সমাজিক জীবনে একদম নতুন ধরণধারণ সৃষ্টি করিল।

ভাইয়েরা কতকগুলা স্বতন্ত্র পরিবারের এবং ক্রমশঃ বংশের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অপর দিকে বোনেরাও ঠিক এইরূপ কতকগুলা স্বতন্ত্র বংশের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মর্গ্যান এক প্রকার পারিবারিক জীবনকে “পুনালুয়ান” প্রথা রূপে বিবৃত করিয়াছেন। সেই প্রথা ভাইবোনের ভাগাভাগি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী যুগের বংশগত পরিবার “পুনালুয়ান”

পরিবারের জনক। “পুনালুয়া” শব্দের অর্থ “নিকট আত্মীয়” বা “ঘনিষ্ঠ সহচর”।

হাওয়াই সমাজে বোন পর্যায়ের সকল নারী (নিজের মায়ের পেটের ভাই ছাড়া এবং নিজের জনক পর্যায় ছাড়া) সকল পুরুষকে বিবাহ করে। ইহারা সকলেই এই স্বামিগণের ঘোঁষ পত্নী। এই স্বামীরা পরস্পরকে ভাই বলিয়া ডাকে না। “পুনালুয়া” বা নিকট আত্মীয় এই শব্দ ব্যবহার করিয়া ইহারা পরস্পরে সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকে।

সেইরূপ ভাই পর্যায়ের পুরুষেরাও (নিজের মায়ের পেটের বোন ছাড়া এবং নিজের জননী পর্যায় ছাড়া) সকল নারীকে বিবাহ করে। ইহারা সকলেই এই পত্নীগণের ঘোঁষস্বামী। পরস্পরের ভিতর সংসর্গ অবাধ। পত্নীরা পরস্পরকে বোন বলিয়া ডাকে না,—ডাকে “পুনালুয়া” বা নিকট আত্মীয় বলিয়া।

এই পুনালুয়া পরিবার কালে অজ্ঞান রূপ গ্রহণ করে। আপন ভাই বোনে বিবাহ নিষেধ করিয়া মানবজাতি এই প্রথা নষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু এই সমাজের পরিবারেরা ঘোঁষ, অর্থাৎ যে কোনো পুরুষ যে কোনো স্ত্রীর স্বামী। এই হিসাবে অবাধ যোনিসংসর্গ বিশেষ প্রবল।

ইরোকোআদের “সেকাল”

আমেরিকার ইরোকোআ সমাজে যে ধরণের কুটুম্ব-জ্ঞান বা আত্মীয়তার পরিচয় পাই তাহার মধ্যে “পুনালুয়া” পরিবারের যোনিসংসর্গ থাপ থায়।

ইরোকোআ নারী তাহার বোনের ছেলেপুলেকে নিজের

ছেলেপুলে বলিয়া ডাকে। পুরুষ তাহার ভাইয়ের ছেলেপুলেকে নিজের ছেলেপুলে বলিয়া ডাকে। আর দুই দিককার ছেলেপুলেরা পরস্পর ভাইবোন। কিন্তু ইরোকোআ নারী তাহার ভাইয়ের ছেলেপুলেকে ভাইপো ভাইঝি বলিয়া ডাকে। পুরুষও তাহার বোনের ছেলেপুলেকে ভাগ্নে ভাগ্নী বলিয়া ডাকে। আর এই ছেলেপুলেরা পরস্পর মামাত পিসতুত ভাই বোন।

মায়ের পেটের ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষেধই এইরূপ কুটুম্ব-জ্ঞানের গোড়ার কথা। নারীরা তাহাদের বোন পর্যায়ের যে কোনো নারীর স্বামীকে স্বামী বলিয়া জানে। পুরুষেরাও সেইরূপ তাহাদের ভাই পর্যায়ের যে কোনো পুরুষের জীকে নিজের জী বলিয়া জানে। ইরোকোআ সমাজে ইহাই আইন। তবে অনেক সময়ে হয়ত এইরূপ যৌথপতিত্ব বা যৌথপত্নীত্ব কার্যতঃ দেখা যায় না।

কিন্তু ভাইবোনে সংসর্গ নিষিদ্ধ হওয়ায় পূর্বে যাহারা মামুলি ভাই বোন বলিয়া পরিচিত ছিল এখন তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, খাটি ভাইবোনের দল। দ্বিতীয়তঃ, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নীর দল। ইহারা এখন আর ভাই বোন নয়। ইহাদের বাপমাও আর যৌথ বাপ মা নয়। কিন্তু পুরাণো আমলে ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী নামক কুটুম্ব মাতৃয়ের বিবেচনায় ঠাই পাইতেই পারিত না।

ইরোকোআ সমাজে একপত্নীত্ব প্রথায় পরিবার চলিতেছে। অতঃ ইহার কুটুম্ব-জ্ঞানের সঙ্গে এক পত্নীত্বের কোনো সম্বন্ধ নাই। “পুনালুয়া” প্রথায় পরিবার জগতে না থাকিলে ইরোকোআদের কুটুম্ব-জ্ঞান সংসারে দেখা দিত না। জগতের যেখানে যেখানে

এই কুটুম্ব-জ্ঞান প্রচলিত আছে সেই খানেই পুনালুয়া পরিবারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

হাওয়াই সমাজে পুনালুয়া প্রথার পারিবারিক জীবন দেখা গিয়াছে। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের চোখে অবশ্য ইহা এক অতি বীভৎস ছনীতি বিশেষ। এমন কি জার্মান পণ্ডিত বাথোফেনও যেখানে যেখানে অবাধ যোনিঃসর্গের চিহ্ন মাত্র দেখিয়াছেন সেই খানেই “ইনসেট” নামক পাপের উল্লেখ করিয়াছেন। কার্লমার্কস বলেন :—“পুনালুয়া” প্রথার বিবাহকে যদি আজকালকার ‘মভা’ লোকেরা ছনীতির পাপ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হন তাহা হইলে পুনালুয়া পরিবারে অভ্যস্ত লোকেরাও বর্তমান ইয়োয়োপীয় সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহকে জঘন্য ‘ইনসেট’ বিবেচনা করিতে অধিকারী। কেননা মায়ের বা বাপের দিকের নিকট মাসভূত, মামাত, খুড়ভূত, পিসভূত ভাই বোনের মধ্যে খৃষ্টিয়ান সমাজে বিবাহ কম চলে না।”

রোমান সেনাপতি নীজার সমসাময়িক বৃটন জাতির বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। বৃটনরা তখন “বার্কার” যুগের মাঝামাঝি ছিল। দশ বার জন নারী যৌথ ভাবে পুরুষগণের ভোগ্যা বিবেচিত হইত। পুরুষগণের মধ্যে “ভাই” পর্যায়ের লোক থাকিত। “বাপ মা এবং ছেলে পুত্র”ও এইরূপ অবাধ যৌনিঃসর্গশীল মনাজের অন্তর্গত ছিল।

নীজার বিবৃত বৃটনদের “ভাই” শব্দে কি বুঝিতে হইবে? সকলেই আপন মায়ের পেটের ভাই কখন নয়,—কারণ “বার্কার” সময়ের আট দশ ছেলে একসঙ্গে একাধিক নারী ভোগ করিবার উপযুক্ত বয়স পায় না। বরং ইয়োকোআ কুটুম্ব-জ্ঞানের মাফিক

পুনালুয়া পরিবারের “ভাইয়ের” অনেকে একসঙ্গে এইরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। কারণ এই প্রথায় পুরুষের পক্ষে মামাত পিসতুত ভাইয়েরা সকলেই ভাই। সীজারের সময় ব্রিটিশ জাতি পুনালুয়ান স্থরেই বসবাস করিতেছিল অজ্ঞান করিতে হইবে।

সীজারের আর একটা কথা লইয়া গোল বাধিতে পারে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে তখন “বাপ মারা ছেলেপুলে” দের সঙ্গে অবাধ্যনিসংসর্গ করিতে অভ্যস্ত ছিল। হয়ত সীজার সামাজিক অবস্থাটা ঠিক ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু একথাও ঠিক যে “পুনালুয়া” প্রথায় বাপ এবং ছেলে এই দুই পর্যায়ের পুরুষেরা একই নারীর যৌথ স্বামী হইতে পারে। সেই-রূপ মা এবং মেয়ে এই দুই পর্যায়ের নারীরাও একই পুরুষের ভোগ্যা হইতে পারে। পুনালুয়া প্রথায় নিষিদ্ধ কেবল বাপে মেয়েতে আর মায়ে পোয়ে সংসর্গ।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস “স্কাঙ্কেজ” এবং “বার্সার” সমাজের বৃত্তান্তে যৌথপত্নীত্বের বিবরণ দিয়াছেন। এই যৌথপত্নীত্ব সীজারের সময়কার বিলাতী অবাধ্যনিসংসর্গের মতন পুনালুয়া শ্রেণীর কোনো না কোনো দলগত বিবাহেরই নিদর্শন। ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের টিকুর জাতি সম্বন্ধে হ্যাটসন্স এবং কে এই ধরণের কাহিনীও প্রচার করিয়াছেন। ইহাদের বিবরণে প্রকাশ যে “টিকুরেরা যোনি সংসর্গ বিষয়ে বাদ বিচার করে কম। এক জোড়া পুরুষ নারী কখনো কখনো বিবাহিত বলিয়া প্রচারিত হয় বটে,—কিন্তু বিবাহের টান নেহাৎ নরম।”

গোষ্ঠী প্রথার উৎপত্তি

বোধ হয় পুনালুয়া পরিবারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে “গেনস্” বা গোষ্ঠী প্রথার জনক। তবে অষ্ট্রেলিয়ায় এক প্রকার পারিবারিক প্রথা দেখা গিয়াছে,—যাহাকে পুনালুয়ার অনুরূপ বিবেচনা করা যায় না,—অথচ সেই সমাজেও গোষ্ঠী দেখিতে পাই। কাজেই গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক সূত্র চুঁড়িতে হইবে।

প্রত্যেক দলগত বিবাহেই সম্ভানের বাপ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। দলের সকলে ছেলেপুলেই তাহার চিন্তায় সম্মান বটে। কিন্তু আপন ছেলেপুলেকে সে বিশেষরূপেই চিনে; কাজেই যেখানে যেখানে দলে দলে বিবাহ চলে সেখানে বংশানুক্রম একমাত্র মায়ের তরফ হইতে সম্ভব। “স্ত্রীস্বৈর” এবং “বার্কার” সমাজের নিম্নতম স্তরে এই ধরণের বংশানুক্রম দেখা যায়। বাথোফেন এই তথ্যটা সৰ্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা তাঁহার এক আবিষ্কার বিশেষ। তাঁহার পরিভাষায় মায়ের জোরে বংশ পরম্পরার আর পুরুষানুক্রম ও কুটুম্ব-জ্ঞান “মাতৃবিধির” অধীন অবস্থ। মাতৃবিধি বলিলে জননীর যেরূপ আইনসম্বন্ধ একুতিয়ার স্বতই মনে আসে “স্ত্রীস্বৈর” বা “বার্কার” যুগে তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব “আইনে”র কথা না তুলিয়া সাধারণ হিসাবে জননী বিধি শব্দ ব্যবহার করা যাউক।

পুনালুয়া রীতির সমাজ-বন্ধনের একটা চিত্র দেওয়া যাইতেছে। এক নারীর কতকগুলি কন্যা হইল। তাহাদের আবার কন্যা জন্মিল। এই কন্যারা আবার অন্যান্য কন্যাদের

জননী হইল। এইরূপে কন্যার পর কন্যারা, অর্থাৎ দৌহি প্রদৌহিত্রী ইত্যাদি সকলেই পরস্পর বোন বিশেষ। কিন্তু এই সব কন্যার পাল বিবাহ করিবে কাহাদিগকে? নিজ নিজ মায়ের পেটের ভাইয়েরা ইহাদের স্বামী হইতে পারিবে না। এই পর্য্যন্ত স্থির। কিন্তু ভাইয়েরা পুনালুয়া সমাজ-বন্ধনের অন্তর্গত লোকই বটে। সেই আদি নারীর রক্তের জোরে কন্যা, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী ইত্যাদি মেয়েরা এবং প্রত্যেক পুরুষের ভাইয়েরা সকলে মিলিয়া একটা সমাজ-গণ্ডী তৈয়ার করে। সেই সমাজ গণ্ডীই “গেন্স” বা গোষ্ঠী।

এই গেন্স বা গোষ্ঠীর জন্ত যতগুলি স্বামী দরকার তাহার। আসে অন্তান্ত নারী সম্ভূত গেন্স বা গোষ্ঠীর সমাজ হইতে। আর এই গেন্সের “ভাই”-গুলা অন্তান্ত নারী সম্ভূত গেন্সের নারীদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকে। আসল কথা,—কোনো আদি নারীর রক্ত যদি কোন পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতর থাকে,—সে রক্তের পরিমাণ কমই হউক বা বেশীই হউক,—তাহাদের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ। এই ধরনের নিষেধের উপর ভর করিয়া যে সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে তাহাকে অন্তান্ত যথা দর্শনের দোহাই দিয়া আরও শক্ত ও পৃথক করিয়া তোলা হয়।

গোষ্ঠীর উৎপত্তি পুনালুয়া পরিবারের এক অনিবার্য্য ক্রম-বিকাশের ফল। জগতের যেখানে যেখানে গোষ্ঠী প্রথা দেখা যায় সেইখানেই পুনালুয়া পরিবারের অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তি-সম্মত। অর্থাৎ ছনিয়ার প্রায় সকল “বার্কার” এবং “উৎকর্ষ-শীল” সমাজেই “পুনালুয়া” প্রথার বিবাহপদ্ধতির যুগ ঘটিয়া গিয়াছে।

মর্গ্যান যখন তাহার গ্রন্থ রচনা করেন তখন ছনিয়ার দলগ

বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে নৃতত্ত্বসেবীদের ভিতর জ্ঞান নেহাৎ কম ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার দলগত বিবাহ পদ্ধতি অতি অল্পই পরিচিত ছিল। হাওয়াই সমাজের বিবাহতথ্যগুলো হইতে মর্গ্যান আমেরিকার কুটুম্ব-জ্ঞান বৃদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তথ্যরাশিই মাতৃ-বিধি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া দেয়। অধিকন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বিবাহ প্রথা হইতে হাওয়াইয়ের প্রথা যে উচ্চ স্তরে অবস্থিত এই ধারণাও পণ্ডিতমহলে জন্মিতে পারিয়াছিল।

কাজেই “পুনালুয়া” প্রথাকে মর্গ্যান পরবর্তী কালের ছোড় পরিবারের পথ প্রদর্শক বিবেচনা করিতে থাকেন। তাঁহার মতে জগতের প্রায় সকল স্থানেই পুনালুয়া বিবাহ কমবেশী দেখা গিয়াছে। কিন্তু মর্গ্যান এই বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ছিলেন। কারণ অস্তান্ত অমুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, জগতে অস্তান্ত ধরনের দলগত বিবাহও প্রচলিত ছিল এবং আছে। কিন্তু “পুনালুয়া” প্রথা যে দলগত বিবাহের এক চরমতম পরিণতি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া মর্গ্যান নৃতত্ত্বের আলোচনায় রাজপথ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহের “দল”

ইংরেজ পাত্রী লরিয়ার ফিল্ডন অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত দলগত বিবাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত অমুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণা সমূহই দলগত পরিবার সম্বন্ধে নৃতত্ত্বের বড় খুঁটা বিশেষ।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় মার্ডন্ট শাম্বিয়ার পাহাড়ের অধিবাসী পাপুয়ান জাতি দুই দলে বিভক্ত। একটার নাম ক্রোকি, অপরটির নাম কুমিতে। প্রত্যেক দলের ভিতরই আপোষে

যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ। কিন্তু এক দলের পুরুষেরা অপর দলের জীদের স্বামী এবং দ্বিতীয় দলের পুরুষেরা প্রথম দলের জীদের স্বামী। বিবাহ হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, দলে দলে। বয়সের বাদ বিচার নাই।

যে কোন জোকি যে কোন কুমিতে নারীকে পত্নী বিবেচনা করে। এই বিবাহে যে কতটা জন্মে সে মাতৃরক্তের জোরে কুমিতে দলের লোক। কাজেই জোকি দলের যে কোন পুরুষই এই কত্তার স্বামী। অর্থাৎ তাহার জনকও ইহাকে পত্নী বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

বুঝিতে হইবে যে, এই প্রথায় বাপে-মেয়েতে যোনি সংসর্গ “ইনসেট” নামে দৃশ্যীয় নয়। প্রথাটা একদম আদিম অবাধ-যোনিসংসর্গের যুগ হইতেই সটান সোজা নামিয়া আসিয়াছে এইরূপ অনুমান করা চলে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার পাপুয়ান সমাজে বাপে-মেয়েতে যোনি সংসর্গের কথা শুনা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, এই সংসর্গ কার্যতঃ নিষিদ্ধই বটে। তাহা হইলে প্রথাটাকে আদিম অবাধ-যোনিসংসর্গের কাছাকাছি বিবেচনা না করিয়া অনেকটা “আধুনিক,”—বংশগত পরিবারের লাগাও এক পদ্ধতি বিবেচনা করাই যুক্তিসংগত। বস্তুতঃ অষ্ট্রেলিয়ার বিবাহ প্রথা বংশগত পদ্ধতিও পার হইয়া আসিয়াছে এইরূপই বুঝিতে হইবে।

দুই দলে বিভক্ত বৈবাহিক লেনদেন প্রথা অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য জনপদেও প্রচলিত। পূর্ব অকলে,—ডালিঙ্ দরিয়ার উপকূলে এবং সুইনস্ল্যাণ্ডের উত্তরপূর্ব জনপদেও গাছিয়ার

পাহাড়ের বিবাহ পদ্ধতি দেখা যায়। এক কথায় প্রথাটাকে বেশ সুবিস্তৃত বিবেচনা করা চলে।

এই প্রথায় ভাইয়ে-বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু বোনের ছেলেপুলেরা ভাইয়ের ছেলেপুলেদিগকে বিবাহ করে। অর্থাৎ মামাত পিসতুত ভাইবোনে বিবাহ চলে।

নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে ডালিং দরিয়ার অধিবাসী কামিলারয় জাতি চার দলে বিভক্ত। ইহাদের দলগত বিবাহ জটিলতর। প্রত্যেক দলের সঙ্গে অপর এক দলের বিবাহ অস্বীকৃত হয়। প্রথম দুই দল পরস্পর স্বামী ও স্ত্রী। ইহাদের পুত্রকন্যারা আর সেই দুই দলের অন্তর্গত বিবেচিত হয় না। ইহারা নতুন নতুন দলের সামিল। তৃতীয় ও চতুর্থ দল এইরূপে উৎপন্ন হয়।

এই যে নতুন দুই দল—তৃতীয় ও চতুর্থ,—ইহারাও প্রথম দুই দলের মতনই পরস্পর স্বামী স্ত্রী জোগাইয়া থাকে। ইহাদের সম্বন্ধসম্বন্ধিতরা আবার এই দল দুইটার সামিল বিবেচিত হয় না। তাহাদিগকে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের লোক রূপে গণ্য করা হয়।

এক পুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় দলের স্তর গড়িয়া তুলে। তৃতীয় ও চতুর্থ দলের স্তর দ্বিতীয় পুরুষের দরুণ গড়িয়া উঠে। তৃতীয় পুরুষ আবার প্রথম ও দ্বিতীয় দলেরই লোক। ফলতঃ, ভাইয়ে বোনের ছেলেমেয়েদের ভিতর বিবাহ ঘটে না, কিন্তু তাহাদের পুত্রপৌত্রীদের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ নয়।

অষ্ট্রেলিয়ার দলগত বিবাহ পদ্ধতিকে কোনো মতেই উচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচলিত যোনিসংসর্গের রীতি বিবেচনা করা

চলে না। সাধারণ চোখে প্রথাটাকে অনেকটা এক পত্নীত্ব অথবা বহুপত্নীত্বের মতনই মনে হইবে। বস্তুতঃ বহুকাল পর্যন্ত ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা অষ্ট্রেলিয়ান প্রথায় একটা নতুন কিছু সন্দেহই করিতে পারে নাই। অনেক বৎসর বসবাস করিবার পর কিজন এবং হাউসিট পাপুয়ানদের বিবাহ পদ্ধতির স্বত্ব অবিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

স্বত্বগুলা বেশ নিয়মবদ্ধ এবং নিরেট। যখন তখন যেখানে সেখানে যে কোনো পুরুষ, যে কোনো নারীকে ভোগ করিতে অধিকারী নয়। বিধিনিষেধ পূরা দস্তরই বর্তমান। হাজার হাজার মাইল ইাটিতে ইাটিতে পাপুয়ান এমন এক দেশে আসিয়া হাজির হয় যেখানকার ভাষা সে বুঝে না। কিন্তু দলের বিধান অনুসারে সেই সমাজেও তাহার পত্নী হইবার যোগ্য মেয়ে জোটে। সেইরূপ কোনো ব্যক্তি হয়ত একাধিক নারী লইয়া ঘর করিতেছে। অর্থাৎ কোনো সময়ে এমন এক অতিথি আসিয়া জুটে যে, সে দলের নিয়মে তাহার পত্নীকে অভ্যাগতের পত্নী বিবেচনা করিতে বাধ্য।

বস্তুতঃ ইয়োরোপীয়েরা যেখানে মানুষি চোখে ছনীতি মাত্র লক্ষ্য করিতেছে সেখানে প্রকৃত পক্ষে চরম নীতি সঙ্গত ধর্মই প্রতিপালিত হইতেছে। এক দলের নারীরা সকলেই যখন অতিথির পত্নী হইবার যোগ্য তখন অতিথি তাহাদিগকে ন্যায়তঃ ভোগ করিতে অধিকারী। কিন্তু যে দুই দলে যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ সেই দুই দলের কোনো পুরুষ স্বী কোনো মতেই একসঙ্গে ব্রাজি যাপন করিতে পারে না। কোনো কোনো প্রদেশে মেয়ে চুরি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও দলের বিধান প্রতিপালিত হয়।

মেয়ে চুরি কাণ্ডে এক পত্নীঘের বীজই দেখিতে পাই।
কমসেকম জোড়-পরিবারের একপত্নী লক্ষ্য করিতে পারি।
কয়েক জন ইয়ারে মিলিয়া এক নারীকে হরণ করিয়া আনে।
ইহারা পরস্পর এই জীব সঙ্গ সহবাস করে। কিন্তু অবশেষে
যে ঘুবার পরামর্শে মেয়ে-চুরি সাধিত হইয়াছিল সে এই জীব
একমাত্র স্বামী বিবেচিত হয়।

কিন্তু এইরূপে চুরি করা মেয়ে যদি স্বামীর হাত হইতে
পলাইয়া যায় তাহা হইলে প্রথমে যে তাহাকে পাকড়াও করে সে
তাহার স্বামী হয়। প্রথম স্বামীর আর কোনো এক্টিয়ার থাকে
না।

দলগত বিবাহের মধ্যে এইরূপে কমবেশী ব্যক্তিগত বন্ধনের
নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। অল্পবিস্তর জোড় পরিবারের প্রথা গড়িয়া
উঠে। সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া বহুপত্নীঘের বিধানও দেখা দেয়।
ক্রমশঃ দলের নিয়ম কানুন শিথিল হইতে থাকে। কিন্তু
ইয়োরোপীয় আইনের অত্যাচারে দলগত বিবাহ লোপ
পাইবে কি? গোটা পাপুয়ান জাতিই পঞ্চ প্রাপ্ত হইবে কে
বলিতে পারে?

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত দলগত বিবাহের যে রূপ দেখা যাইতেছে
তাহা হাওয়াই প্রসিদ্ধ “পুনালুয়া” প্রথার দলগত বিবাহ হইতে
অনেক নিম্ন স্তরের সমাজচিত্র প্রদর্শন করে। অষ্ট্রেলিয়ান প্রথা
অনেকাংশ বিচরণশীল বাস্তুভিটাহীন “স্কাফোল্ডের” লেনদেনই
চোখে পড়ে। কিন্তু হাওয়াই প্রথায় সমাজ বেশ একটু স্থির
প্রতিষ্ঠিত হইয়া বোধ ধনদৌলতের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে
বোধ হইবে। এই দুই প্রথার ভিতর মাঝামাঝি স্তর অনেকই

গিয়াছে। কিন্তু মানবজাতির বিবাহ সম্বন্ধের ইতিহাস লইয়া পণ্ডিত মহলে এখনো গভীরতর অহুসন্ধান শুরু হয় নাই।

মর্গ্যানের ভুল

এঙ্গেলসের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়া ছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯১ সালে বাহির হয় চতুর্থ সংস্করণ। ইহার তিন বৎসর পরে আর একজন জার্মান পণ্ডিত হাইনরিখ কুনো ভিকার ফ্রাঙ্কশাফ্টসগার্নিআট সিওনেন অর আউটলিনেগার" (অট্টেলিয়ান নিখোদের কুটুম্ব সম্বন্ধ) বিষয়ে এক সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রচলন করেন। এঙ্গেলস মর্গ্যান এবং ফিজন এই দুইজনের নিকট ঋণী ছিলেন। কুনোর মতে এই দুইজনের সকল কথা সর্বথা গ্রহণীয় নয়।

কুনো বলেন :—“মর্গ্যান এবং ফিজন বিবাহের দলগুলাকে পুনালুয়া পরিবার হইতে প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করেন। কিন্তু এইরূপ বিবেচনা করিবার কোনো কারণ নাই। গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে দলগুলা প্রচলিত ছিল একথা সত্য। বস্তুতঃ মর্গ্যান যে প্রাচীন সমাজকে ‘বংশগত বিবাহ’ বা ভাইয়ে বোনে বিবাহের সৃষ্টি স্বরূপ জ্ঞান করেন দলগুলা সেই সমাজেরই ধানিকটা সমসাময়িক। কিন্তু কামিলারয়, কাবি, সুইপেরা ইত্যাদি জাতির ভিতর যে ধরণের বিবাহের দল দেখা যায় সেগুলি অত পুরাণো নয়। এই দলসমূহ পরবর্তী কালে গড়িয়া উঠিয়াছে। সে কাল পুনালুয়া ত্বরের অনেক পরের কথা। তখন স্থানে স্থানে গোষ্ঠী প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে।”

কুনোর মতে বিবাহের অট্টেলিয়ান দলপ্রথা সমাজ গঠনের

প্রাচীনতমানির্দশন নয়। খাটি গোষ্ঠী প্রথা বোল কলার পূর্ণ হইয়া গড়িয়া উঠিবার পূর্বে আধাআধি গোষ্ঠীর যুগ একটা ছিল। সেই আধাআধি গোষ্ঠীর সমসাময়িক রূপেই এই দলগুলোকে গ্রহণ করতে হইবে। অর্থাৎ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বংশগত পরিবার বা ভাইয়ে বোনে বিবাহ আধাআধি গোষ্ঠী এবং অষ্টেলিয়ান দল বিবাহ,—এই তিন প্রথা যুগপৎ চলিতেছিল।

আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। কুনো বলেন :— অষ্টেলিয়ায় একসঙ্গে নানা স্তরের পারিবারিক গঠন অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত। নিম্নতম স্তরের লোকেরা নিজ দলের ভিতর বিবাহ করে। মাকামাখি স্তরের দলে নিজের ভিতর বিবাহ চলে না। এই দলের লোকেরা বাহিরের এক দলের সঙ্গে বিবাহ পাতাইতে বাধ্য। কিন্তু উচ্চতম স্তরে যে দল অবস্থিত তাহার বিবাহ প্রথা আবার নিম্নতম স্তরের অনুরূপ।”

উচ্চতম এবং নিম্নতম স্তরে এই বিষয়ে বাহ্যতঃ একটা ঐক্য দেখা যায় সত্য। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে এই দুইয়ে প্রভেদ আছে। কারণ নিম্নতম স্তরে নিজ দলের নিকট দূর আত্মীয় তফাৎ করা হয় না। কিন্তু উচ্চতম স্তরে এই তফাৎ করা একটা বিশেষত্ব।

আবার, নিম্নতম স্তরে বাপে মেয়েতে বিবাহ চলে। উচ্চতম স্তরেও এই বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু বাপ পর্যায়ের ব্যক্তিগুলা এই দুই স্তরে বিভিন্ন।

কুনোর মতে সাধারণ পর্যটকদের জাতি-বিবরণগুলো এই কারণে সাবধানে বিশেষ গ্রহণ করা উচিত। “নিজ দলের ভিতর বিবাহ,” “বাপে মেয়েতে বিবাহ” ইত্যাদি শব্দে প্রত্যেক স্থলেই

এক একটা বিশেষত্বপূর্ণ রীতি বৃদ্ধিতে হইবে। কিন্তু পর্যটকরা অনেক ক্ষেত্রেই সেই বিশেষত্বগুলার খবর রাখেন না।

দলগত বিবাহের আসল কথাটা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রথায় এমন কতকগুলো বাধাবাধি আছে যাহার ফলে কোনো কোনো নির্দিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ।

মর্গ্যান গোষ্ঠী প্রথাকে “পুনালুয়া” প্রথা হইতে উৎপন্ন রূপে প্রচার করিয়াছেন। কুনোর মতে মর্গ্যান এই সঙ্কেত যথোচিত প্রমাণ জোগাইতে পারেন নাই। বরং গোষ্ঠীর প্রারম্ভিক অবস্থায় দলগুলো যে বেশ প্রচলিত তাহা অষ্ট্রেলিয়ার নিগ্রোসমাজে প্রমাণিত হইতেছে।

কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্যায় মর্গ্যানের আবিষ্কার বিশেষরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। দলগত বিবাহের আলোচনায় মর্গ্যান দেখাইয়াছেন যে বাপে-মেয়েতে বিবাহ নিষিদ্ধ করাই সমাজ গঠনের গোড়ার কথা। কুনো এই কারণে মর্গ্যানকে প্রশংসনীয় বিবেচনা করেন।

কুনোর গবেষণায় আরও কয়েকটা কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা পূর্বে ভাবিতেন যে, সাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জের বাহিরে “পুনালুয়া” প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিবাহ পদ্ধতি হাওয়াই সমাজের নিজস্ব। কিন্তু কুনো বলেন ;— অষ্ট্রেলিয়ার দিয়ারি সমাজে প্রচলিত পিরায়ুক প্রথা আর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পুনালুয়া একই প্রতিষ্ঠান। যে সকল পর্যটক বহুকাল বসবাস করিয়া দিয়ারিদের ভাষা দখল করিতে পারিয়াছেন তাহাদের বৃত্তান্ত হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।”

৪. মর্গ্যান বিবৃত বংশগত বা ভাইয়ে-বোনের বিবাহের প্রথায় যে

সকল কুটুম্ব বাচক শব্দ আছে সেইগুলার দ্বারা অষ্টেলিয়ার দিয়েরি সমাজের কুটুম্ব বুঝানো যায় না। দিয়েরি সমাজে অনেক নতুন নতুন শব্দের চল আছে। তাওয়াইয়ে প্রচলিত শব্দগুলো দিয়েরি কুটুম্বের সমাজে চালাইতে গেলে মহা গোলে পড়িতে হইবে। মর্গ্যান এই কারণেই ভুল করিয়াছেন। তাওয়াই সম্বন্ধে মর্গ্যানের মত কাজেই ভ্রমাত্মক রহিয়া গিয়াছে।

মর্গ্যানের আরও কয়েকটা ভুল বাহির হইয়াছে। মর্গ্যানের মতে বাশপব বা ভাইয়ে-বোনে বিবাহের প্রধান রক্তের আত্মীয়দের ভিতর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যাহারা এই সম্বন্ধে মর্গ্যানের প্রতিবাদ করেন তাহারা কুনোর মতে ঠিক। অষ্টেলিয়ার রক্তের সম্বন্ধওয়ালা আত্মীয়দের যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে নৃতত্ত্ব অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফলে লোকের মনো ধারণা ভিন্নিয়াছে যে, ভগ্নতের সর্বত্র নায়ের রক্তের জোরে এক নায়ের নামে প্রাচীনতম পরিবার ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাদের জোরে পারিবারিক প্রথাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিবেচনা করিবার দিকে পণ্ডিত মহলে ঝোঁক দেখা গিয়াছে। জনকের সম্বন্ধ পাওয়া যখন মাকাতার আনলে একপ্রকার দমস্তবই ছিল, এবং জননী সম্বন্ধে যখন কোনো প্রকার সম্বন্ধ চলিতেই পারে না তখন মাতৃবিধিকে পিতৃবিধি অপেক্ষা পুরাণে বিবেচনা করা স্বাভাবিক।

কিন্তু কুনো বলেন :—“কমসেকম অষ্টেলিয়ার সমাজ গঠন সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। যে যে সমাজে গোষ্ঠী প্রথা বেশ পাকাপাকি গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সকল সমাজে মাতৃবিধি

সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু গোষ্ঠী প্রথা যেখানে নাই অথবা যেখানে নেহাৎ অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে সেখানে জনকের জোরে পরিবার দেখিতে পাই। জননীবিধি আর গোষ্ঠী পরস্পর সম্বন্ধ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জোড়-পরিবার

কিছু কালের জন্য জোড়ে জোড়ে বসবাস করা মঙ্গলত বিবাহের যুগেও এবং এমন কি তাহার পূর্ববর্তী যুগেও দেখা গিয়াছে। একাধিক নারীর সঙ্গে পুরুষ সহবাস করিত, আবার নারীও একাধিক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করিত। কিন্তু পুরুষও জানিত কে তাহার প্রধান পত্নী। আবার সেই নারীও বুঝিত যে এই পুরুষই তাহার প্রধান স্বামী। এইরূপে অবাধ্যোনিঃসঙ্গের ব্যবস্থায় যে এক বিচিত্র পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই বলে, “জোড় পরিবার।”

পৃথিব্যান পাত্ৰীরা এই ব্যবস্থা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাদের নতে এইরূপ জীবন একমাত্র উচ্ছৃঙ্খল নারী মহলেই সম্ভব ছিল। অথবা শোলাখুলি নীতিহীনতার বাধান স্বরূপ এই সমাজ তাহাদের চোখে নিশ্চিন্দ বিবেচিত হইত।

বিবাহে বিধিনিষেধ

জোড়ে জোড়ে কম বেশী সময়ের জন্য স্ত্রীপুরুষের ঘর করা বাস্তবিক পক্ষে একটা সুনীতির বিস্তারের লক্ষণ ছিল। তাই পর্যায়ের পুরুষেরা বোন পর্যায়ের নারীসিগকে বিবাহ করিতে পারিবে না,—এই নিয়ম যতই সমাজে বহুমূল হইতেছিল ততই জোড় পরিবারের প্রথা বাড়িতেছিল।

গোষ্ঠী প্রথা পাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে “ভাই” পর্যায়ের পুরুষ এবং “বোন” পর্যায়ের স্ত্রী বাড়িতে থাকে। কাজেই ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষেধের বিধান যুবকযুবতীদের পক্ষে বেশ একটা কড়া আইনই ছিল। এই অবস্থায় অবাধ্যানিসংসর্গের এক প্রধান বাধাই সৃষ্ট হয় জোড় পরিবার প্রথায়। বুঝা গিয়াছে এই প্রথার প্রচলনের জন্য গোষ্ঠীবিকাশ প্রচুর দায়ী।

ইরোকোয়া এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান সমাজের নিম্নতম স্তরে ও আফ্রিকার ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের ফলে শত শত পুরুষকে অথবা শত শত নারীকে নিজ নিজ স্ত্রী বা স্বামী চুড়িয়া বাহির করিতে হয়। এ এক বিষম সমস্যা কথায়। দলগত বিবাহের সহজ সরল নিয়ম উঠিয়া যাইতে বাধ্য। তাহার ঠাইয়ে জোড়পরিবার পাড়াইয়া গিয়াছে।

আমেরিকার আদিম সমাজগুলোয় দেখা যায় যে, পুরুষ একজন নারী লইয়াই বসবাস করে। এক পত্নীত্বই সমাজের দস্তুর। কিন্তু অন্যান্য নারী ভোগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বা ভূনীতি বিবেচিত হয় না। অপর দিকে নারী প্রায় সর্বত্রই স্বাধীন পর্যন্ত সে কোনো পুরুষের সঙ্গে বসবাস করে ততদিন পর্যন্ত

তাহাকেই একমাত্র স্বামী বিবেচনা করে। সেই সময়ের ভিতর পরপুরুষের সঙ্গে সংশ্রব সমাজ কর্তৃক কড়া ভাবেই দণ্ডিত হয়।

এই ছোট পরিবার যখন তখন পুরুষের ইচ্ছায় অথবা নারীর ইচ্ছায় ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব। ছেলেপুলেরা মায়ের সম্পত্তি এবং তাহার সঙ্গেই থাকে।

একই রক্তওয়ালা আত্মীয়দের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া মানবসমাজ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে ইহার ফলে তাহার জয়লাভ ঘটিয়াছে। মর্গান বলেন :—“ভিন্ন ভিন্ন রক্তওয়ালা সমাজের ভিতর যোনিসংসর্গ ঘটায় শারীরিক ও মানসিক হিসাবে প্রবলতর সম্ভানসম্পত্তিৎ জন্ম হইয়াছে। পরবর্তী বংশের মাথার খুলি এবং মগজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে বংশের পর বংশ দুই বিভিন্ন বংশীয় জনক জননীর ক্ষমতা লাভ করিয়া জগতে শক্তিশালী হইতে পরিয়াছে।” যে সকল সমাজে এই দরণের বিবাহ অনুষ্ঠিত তাহারা অল্পে অল্পে সমাজকে পরাস্ত করিয়াছে। অথবা তাহাদের নেতৃত্বে অবনত জাতিরা জগতে চলাফেরা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ছোট পরিবার প্রথা প্রাকৃতিক নির্বাচনের এক বড় অস্ত্র।

পরিবারের ক্রমবিকাশে দেখিতে পাই যে, প্রথম অবস্থায় একই বংশের যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস করিত। যোনিসংসর্গের ক্ষেত্র বা গণ্ডী তখন বিস্তৃততম ছিল। এই ক্ষেত্র বা গণ্ডী ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে।

প্রথমে নিবারণিত হইয়াছে নিকট আত্মীয়দের যোনিসংসর্গ। তাহার পর দূর আত্মীয়রা গণ্ডীর বহির্ভূত বিবেচিত হইয়াছে। এমন কি যে সকল নরনারীকে নেতৃত্ব অর্জনের ভাষায় “দূর

আত্মীয়" বলা চলে অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে রক্তের যোগ একপ্রকার নাই বলিলেও চলে তাহারাও শেষ পর্যন্ত যোনিসংসর্গের ক্ষেত্রের বাহিরে স্থান পাইয়াছে। এই উপায়ে ধাপের পর ধাপে দলগত বিবাহ লুপ্ত হইয়াছে। অবশেষে মানবসমাজ এক জোড়া নর নারীকে কেন্দ্র বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য প্রথম প্রথম আবার এই জোড়ও মাত্র ক্ষণিক বা সাময়িক মাত্র। কিন্তু এই জোড় যতদিন একসঙ্গে থাকে ততদিন একটা পরিবার চলিতেছে এই ধারণা জন্মে। এই জোড় ভাঙিলেই বিবাহ রদ হইল এইরূপও বুঝা হইয়া থাকে।

জোড়পরিবারের প্রথম ব্যক্তিগত বা নিজস্ব স্ত্রী ও স্বামীর ধারণা দেখিতে পাইতেছি। এইখানে বর্তমান যুগের এক পত্নীত্বের প্রথম অবস্থাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান কালের ব্যক্তিগত বা স্বাধীন প্রেম নামক কোন বস্তু এক পত্নীত্ব প্রথার জন্মকালে দেখিতে পাই না।

নারীর আমল

পূর্ববর্তী যুগে মেয়ে চুঁড়িয়া বেড়াইবার জন্ত পুরুষকে হয়বাণ হইতে হইত না। কিন্তু এই যুগে মেয়ে চুঁড়িচা বাহির করা পুরুষের পক্ষে একটা সমস্তা বিশেষ। কাজেই জোড়-পরিবার প্রথা সুরু হইবামাত্র মেয়ে-চুরি, মেয়ে-লুট, মেয়ে-বিনিময় ইত্যাদি কাণ্ড জগতে দেখা দিয়াছে।

স্টুলাণ্ডের নৃত্যবিৎ ম্যাকলেনান এই দরপের পরিবার বন বিবাহকে দুইভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। এক শ্রেণীকে ইনি বলেন "দখলের জোড়ের" বিবাহ। অপর শ্রেণী ইহার মতে

বিনিময়ের বিবাহ। বাস্তবিক পক্ষে পারিবারিক প্রথাকে এই উপায়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। দুই প্রথাই পুরুষের পক্ষে মেয়ে চুঁড়িবার উপায় মাত্র।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে বিবাহের জন্ত পাত্রপাত্রীর মতামত লওয়া হয় না। এই বিষয়ে মায়েরাই সর্ব্বেসৰ্ব্ব। অনেক সময়ে মায়েরা অনেক দিন আগে হইতেই বরকন্তার বিবাহ স্থির করিয়া রাখে। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত পাত্র পাত্রী তাহার কোনো খবরই পায় না।

বিবাহের সময় বর কন্তার মাকে এবং মায়ের দিক্কার আত্মীয়দিগকে উপহার দেয়। কন্তার বাপ বা বাপের দিক্কার আত্মীয় কিছুই পায় না। এই উপহার মায়েরই প্রাপ্য; মা কন্তাকে বরের হাতে দান করিচ্ছিল এই জন্ত।

স্বামী ইচ্ছা করিলে বিবাহ রদ করিতে পারে। জীও পারে কিন্তু আজকাল ইরোকোআদের সমাজে লোকমত বিবাহ ভাঙিবার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতেছে। পরিবারে ঋগড়াঝাঁটি বাধিলে গোষ্ঠীর লোকেরা শালিসীর ব্যবস্থা করে। তাহাতে সফল না ফলিলে বিবাহ রদ করা হয়। সম্মানের মায়ের সঙ্গে যায়। দুই পক্ষই পরে আবার স্বাধীনরূপে বিবাহ করে।

জোড় পরিবার মোটের উপর বেশী দিন টিকে না। কাজেই আর্থিক হিসাবে ইহা দুর্বল। এই জন্ত প্রাচীন কালের ধনসাম্য বা বৌধ সম্পত্তির ব্যবস্থা তখনও চলিতে থাকে। একটা স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ঘরসংসার গড়িয়া তোলা হয় না।

বৌধসংসারের কর্তা থাকে কেহ নারী। বাপের ইচ্ছা জোড়পরিবারে কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা

বিবেচনা করিতেন যে, মাকাতার আমলে নারীরা ছিল পুরুষের গোলাম। এই ধারণা একদম ভুল। “স্যাফেজ” এবং “বার্কার” সমাজের সকল স্তরেই নারীদের স্বাধীনতা ত পূরা মাত্রায় আছেই। অধিকন্তু সমাজে নারীর সম্মানও খুব বেশী।

ইরোকোআদের সেনেকা জাতি সম্বন্ধে পাত্রী আর্থার রাইট বলেন :—লক্ষ্য যৌথ বস্তুতে বসবাস করিবার সময় গোষ্ঠী থাকিত নিয়ম কাহ্ননের হস্তা কস্তা। অস্তান্ত গোষ্ঠী হইতে মেয়েদের জন্ত স্বামী আসিত। সংসারের মাধ্যম থাকিত মেয়েরা। খাওয়া দাওয়ার জিনিষপত্র সকল পরিবারের জন্ত একত্র মজুত থাকিত। কিন্তু যে স্বামী কুঁড়েমি করিয়া জীবন কাটাইতে অথবা কোনো কারণে যৌথভাণ্ডারে উচিত পরিমাণে মাল জোগাইতে না পারিত তাহার ছুঁদশার সীমা ছিল না। তাহাকে ছেলেপুলে কেলিয়া বস্তি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইতে হইত। অস্ত কোনো বস্তিতে যাইয়া অস্ত গোষ্ঠীর এক মেয়ের সঙ্গে তাহার জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। গোষ্ঠীর ভিতর স্ত্রীজাতির ক্ষমতা ছিল বিপুল। অনেক সময় গোষ্ঠীর কস্তাকে মেয়েদের বিচারে কস্তামি রেহাই দিতে হইয়াছে। তাহার ঠাইয়ে মেয়েরাই আর একজনকে গোষ্ঠীনাযক বসাইয়াছে।”

বস্তির ভিতরকার মেয়েরা সকলেই এক গোষ্ঠীর লোক। স্বামীরা আসে অস্তান্ত গোষ্ঠী হইতে। কাজেই যৌথসম্পত্তির যুগে মেয়েরাই থাকে সকল বিষয়ে রাণী। জার্মান নৃতত্ত্ববিৎ বাপোফেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধান করিয়াছেন।

পর্যটক এবং পাত্রীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে “স্যাফেজ” এবং

“বার্কার” সমাজে মেয়েদিগকে খাটিতে হয় ভূতের মতন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মর্যাদার হানি ঘটে না। আজকালকার ইয়োৰোপীয় সমাজে বোধ হয় ভদ্রঘরের মেয়েরা খাটে কিছু কম। কিন্তু “শ্ৰাস্বেজ” বা “বার্কার” নারী তাহাদের পুরুষের নিকট যে পরিমাণ আসল সম্মান পায় সেই সম্মান “মভ্য” সমাজের মেয়েরা কখনো চাখে না। বেশী খাটে বলিয়া যৌথবস্ত্রের নারীরা পুরুষদের গোলাম এইরূপ বিবেচনা করিলে ভুল করা হইবে।

দলগত বিবাহের ভেদ

দলগত বিবাহ একদম নূপ্ত হইয়া গিয়াছে কি? জোড় পরিবার কি আমেরিকার সর্বত্রই দলগত বিবাহের ঠাই অধিকার করিতে পারিয়াছে? এতটা বিশ্বাস করা যায় না। নক্ষিণ আমেরিকার নানা অঞ্চল সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায় যে, অবাদ যোনিসংসর্গ এখনও চলিতেছে। উত্তর আমেরিকায়ও অস্বতঃ চল্লিশ সমাজে কোনো পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করিলে সে তাহার সকল শালীর স্বামী বিবেচিত হয়।

কালিকোর্নিয়; উপদ্বীপে ব্যাপ্তকট একপ্রকার জাতীয় “মহে’চ্ছব” লক্ষ্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে নানা “জাতির” নরনারী একত্র জুটিত এবং “গোলে হরিবোল” চালাইয়া অবাদ যোনিসংসর্গ উপভোগ করিত। সম্ভবতঃ এই জাতিগুলি গোষ্ঠী বিশেষ। মাক্কাতার আমলের বাদবিচারহীন সর্ববাদাশ্রয়ী পুরুষ মিলনের স্বতিটা এই উৎসবে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায়ও মাঝে মাঝে এই রীতি দেখা যায়। কোনো কোনো সমাজে নারী এক পুরোহিত স্বানীয় বড় পুরুষের

দেশের সকল স্ত্রীলোকের উপর ভোগ-সত্ত্ব দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু যুবারা এই সকল স্ত্রী ভোগ করিবার স্বযোগ পায় মহোচ্ছব ইত্যাদির সময়।

স্ট্রেষ্টার মার্ক প্রণীত “মানবসমাজে বিবাহের ইতিহাস” গ্রন্থে এই ধরণের সাময়িক অবাধ্যন্যাসংসর্গের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের হো, সাঁওতাল, পুন্ডা, কোগর ইত্যাদি জাতি বৎসরে কয়েকবার এই উপায়ে প্রাচীন যুগের বাধাহীনতার পুনরাবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত। আজিকারও এই রূপ দেখা যায়। কিন্তু মজার কথা স্ট্রেষ্টার মার্ক এই সকল সাময়িক বাধাহীন স্ত্রীপুরুষ মিলনের ব্যবস্থাকে সাবেক কালের সনাতন অবাধ্যন্যাসংসর্গ এবং দলগত বিবাহ পদ্ধতির জের বিবেচনা করেন না। তাঁহার মতে মহোচ্ছবে প্রচলিত বাধাহীনতাওলা “আদিম” মানবের শৃঙ্গার “ঋতু”র স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। জানোয়াররা যেমন বৎসরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে শৃঙ্গার প্রবণ হয়, স্ট্রেষ্টার মার্ক বিবেচনা করেন আদিম নরনারীও সেইরূপ মাঝে মাঝে যোনিসংসর্গ জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষার দশবর্তী হয়। সেই আকাঙ্ক্ষার ফল স্বরূপই শৃঙ্গলীকৃত বিধিবদ্ধ সমাজেও উচ্ছৃঙ্খল বাদনিচারহীন শৃঙ্গার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দলবদ্ধ বিবাহনীতির পর জোড় পরিবার নীতির যুগ। এই যুগ পরিবার বাথোফেনই প্রথম আবিষ্কার করেন। স্ত্রী এই যুগে পুরুষ-সাম্য বা যৌথ-স্বামীর আওতা ছাড়াইয়া এক পতির ভোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু “সত্য যুগের” সনাতন ধর্ম বর্জন করা সহজ কি? কখনও নয়। তাহার জন্য “প্রায়শ্চিত্ত” করা

দরকার। মনে একজনের ভোগ্যরূপে চিত্রিত হওয়া জীজ্ঞাতির পক্ষে এক মহা পাপ বিশেষ।

সেই পাপ এড়াইবার জন্ত সমাজ হইতে জীজ্ঞাতিকে মাঝে মাঝে বহু পুরুষের ভোগ্য হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই সুযোগগুলোকে বাথোফেনের ভাষায় স্ত্রাহেজরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনা করে। কেননা তাহাদের ধারণায় একাদিক পুরুষের সঙ্গে নারীর সহবাস করাই নারীর বিধান। ইহাই সত্য যুগে জীজ্ঞাতির “স্বধর্ম।”

মিলিতা দেবতার মন্দিরে ব্যাবিলন দেশের নারীরা বৎসরে একবার করিয়া বহু পুরুষের ভোগে আসিত। পশ্চিম এসিয়ায় অন্তান্ত জনপদে ভ্রমণের মেয়েরাও আনাইতিস দেবতার মন্দিরে কয়েক বৎসর ধরিয়া “স্বাধীন প্রেমের” সুযোগ পাইত। এই সর্ব্ববাধাহীন যোনিসংসর্গের পর তাহারা ঘরে ফিরিয়া বিবাহ যোগ্য পাত্রী বিবেচিত হইত। ধর্মের নামে এই ধরণের রীতি ভূমধ্যসাগর হইতে গঙ্কার তীর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে আজও নানা অঞ্চলে চলিতেছে।

বাথোফেন বলেন :—“যৌথ-স্বামিত্ব নামক ধর্ম বা নীতি বর্জন করার ফলে যে পাপ জন্মে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে সমাজ অনুষ্ঠিত হয় তাহা ক্রমে ক্রমে মাত্রায় লঘু হইয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম নারীকে প্রতি বৎসরই একবার করিয়া যৌথ-স্বামিত্ব ভোগ করিতে বাধ্য করা হইত। পরে এই বার্ষিক রীতির ঠাইয়ে জীবনে একবারমাত্র নারীরা বহুপুরুষের সঙ্গে সহবাস করিলেই ধর্মের বিধান পালিত হইল বিবেচিত হইত। সেই একবারকার বাধাহীনতা ক্রমশঃ সঙ্কচিত হইয়া আসিয়াছে।

প্রথমে নিয়ম জারী ছিল যে, বিবাহিতারা অর্থাৎ পত্নীরা একবার করিয়া কিছুকাল যৌথ-স্বামিত্ব ভোগ করিবে। পরে নিয়ম হইল যে, পত্নীদের পক্ষে এইরূপ অবাধ প্রেম নিষিদ্ধ,—অবিবাহিতাদের অর্থাৎ কুমারীদের এই ধর্ম পালন করিতে অধিকার। অর্থাৎ বিবাহিত অবস্থায় অবাধ যৌনসংসর্গের পরিবর্তে অবিবাহিত অবস্থায় ইহার প্রচলন ধর্মসম্বন্ধে বিবেচিত হইল। পরে আবার যৌনসংসর্গের গণ্ডীটাই সঙ্কুচিত হইয়াছে। পূর্বে যে কোনো পুরুষের সঙ্গে (পত্নী বা) কুমারীরা স্বাধীন প্রেম চালাইতে পারিত কিন্তু ক্রমশঃ কোনো কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর পুরুষ ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে এই সংসর্গ বিধিসম্বন্ধে বিবেচিত হইত না।” দেবমন্দিরাদিতে কুমারী-ভোগ, দেবদাসী প্রথা এই শেষ অবস্থারই সাক্ষী।

কোনো কোনো সমাজে ধর্মের অছিলা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কালের এসিয়ান (কন্ট) ও অন্তান্ত সমাজে, এবং বর্তমান কালেও ভারতবর্ষের আদিম নরনারী, মালয়জাতি, দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি সমাজে কুমারীরা বিবাহের পূর্বে যথেষ্ট যৌনসম্বোগের রক্ত ধর্মের পানি পায়। দক্ষিণ আমেরিকায় সর্বত্রই এই রীতি দেখা যায়। সুইস আমেরিকান জীবনবিদ্যা আগাসিজ তাঁহার “ব্রেজিল পর্যটন” নামক গ্রন্থে ভদ্র ধনী পরিবারের ভিতরও এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

কোনো কোনো সমাজে বরের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন প্রথমেই ক’নেকে ভোগ করিতে অধিকারী। বরের পাল্লা সর্ব শেয়ে। কুমধ্যসাগরের বালিয়ানিক দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার

আউগিলার সমাজে এই রীতি পূর্বে ছিল। আজও আবিদিনিয়ার বারিয়া জাতি এই রীতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের নায়ক, রাজা, পুরোহিত-সমাজ, ওঝা ইত্যাদি পদস্থ উচ্চতম ব্যক্তির। বিবাহিতা নারী মাত্রেস সঙ্গে বিবাহের রাত কাটাইতে অধিকারী। ব্যাস্কফট্ আলাস্কার প্রায় সর্বত্র এবং উত্তর মেক্সিকোর বহু সমাজে বিবাহের প্রথম রাতের এই স্বধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন।

মধ্য যুগের আগাগোড়া ইয়োরোপের আদিম কেন্টক জাতির দেশগুলায় প্রথম রাত্রির বিধান সুপ্রচলিত ছিল। স্পেনের কথা স্বরণ করিতে হইবে। কাষ্টিলিয়া প্রদেশে কিম্বাণরা কখনও মাসে পরিণত হয় নাই। কিন্তু আরাগণ প্রদেশে চামীরা জমিদার বা নবাবদের গোলাম ছিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড আরাগণের গোলাম-প্রথা আইন করিয়া তুলিয়া দেন।

সেই আইনের বাক্যগুল। পড়িলে মধ্যযুগের স্পেনিস জাতির বিশেষতঃ আরাগণের নরনারীর রীতিনীতি বৃদ্ধিতে পারা যাইবে। আইনের কিয়দংশ এইঃ—“পূর্বোক্ত সেনিঅর বা জমিদারগণ এখন হইতে চামীদের স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম রাত্রি কাটাইতে পারিবেন না। অথবা বিবাহের রাত্রির পরের রাতেও কিম্বা পত্নী বিছানায় শুইবার পর ঈহারা নিজেদের একুতিয়ার বজায় রাখিবার জন্য সেই বিছানায় উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে পারিবেন না। অধিকন্তু কিম্বাণদের ছেলেপুলেকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঈহারা এমন কি বেতন দিয়াও নিজ কাজে লাগাইতে পারিবেন না।”

রাথোফেন বলেন :—“এক পত্নীত্বের উৎপত্তির জন্য স্ত্রী

জাতিট প্রধানতঃ দায়ী।” ইহা স্বীকার করা কঠিন নয়। মানবজাতির আর্থিক ইতিহাসে নাবেক কালের যৌথসম্পত্তির ব্যবস্থা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। এদিকে লোক সংখ্যাও বাড়িয়া চলিতেছিল। সেই অবস্থার অবাধ্যোনিসংসর্গ আর নান্দ্যতার আমলের চোখে দেখা সম্ভবপর ছিল না। নারীর সহজে এই ব্যবস্থাকে স্বয়োনির পক্ষে পানিকটানিন্দাজনক বিবেচনা করিতে স্মারম্ব করিতেছিল। ক্রমশঃ “সতীত্বের” ধারণা ক্রমান্বয়ে অস্বতঃ সাময়িক ভাবে কোনো এক পুরুষের সঙ্গে নিজনের ব্যবস্থাই তাহাদের চিন্তায় উন্নতির লক্ষ্য বিবেচিত হইতেছিল। কিন্তু পুরুষের চিন্তা পদ্ধতি এইভাবে বদলান্ন নাই। পুরুষের পক্ষে দলগত বিবাহের অবাধ্য সম্ভোগ্য ব্যবস্থা চিরকালই বাঞ্ছনীয় রহিয়াছে। নারীজাতির ইচ্ছাংজ্ঞানের প্রভাবেই উপরে প্রবর্তী কালে পুরুষের এক-পতি-পত্নীত্ব প্রথ কাম্যম করিয়াছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এক-পতি-পত্নীত্বও সংযম একমাত্র নারীর তরফেই বর্তমান।

জোড়-পরিবার “স্বাস্থ্যেজ” এবং “বর্কার” যুগের সন্ধিকালে গড়িয়া উঠিয়াছিল। “স্বাস্থ্যেজ” অবস্থার বিবাহ পদ্ধতি ছিল দলগত, “বর্কার” যুগে তাহার স্থানে জোড়-পরিবার প্রচলিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে—অর্থাৎ উৎকর্ষের যুগে এক-পত্নীত্ব সর্বত্র নাপা তুলিয়াছে।

জোড়-পরিবারে “দলটা” মাত্র দুই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। “জীবাঙ্কুকেস্কের” ইহাই ক্ষুদ্রতম সমষ্টি প্রাকৃতিক নিপীড়নের কালে যোনিসংসর্গের সম্মত তাহার শেষ

কোঠায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। একটা পুরুষ এবং একটা নারী, এই দু'জনের সমবায়কে জোড়-পরিবারে-যে রূপ সঙ্কচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহার বেশী আর সম্ভব নয়। পারিবারিক জীবনের পক্ষে অল্প কোনো নতুন রূপ গ্রহণ করা এক্ষণে অসম্ভব। জোড়-পরিবারের প্রথাই মানবজাতির বিবাহ ব্যবস্থার চরম পরিণতি।

কিন্তু দুনিয়া এইখানেই ঠেকে নাই। অগতে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। তাহার ফলে, যোনিসংসর্গের নিয়ম অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতি এবং পারিবারিক প্রথাও রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

পশুপালনের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব

এইবার জোড়-পরিবারের অননিকেতন আমেরিকা পরি-
ত্যাগ করা বাউক। নব জুখণ্ডে অল্প কোনো রূপের পরিবার
দেখা দেয় নাই। এক-পত্নী বা এক-পতিষের কোনো চিহ্ন
ইণ্ডিয়ান সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব গোলাচের
ইতিহাস অন্তরঙ্গ।

এই জুখণ্ডে জানোয়ার চাষ এবং পশুপালনের ফলে মানব-
সমাজে এক অপূর্ণ ধনসম্পদ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে
সামাজিক জীবনও এক অভিনব প্রশালীতে বিকাশ লাভ
করিয়াছে।

“বার্কার” যুগের নিম্নতম স্তরে ঘর-বাড়ী, কাপড়-চোপড়,
পুষ্ণা, রান্না-বাড়ী ও খাওয়া-দাওয়ার যত্নপাতি, হাড়ি-কুঁড়ি, নোকা
এবং সাধারণ অস্ত্র-শস্ত্র মানবজাতির দৌলত ছিল। খাচ্ছন্দ্য

জোড়-পরিবার

সংগ্রহ করিতে হইত রোজু রোজু। কিন্তু পশুপালক জাতিরা সহজেই অল্পকালের ভিতর প্রচুর ঐশ্ব্যের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘোড়া, উট, গাধা, গাভী, ভেড়া, ছাগল, শূর, ইত্যাদির দখল লইয়া এই সকল পর্য্যটক জাতি বিনা কষ্টে সুবিস্তৃত জনপদের কর্তা হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য পরিপ্রমেই ইহারা খাজদ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে পারিত। পঞ্চনদে, গঙ্গামাতৃক জনপদে, তাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিস দরিয়ার উপকূলে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের সুযোগ জুটিয়াছিল। তখনকার দিনে অক্সাস এবং জাকজার্ভিস অঞ্চলে ভূমিও স্বল্প। স্বল্পাই ছিল। এই জনপদেও পশুপালক জাতি সহজেই দুধ ও মাংস জোগাইতে পারিত। প্রাচীন আৰ্য্য এবং সেমিটিক জাতীয় নরনারীরা এইরূপে আর্থিক হিসাবে পুষ্টিনাভ করিতে থাকে।

কিন্তু এই সব অভিনব ধনদৌলতের মালিক ছিল কে? প্রথম প্রথম গোটা "গেন্স" বা গোষ্ঠীই যৌথভাবে সকল সম্পদের অধিকারী ছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই জানোয়ারের পালঙলা ভিন্ন ভিন্ন মালিকের অধিকারভুক্ত রূপে দেখা দেয়।

বাইবেল গ্রন্থের "ওল্ডটেস্টামেন্ট" খণ্ডের প্রথম মোজেস-অধ্যায়ের রচয়িতার বিবরণে জানিতে পারি যে, ফালার আত্রাহাম তাঁহার স্বীয় জানোয়ারপালের মালিক ছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এই স্বত্বাধিকার কোথা হইতে জুটিয়াছিল? এক যৌথ-পরিবারের কর্তা রূপে? না গোটা গোষ্ঠীর নায়ক রূপে? তবে আসল কথাটা কুলিলে চলিবে না। আত্রাহাম কোনো মতেই আজকালকার আমলের অল্পরূপ মালিক বা স্বত্বাধিকারী ছিলেন না।

অজ্ঞাত দেশের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও যেখানে যেখানে সাহিত্য-নিবন্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেখানেই দেখিতে পাই যে জানোয়ারের পালগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারনায়কের সম্পত্তি বিবেচিত হইত। সম্পত্তি হিসাবে জানোয়ারের পালে আর ধাতুজ পদার্থ, বিলাস দ্রব্য এবং মানুষ জানোয়ারে অর্থাৎ গোলামে কোনো তফাৎ করা হইত না। অর্থাৎ সবই পরিবার নায়কদের দৌলতরূপে প্রচলিত ছিল।

এই যুগে গোলাম-প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। “বার্কার যুগের নিম্নতরস্তরে গোলাম বা মানুষ-জানোয়ারের কোনো প্রয়োজন হইত না। দাসের দ্বারা কোনো কাজ করাইবার মতন কাজ দেখা দেয় নাই। কাজেই অমেরিকান ইণ্ডিয়ানর পরাজিত ও দখল করা নরনারীদিগকে যে ভাবে ব্যবহার করিত তাহাতে আর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত জনগণের কাহ প্রণালীতে বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

আমেরিকান ইণ্ডিয়ান-সমাজে পরাজিত নরনারীদিগকে নান উপায়ে নিজের লোকরূপে সমাজে ঠাই দেওয়া হইত। পুরুষ দিগকে নির্ধ্যাতন করা হইত। পরে তাহারা সমাজের ভিত-ভাই বলিয়া গৃহীত হইত। মেয়েদিগকে বিবাহ করা হইত তাহাদের সম্মানসম্মতিরূপে সঙ্গে সঙ্গে পোষ্য বিবেচিত হইত এই সমাজে মানুষের পরিশ্রম খাটাইয়া থরচের চেয়ে বেশী দামে মাল উঠানো সম্ভব ছিল না। কাজেই মানুষকে জানোয়ারের মতন ব্যবহার করিবার দরকার আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিন্তু পশুপালন, ধাতু শিল্প, কাপড় চোপড় বুন্য এবং চাষ আবাদের ফলে মানবসমাজে এক আর্থিক বিপ্লব ঘটে। এই

যুগের স্ত্রী সহজে ক্ষুণ্ণিত না। জীলাভ করিতে হইলে “পয়সা খরচ” করিতে হইত। সেইরূপ ধনোৎপাদনের জন্তও মজুর জুটাইতে হইত। কাজেই মানুষকে জানোয়াররূপে পাইবার জন্ত এটা চাহিদা সমাজে দেখা দিয়াছিল। অধিকন্তু জানোয়ার-শুলা এই সমাজে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সম্পত্তি।

প্রত্যেক পরিবারে জানোয়ারের পাল বৎসর বৎসর বাড়িয়া যায়। কিন্তু পরিবারের লোক সংখ্যা এত শীঘ্র এবং এত বেশী বাড়ে না। কাজেই পশু তদ্বীর করিবার জন্ত প্রত্যেক পরিবারেই মজুর নিয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় পরাজিত শত্রুকে গোলামরূপে পরিবারের সঙ্গে রাখিয়া রাখার প্রথা আবিষ্কৃত হয়।

ধন দৌলতের বৃদ্ধি এবং গোলাম-প্রথা এই দুইয়ের প্রভাবে জোড় পরিবার এবং মাতৃবিধি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছিল। জননীরাই তখন রাজ্য বটে, কিন্তু জনক নেহাৎ অবজ্ঞাত বা অজ্ঞাত ছিল এইরূপ ভাবিবার কারণ নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে বোধ হয় আজকালকার তথাকথিত সামাজিক চোখে পরিজ্ঞাত জনক অপেক্ষা জোড় পরিবারের জনক সহজে সন্দেহ কমই ছিল।

“নারীর আমলের” শ্রম বিভাগনীতি অহুসারে পুরুষের জিন্মায় ছিল খাওয়া দাওয়া সংগ্রহ করিবার কাজ। এই সম্পদের যত্নপাতি সবই ছিল তাহার নিজস্ব। অপর পক্ষে স্ত্রী থাকিত ঘরকন্নার রাণী। জানোয়ারের পাল এবং গোলামের দল এই দুই নয়া সম্পত্তিও ছিল পুরুষেরই অধিকারে।

কিন্তু সম্পত্তিগুলার উত্তরাধিকারী হইত কাহারো? জননী-

বিধি তখন স্বত্বের আইন নিষ্পত্তি করিত। বাপ তাহার ছেলে-পুলেকে নিজ সম্পত্তি দিয়া বাইতে পারিত না। সম্পত্তিওলা গোষ্ঠীর ভিতর থাকিতে বাধ্য। গোষ্ঠী :—সেত মায়ের নামে চলে, মায়ের বংশের লোকের সমষ্টি। কাজেই মায়ের সমরক্ত আত্মীয়েরা সম্পত্তি পাইত। পুরুষের নিজ স্ত্রীর সম্মানসম্বন্ধিতরা গোষ্ঠীর বহির্ভূত। স্ততরাং বাপের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তিতে তাহাদের কোনো অধিকার বর্তে না।

তবে পুরুষের ছেলেপুলেরা সম্পত্তির অধিকারী হইত কিরূপে ? তাহারা তাহাদের জননীর অর্থাৎ বাপের স্ত্রীর গোষ্ঠী ভুক্ত, বাপের গোষ্ঠীভুক্ত নয়। কাজেই জননী বংশের অন্তর্গত আত্মীয়দের * যে যে ধনদৌলতে অধিকার ইহাদের সেই সবে অধিকার।

জানোআর, গোলাম ইত্যাদি সম্পত্তির অধিকারী পুরুষ যখন মরিত তখন এইগুলি পাইত কাহারো ? তাহার ভাই বোনেরা এবং ভাগ্নে ভাগ্নীরা। দরকার হইলে তাহার মাসতূত ভাই বোনেরাও এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিত। নিজের স্ত্রী অথবা ছেলেপুলেরা এই জানোআর-ধন বা গোলাম-ধনের মালিক হইতে পারিত না।

জননী-বিধির বিরুদ্ধে পুরুষের বিজ্রোহ

ধন দৌলত বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ স্বভাবতঃ নিজের ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে অনুভব করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সনাতন জননী-বিধির বিরুদ্ধে তাহার মেজাজ খেলিতে লুফ করিয়াছিল। বিশেষভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক নিয়ম ওলা তাহার চিন্তায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

জননী-বিধি ভাঙিয়া ফেলা এই যুগে পুরুষের এক বড় কাজ। কিন্তু এই বিপ্লবসাধন আজকালকার চোখে বত কঠিন বোধ হইতেছে তখনকার দিনে তত কঠিন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের কতি না করিয়াই এই আর্থিক বিপ্লব ঘটনা সম্ভবপর হইয়াছিল।

পুরুষের সম্মানসম্বন্ধিতরা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোক,—কেবল এই নিয়মটা কায়েম করা মাত্রই সকল ল্যাঠা চুকিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দিক্‌কার সম্মানসম্বন্ধিতদিগকে তাহাদের বাপের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। মাতৃ-গোষ্ঠী জননী-বিধি, নারীর অমল উড়িয়া গেল। তাহার স্থানে দেখা দিল বাপের নাম, জনক বংশ, পুরুষের আইন।

কবে কোথায় জননী-বিধিকে উড়াইয়া দিয়া জনক-বিধি মানব সমাজে জুড়িয়া বসিয়াছে তাহার প্রমাণ বাহির করা বড় কঠিন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটিয়াছিল। বাথোফেন সংগৃহীত নিদর্শনগুলি আলোচনা করিলে সেই সাবেক কালের জননী-গোষ্ঠীর প্রভাব কিছু কিছু আন্দাজ করা যায়।

এই বিপ্লব অতি সহজেই আজও আমাদের চোখের সম্মুখেই সাধিত হইতেছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিপুঞ্জ এই আইন পরিবর্তনের সজীব দৃষ্টান্ত। ধনসম্পদ বাড়িবার কালে এই বিপ্লব ঘটিতেছে। নির্বিড় বন জঙ্গলে বসবাস ত্যাগ করিয়া প্রেরি নামক তরুহীন ঘাসবহুল সমতল মাঠে বস্তু গাড়ার সঙ্গে সঙ্গেও জীবনযাত্রার প্রণালী, স্বত্বাধিকারে নিয়ম ইত্যাদি বদলাইয়া বাইতেছে। অধিকন্তু খুঠান পাজী এবং

বর্তমান উৎকর্ষের যুগের ধাক্কাও জননী-বিধি উড়িয়া যাইতেছে।

মিসৌরি জনপদের আর্টটাইন্ডিয়ান জাতির ভিতর ছয়টাতে “পুরুষের আমল” কায়েম হইয়াছে। “নারীর আমল” এখনও চলিতেছে বাকী দুইটায়। শাওনি, মিয়ামি এবং ডেলাওয়ার জাতিদের ভিতরও নয়া প্রথা প্রবেশ করিতেছে। ছেলেপুলে-দিগকে বাপের নাম দেওয়া হইতেছে এবং এই উপায়ে বাপের সম্ভ্রান্তিতে উত্তরাধিকারের একুতিয়ার সৃষ্ট হইতেছে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বলেন :—“মানুষ চিরকালই এইরূপ কূটকৌশলের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। নামটা মাত্র বদলাইয়া সে জিনিষটাই বদলাইয়া দিল এইরূপ বিশ্বাস করা তাহার স্বভাব। একটা মতলব হাঁসিল করিবার জন্য সে সহজেই কোনো প্রথা ভাঙিয়া তাহার ভিতর একটা নতুন কিছু কায়েম করিবার জন্য ছিদ্র বাহির করিতে পারে। এই জন্য তাহার মাথায় যুক্তির অভাব হয় না।”

শাওনি, মিয়ামি ইত্যাদি সমাজে নাম বদলাইবার ব্যবস্থা করিয়া বস্তুতঃ মহা হব্যবল সৃষ্টি করা হইয়াছে। সোজানুজি জনক-বিধি কায়েম করিলেই কোনো গণপোল থাকিত না। কিন্তু কার্ল মার্কস বলেন :—“এই প্রণালীই পুরাণের ঠাঁইয়ে নতুন আমদানি করিবার পক্ষে অতি স্বাভাবিক।”

জননী-বিধির পতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির পরাজয় ঘোষিত হইল। পুরুষেরা একমাত্র জানোয়ার ও গোলাম এবং খাওয়াপরাই অস্ত্রস্ত যয়পাতি সম্বন্ধে স্বযোনিতে এবং স্বনামে উত্তরাধিকারের একুতিয়ার পাইয়া থাকে নাই। ইহারা ঘরকরা

গৃহস্থালি ইত্যাদি নারীর সম্পত্তি বা “জীধনে”ও দখল বলাইয়া ছিল। মেয়েরা “পুরুষের আমলে” সকল ইচ্ছা হারাইয়া মাসে পরিণত হইল। তাহাদের একমাত্র ব্যবসা হইল পুরুষের ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সম্মান প্রসবের কল যাজ হওয়া।

নারীজাতির দুর্গতি হোমারীয় যুগের গ্রীক সমাজে বিশেষ পরিষ্কৃত। পরবর্ত্তী কালের গ্রীস উৎকর্ষের এক উন্নততম দেশ। সেই যুগে নারীর দুর্গতি আরও অধিক যাজ্যই দেখা দিয়াছিল। ক্রমশঃ এই দুর্গতিকে নানা উপায়ে “লেপ মুড়ি” দিয়া অথবা চুনকাম করিয়া ধানিকটা ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই “পোষাকী সমাজে” বা ছদ্মবেশেও নারীর দুর্গতি লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। আজকালকার নারীর ইচ্ছা আর সেই জননী-বিধির যুগের স্বাধীনতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

পুরুষ পরিবারে ও সমাজে রাজা হইয়া বসিল। তাহার অধীনে পরিবারের ভিতর কতকগুলি স্বাধীন ও গোলাম নরনারী বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইল। সেমিটিক জাতির তিনজন পরিবারের নামক এক সঙ্গে বহু জ্ঞী ভোগ করে। তাহার পরিবারের গোলামেরাও সস্ত্রীক তাহার সঙ্গেই ঘর করে। সকলে মিলিয়া জানোয়ার চরাশো এই সুবিধিত যৌথ পরিবারের কাজ।

বাপের এক্তিয়ার আর গোলাম-প্রথা এই দুই বস্তু “পুরুষের আমলের” পারিবারিক কেজে সর্বপ্রথম দেখা দেয়। প্রাচীন রোমের পারিবারিক জীবন এই সামাজিক পদ্ধতির বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। ল্যাটিন ভাষায় “ক্যামিলিয়া” শব্দে আজকালকার

৭০ পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

প্রচলিত “পরিবার” বুঝাইত না। আজকালকার পরিবারে লোক দেখানো স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে “অন্তরে গরল মাথা” কৌদল লড়াই চলে। রোমের “ক্যামিলিয়া” ছিল খোলাখুলি বাপের একচ্ছত্র রাজ্য আর গোলামের বাথান। বস্তুতঃ গোলামই ছিল “ক্যামিলির কেন্দ্র।”

প্রথম প্রথম রোমের লোকেরা ক্যামিলি শব্দে এমন কি পরিবারের প্রধান দুই ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রী এবং তাহাদের সম্ভানসম্পত্তিও বুঝিত না। গোলাম ছিল এই শব্দের নির্দিষ্ট ব্যক্তি। পরিবারের অন্তর্গত দাস বুঝাইবার জন্য তাহারা “ক্যামির্ডুস” শব্দ ব্যবহার করিত। “ক্যামিলিয়া” ছিল কোনো ব্যক্তির অধীনস্থ দাস সমষ্টির প্রতিশব্দ। গেয়াসের আমলে লোকেরা উইল করিয়া “ক্যামিলিয়া” অর্থাৎ দাস সমষ্টি দান করিয়া বাইত। অবশ্য এই সম্পত্তি ছিল প্যাট্রিমোনিয়ুম বা পিতৃসম্ব। গোটাপরিবার ক্রমশঃ এই একই শব্দে বুঝানো হইতেছিল।

রোমান পরিবারে বাপ ছিল সর্বময় কর্তা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং দাস সমষ্টির উপর তাহার এক্তিয়ার ছিল চরম। অর্থাৎ সকলেরই উপর সে জীবন মরণের অধিকার ভোগ করিত। এই বস্তুত্বের আটা সমাজকেন্দ্র হইতেই পরিবার শব্দ জগতে উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রীকেরা রোমান “আর্থ” হইতে তখন তকাৎ হইয়া গিয়াছিল। চাষ আবাদ এবং দাসত্ব প্রথাও তখন মানবসমাজে সুপ্রচলিতই ছিল।

মার্কস বলেন :—বর্তমান উৎকর্ষের যুগের ক্যামিলি বা পরিবারকে গোলামীর কেন্দ্র বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল ব্যক্তিগত সাধারণ গোলামী রাজ্য নয়, ভূমিগত গোলামীও

পরিবারের সঙ্গে জড়িত। চাষআবাদের কাজে কতকগুলো মানুষকে জানোয়ারের মতন ব্যবহার করিবার জন্যই বর্তমান পারিবারিক প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন যুগে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় যত প্রকার দ্বন্দ্ব ও লড়াই দেখা দিয়াছে সকলগুলোর বীজই পরিবারের ভিতরে নিহিত আছে। এইরূপ বুঝিলে ইতিহাসে পরিবারের কিম্বৎ পাকড়াও করা যাইবে।”

পুরুষাধিপত্যের জন্ম

এক পত্নীপতিত্বের পথে জোড়পরিবার এইরূপেই দেখা দিয়াছিল। পুরুষের নামে বংশের পরম্পরা রাখিবার জন্য স্বামী নিজের ইচ্ছা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে চলিতে সুরু করিল। ফল হইল স্ত্রীর উপর জুলুম। পত্নী যাহাতে পরপুরুষে আসক্ত না হয় সেই দিকে গেল পুরুষের চিন্তা। আইন গড়িয়া উঠিল তদন্তরূপ। স্ত্রীর উপর পুরুষের যথেষ্ট অধিকার দেখা দিল। স্ত্রীকে হত্যা করিলেও সে অস্ত্রায় বা বেআইনী কিছু করিল এরূপ ভাবিবার আর অবসর থাকিল না।

পুরুষ-বিধি জারি হইবার যুগ সম্বন্ধে সাহিত্য নিবন্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। তুলনামূলক আইন-বিজ্ঞানের আলোচনায় মানব জাতির সেই অবস্থা পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে। মাক্সিম কোহো-লেমসকি প্রণীত “ভার্সো দেজ ওরিজিন এ দ’ লেহোমালিউসিয়েঁ দ’ লা কামিয় এ দ’ লা প্রোপ্রিয়েতে” নামক পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক ফরাসী গ্রন্থ ১৮২০ সালে হাইডেনের ষ্টকহলম নগরে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার

সার্কিয়া এবং বুলগেরিয়া দেশে “জাফগা” (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ) এবং “ত্রাংসংভো” (অর্থাৎ সৌভ্রাজ্য সন্মত) নামক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন।

এশিয়ায় এই ধরণের কুটুম্ববর্গ, “বেরাদরি,” জাতিরদল, “জাতভাই” ইত্যাদি আজও বর্তমান আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কোঙ্সালেন্সসকি মাক্কাতার আমলের জনক-বিধি নিয়ন্ত্রিত যৌথপরিবার বিবেচনা করেন। ইহার মতে আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজে প্রচলিত এক-পত্নীত্ব আর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জননী-বিধি নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক প্রথার মাঝামাঝি এই সব “বন্ধুবর্গ,” জাতিসন্মত, পিতৃকুল ইত্যাদির ঠাই প্রাচীন আর্ধ্য ও সেমিটিক জাতিপুঞ্জের সম্বন্ধে এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে বিশেষ কোনো আপত্তির কারণ নাই।

জুগোস্লাভিয়ার “জাফগা” যৌথপরিবার পল্লীসমাজের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জনকের সম্মানসম্মতির কয়েক পুরুষ ধরিয়া এইরূপ পরিবারে একসঙ্গে বসবাস করে। একই জমি চষা হয়। কাপড়চোপড় তৈয়ারি এবং ব্যবহার করা হয় একসঙ্গে। মেহনতের সকল প্রকার ফল এবং মুনাফাই সমবেতভাবে ভোগ করা হইয়া থাকে।

“জাফগা”র কর্তা থাকে “দোমাসিন”। এই ব্যক্তি পরিবারের নায়ক হিসাবে কেনাবেচা ইত্যাদি সবই নিজ জিম্মায় চালায়। সকলের চেয়ে যে বয়সে বড় সেই কর্তা হয় এমন নয়। সকলে মিলিয়া যাহাকে কর্তা বাছাই করা হয় সেই “দোমাসিন”। “দোমাসিনে”র পত্নীকে বলে “দোমাসিনা”। এই নারীর অধীনে “জাফগা”র সকল মেয়ের জীবন পরিচালিত হয়।

মেয়েদের স্বামী বাছাই কালে “দোমাসিনা”র এক্টিভার এক প্রকার অসীম।

পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া সভা করে। এই পারিবারিক সভাই বাস্তবিক পক্ষে সকল বিষয়ে চরম কর্তৃত্বের অধিকারী। “দোমাসিন”ও এই সভার নিকট জবাবদীহি হইতে বাধ্য। জমিজমা ইত্যাদি কেনাবেচা সম্বন্ধে এবং সামাজিক লেনদেন ও অন্যান্য বিষয়ে এই সভার মজলিস ছাড়া কিছুই মীমাংসা হইবার জো নাই।

রুশিয়ায় যে এই ধরণের যৌথপরিবারের সমাজ চলিয়া আসিতেছে তাহা ১৮৭৫ সালের পূর্বে কেহই বিশ্বাস করিত না। পরবর্তী কালে রুশিয়ার পরীসমবায়ের মতন পরিবারসমবায়ও পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।

জুগোস্লাভিয়ার ডাল্মাসিয়া জনপদের পরীবিধিতে এই পরিবারসমবায় বা যৌথপরিবারকে বলে “স্কল্লর্য”। প্রাচীনতম রুশ আইনগ্রন্থেও এই শব্দই ব্যবহৃত দেখিতে পাই। যারোস্লাভের “প্রাক্সভা” সেই রুশবিধির নাম। প্রাচীন পোল্যান্ড এবং চেকমুহ্লকের সংহিতায় বা স্বতি শাস্ত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন জার্মানদের সমাজ প্রতিষ্ঠান আলোচনা করিয়া হম্‌স্‌লার এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও দেখিতে পাই কোনো একটা পরিবার সাবেক কালে আর্থিক বা সম্পত্তি বিষয়ক কেন্দ্র ছিল না। সমবেত ধরকরাই ছিল জার্মানদের দত্তর। পরিবারগুলা যৌথভাবে পুরুষাঙ্কমে কখনো কখনো গোলাঘের দল লইয়া বসবাস করিত।

কোহ্নালেহ্‌সকির মতে প্রাচীন রোমের পরিবারও এই শ্রাভ, জার্গাশ শ্রেণীরই সামাজিক ও আর্থিক কেন্দ্র ছিল। ইহার বিবেচনায় রোমান পরিবারকে বেক্রপ বহুকঠোর শিকলে বাঁধা একচ্ছত্র শাসনের জীবন বিবেচনা করা হয় সে সঘর্ষে সঙ্কেহ করা চলে। “পরিবারসভা” নামক প্রতিষ্ঠান যে সমাজে চলে সেই সমাজে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্ব চলে না সহজেই বোধগম্য।

আয়ার্ল্যান্ডের কেন্টিক সমাজেও পরিবার সমবায়ের প্রথা বাহির হইয়াছে। ক্রান্তে বিপ্লবের যুগপর্ষ্যন্ত নিভানে অকলে এই প্রথা ছিল “পার্সোনারি” নামে। ক্রাশ কোং অকলে প্রথাটা এখনও চলিতেছে। সাওন এবং লোআর জনপদে বড় বড় বস্তি দেখা যায়। এইগুলায় সুবিস্তৃত যৌথ আরামশালা বা বৈঠকখানা এক বিশেষত্ব। এই বৈঠকখানার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন শোআর ঘর আছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়া এক একটা চারী পরিবার এইরূপ বস্তিতে সমবেতরূপে জীবন ধারণ করে।

আলেকজান্দারের সেনাপতি নেআর্থস পভাবে যৌথ পরিবার এবং যৌথ আবাদ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজও এখানে সেই প্রথা বিদ্যমান। ককেসাস অকলে কোহ্নালেহ্‌সাকি নিজেই এই পারিবারিক প্রথা চুঁড়িয়া বাতির করিয়াছেন।

উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া দেশে কাবিলজাতির তিতর এই প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। আমেরিকারও এই প্রথা বাহির হইয়াছে। প্রাচীন মেক্সিকোর “কাল্পুলিস” নামক প্রতিষ্ঠান ছিল। সেইটা নাকি যৌথ পরিবারেরই অল্পরূপ। কিন্তু পেরুদেশ সঘর্ষে কুনো অস্ত্র কথা বলেন। ইহার মতে এদেশে জমি ভাগা-

ভাগি করিয়া দেওয়া হইত। জমির উপর ব্যক্তিদের নিজ নিজ এক্টিয়ার ছিল। এই ব্যবস্থা অবশ্য ঋষ্ঠানদের পেরুবিজনের সমসাময়িক।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে জনক-বিধি, জাতিবর্গ, পরিবারসমবায় আর যৌথচার মানব সভ্যতার ইতিহাসে বেশ বড় ঠাই অধিকার করিয়াছিল। কোহ্সালেহুসকির গবেষণায় আরও জানিতে পারি যে এই যৌথ পরিবারই কালে পল্লী-সমবাসে পরিণত হয়। পল্লীসমবাসের অধীনে জমিগুলা স্বতন্ত্রভাবে নিদ্রা স্বরূপ চবা হইত। ক্রমশঃ জমিগুলা নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

যৌথ পরিবারের ভিতর কর্তার ক্ষমতা ক্রমসমাজে অতিমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। পুত্রবধূদিগকে ভোগ করা ইহার এক মামুলি কাজের অন্তর্গত ছিল। কৃষিয়ার পল্লীগাথায় এই সমাজচিত্র পরিষ্কৃত।

বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-পতিত্ব কোনো সমাজেই সর্বত্র প্রচলিত প্রতিষ্ঠান হইতে পারে না। দুইই বিলাস মাত্র। বিলাস ভোগ কোনো জাতিরই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যে সমাজে দুইই এক সঙ্গে প্রচলিত সেখানে প্রতিষ্ঠান দুইটা অতি সাধারণ এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব। কারণ সেখানে যে কোনো ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী যে কোনো নারীর দ্বিতীয় স্বামীকে সহজেই পায়। অর্থাৎ সেখানে “দলগত” বিবাহ পদ্ধতিই চলিতেছে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু যে সমাজে পুরুষেরা বহু স্ত্রী ভোগ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীরা বহু স্বামীর অধিকারী নয় সেই সমাজে একমাত্র সম্পত্তি-

খালী লোকের পক্ষে এই প্রথা চালানো সম্ভবপর। এই প্রথা গোলাম কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত কিন্তু জনসাধারণ এক-পত্নীত্বই পালন করিয়া চলে। বহু-পত্নীত্ব ব্যতিরেক বিশেষ। সেইরূপ তির্কতী এবং ভারতীয় সমাজের বহু-পত্নীত্বও ব্যতিরেক বিশেষ।

নায়াব সমাজে এক নারীর বহু স্বামী দেখা যায়। ইহা বহু-পত্নীত্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুপত্নীত্বের সঙ্গে সঙ্গে বহু-পত্নীত্বও চলিতেছে। কারণ প্রত্যেক পুরুষই অন্ত্যন্ত পুরুষের সঙ্গে দ্বিতীয় নারীর স্বামী হইতে পারে। বিবাহ সম্বন্ধে নায়াব প্রথায় ক্লাব রচিত হয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোনো মতেই এখানে খাঁটি বহু-পত্নীত্বের একচেটিয়া রেওয়াজ নাই। বস্তুতঃ সেই মাক্কাতার আমলের দলগত বিবাহ পদ্ধতিই এখানে চলিতেছে বলিতে হইবে। পুরুষেরা এখানে বহু-পত্নীক, দ্বীরাও বহু-স্বামিক।

বর্তমান যুগের এক-পত্নীত্ব বা এক-পত্নীত্ব, জননী-বিধি বা “নারীর আমল” ভাঙিয়া যাইবার পর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। “নারীর আমল” ভাঙিয়াছিল জোড়-পরিবারের যুগে। তাহার পূর্বে ছিল দলগত বিবাহের নানারূপ। সেই রকম পারিবারিক কেন্দ্রের চিহ্ন স্বরূপই আজও কোথাও কোথাও বহুপত্নীত্ব দেখা যায়। বহু-পত্নীত্ব জগতে বিরল,—একমাত্র ধনী ব্যক্তি বিশেষের বিলাস সামগ্রী রূপে এশিয়ার কোথাও কোথাও ইহার চল আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার

বহুকাল ধরিয়া জগতে চলিয়াছিল জোড়-পরিবারের যুগ। মাজ্জাতার আমলের “বার্কার” স্তরটা আগাগোড়াই এই ধরণের পারিবারিক কেন্দ্রের সমাজবিজ্ঞানে ভরা ছিল। ক্রমে ক্রমে এক-পত্নীত্ব এবং এক-পতিত্ব গজাইয়া উঠে। “বার্কার” এবং উৎকর্ষের স্তরের সঙ্ঘিকালে জোড়-পরিবার ছুনিয়া হইতে একদম লুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

জনক-বিধি, বাপের নামে বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার, এক কথায় “পুরুষের আমলে”র সঙ্গে সঙ্গে একপত্নী (পতি-) স্ব মানবসমাজে মাথা তুলিয়াছে। পুরুষ যাহাতে নিজের সম্ভান-সম্পত্তিকে বিনা সন্দেহে চিনিতে পারে এবং প্রতিবেশীর ভিতর চিনাইতে পারে তাহার জন্তই এই বিবাহপদ্ধতি সমাজে শিকড় গাড়িতে পারিয়াছে।

জোড়পরিবারে বিবাহবন্ধন অনেকটা শিথিল ছিল। এই ব্যবস্থায় পুরুষ কিছা জী যে কেহ ইচ্ছা করিলেই সহজে পারিবারিক কেন্দ্রটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। একপত্নী-(পতি)- স্বের ব্যবস্থায় বিবাহ ভাঙা তত সহজ নয়। তবে মোটের উপর একমাত্র পুরুষেরই এই অধিকার আছে। এমন কি ফরাসী আইন “কোড নেপোলিয়নে”র বিধানেও পুরুষ উপপত্নী রাখিতে অধিকারী। উপপত্নীদিগকে নিজ পরিবারের ভিতর না আনিলেই হইল। কিন্তু কোন জী যদি তাহার সাবেক কালের স্বাধীনতা

কিছুমান ভোগ করিতে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে সমাজে এবং আইনে তাহার সাজা হয় প্রচুর।

হোমারের গ্রীক সমাজ

একপত্নী-(পতি)-ত্বের ব্যবস্থায় নারীর দুর্গতি হইয়াছে যথেষ্ট। প্রাচীন গ্রীক সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কার্ল মার্ক্স গ্রীক পুরাণ সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—“গ্রীক দেবীগণের ইতিহাসে দেখিতে পাই তাহারা কোনো অতীতকালে যোনি-সন্তোগ বিষয়ে বেশ স্বাধীন ছিল। এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা ভোগও তাহাদের জুটিত অনেক। কিন্তু বীরযুগের নর-নারীর কার্যকলাপে দেখা যায় যে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের উপর অধিকার পাইয়া বসিয়াছে। গোলাম-প্রথার ফলেও নারীর ইচ্ছা যার-পর-নাই অবনত হইয়াছে।”

“অদিসি” গ্রন্থে তেলেমাখস নিজ জননীকে গালাগালি করিয়া বে-ইচ্ছা করিয়াছে। কবি হোমারের বৃত্তান্তে জানিতে পারি যে, লড়াইয়ের দখল-করা মেয়েরা বিজেতা সেনাপতিদের ভোগ্য্য বিবেচিত হইত। পণ্টনের নায়কেরা নিজ নিজ পদ ও খেতাব অঙ্গুসারে স্ত্রীর ভোগের অধিকারী ছিল। এই ধরনের একটা দখল-করা মেয়ে লইয়াই আধিলেশ এবং আগামেয়ন তক্কার শুরু করে। সেই তক্কারই গোটা “ইলিয়াদ” কাব্যের খুঁটা।

যখনই হোমার কোনো হোমড়াচোমড়া ঘোষার নাম করিয়াছেন তখনই তিনি সেই সঙ্গে তাহার ভোগ্য্য দাসী এবং ভোগ-শয্যার কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সকল

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিমাণ ৭৯

হৃদয়বীরা! অনেক সময়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে তাহাদের মূর্খকে পর্যন্ত গিয়াছে। নাট্যকার এপ্‌থিলিসের রচনায় জানা যায় যে, আগামেয়ন দাসী কাসান্দ্রাকে স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপ যোনি-সংসর্গে যে পুত্র উৎপন্ন হইত তাহারা কিছু কিছু বাপের সম্পত্তি পাইত। তাহাদিগকে গোলাম বিবেচনা করা হইত না। উপপত্নীর বিরুদ্ধে আসল পত্নীরা কিছুই বলিতে পারিত না। তাহাদিগকে সবই নীরবে সঙ্ঘ করিতে হইত অবশ্য পত্নীরা আবার নিজ সতীত্ব বজায় রাখিতে বাধ্যই ছিল।

পরবর্তী কালের সভ্যতার যুগে গ্রীক নারীর দুর্গতি আরও বেশী ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই হোমারীয় সাহিত্যের বীরযুগে নারী মাতৃত্বের আমলের স্বাধীনতার তুলনায় নেহাৎ নগণ্য জীবন চালাইত। তাহার স্বামীর বিচারে এবং আইনের চোখে সে প্রাধান্য পত্নী মাত্র,—অথবা উত্তরাধিকারীদের জননী মাত্র বিবেচিত হইত। পরিবারের ঘরকন্না, দাসদাসী ইত্যাদির উপর তাহার কর্তৃত্ব চলিত এই যা। এই দাসীদের ভিতর হইতে আবার স্বামী যখন তখন ঘাহাকে তাহাকে খোলাখুলি ভাবে উপপত্নী রূপে বাছিয়া লইত।

জোড়-পরিবার ভাঙিয়া যাইবার যুগ হইতে আজ পর্যন্ত জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে এক-পতিত্বই কায়েম হইয়াছে। এক-পত্নীত্ব কোথাও দেখা যায় না। পরিবারের ভিতর দাসী—“কেনা গোলাম” নারী—ধাকার দরুণ প্রত্যেক কর্তাই অতি সহজে উপপত্নী ভোগ করিয়া আসিতেছে। যেদিন হইতে গোলাম-প্রথা দেখা দিয়াছে সেই দিন হইতে নারী—বিবাহিতা স্ত্রী—মোটের উপর এক-পতিত্বের আইন মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব আইনতঃ এবং মুখে মুখে এক-পক্ষীক থাকিয়াই কার্যতঃ বহু-পক্ষীক রহিয়াছে। পারিবারিক গঠন, বিবাহপদ্ধতি এবং যোনিসংসর্গের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় সমাজে দাসত্ব-প্রথার প্রভাব তলাইয়া দেখা আবশ্যক।

স্পার্টা ও আথেন্স

পরবর্তী কালের গ্রীক সমাজের কথা বর্ণিতে হইলে ভোরীয় এবং যোনীয় এই দুই সমাজের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ভোরীয় জাতির পীঠস্থান স্পার্টা। হোমার বিরূত রীতিনীতি অপেক্ষা স্পার্টার রীতিনীতি অনেক পুরাণো। ভোরীয় সমাজে একপক্ষী-(পতি)-ত্বে দেখা দেয় নাই বলা হইতে পারে। সেখানে চলিতেছিল জোড়-পরিবার এবং এমন কি অনেকটা প্রাচীনতম কালের দলগত বিবাহপদ্ধতি অর্থাৎ বহু-পক্ষীত্ব এবং বহু-পতিত্ব।

বিবাহের পর সন্তান জন্ম সহজে কোনো শারীরিক বিষ ঘটিলে বিবাহ রদ করা হইত। খৃষ্ট-পূর্ব ৬৫০ অব্দে রাজা আনাক্সান্দ্রদাস প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়ায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। একসঙ্গে চলিতেছিল দুই পরিবার। সেই সময়ে রাজা আরিষ্টন প্রথম দুই পক্ষীই নিঃসন্তান ছিল বলিয়া তাহার তৃতীয় পক্ষী গ্রহণ করিয়াছিল।

স্পার্টায় কয়েক ভাইয়ে মিলিয়া এক নারী ভোগ করিতে পারিত। কোনো বন্ধুর পক্ষী কাহারও পছন্দ হইলে সে তাহাকে নিজ পক্ষীরূপে ব্যবহার করিত। আসল স্বামী আপত্তি করিত না। অদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, স্বাধীনই হউক বা

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ৮১

গোলামই হটক, স্পার্টার পুরুষেরা শারীরিক শক্তিশালী যে কোনো লোককে তাহাদের জীবনের অধিকার দিতে অভ্যস্ত ছিল।

জার্মান পণ্ডিত স্ট্রোমেন প্রণীত “গ্রীক প্রতিষ্ঠান” বিষয়ক গ্রন্থে ঘোনি-সন্তোষ বিষয়ে আরও গভীরতর স্বাধীনতার প্রমাণ আছে। এক ব্যক্তি কোনো বিবাহিতা নারীর সঙ্গে ভোগের ইচ্ছা জানাইলে নারী তাহার স্বামীর নিকট পুরুষকে ভিড়াইয়া দিয়াছিল। প্লুটার্ক এই গল্প প্রচার করিয়াছেন। স্বামীর অজ্ঞাতে পরপুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্পার্টার নারী মহলে ঘটিত না—ঘটিবার দরকারই হইত না।

অপর দিকে স্পার্টা-সমাজের আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এখানে পরিবারের ভিতর দাসদাসী বাধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। “হেলট”রা কর্তার জমিজমার উপর স্বতন্ত্র-ভাবে বসবাস করিত। কাজেই উপপত্নীর প্রথা ভোরীয় সমাজে গড়িয়া উঠে নাই।

মোটের উপর স্পার্টায় নারীর ইচ্ছা খুব উচু ছিল। অত্যন্ত গ্রীক সমাজে এই ইচ্ছা জানা ছিল না। বস্তুতঃ স্পার্টা-নারী এবং আথেন্সের “হেতেরে” নামক বারাদনা সম্বন্ধে সেকালের গ্রীকেরা যথেষ্ট স্মৃতি প্রকাশ করিত।

যোনীয় সমাজের পীঠস্থান ছিল আথেন্স। এখানকার আদব-কায়দা ছিল স্পার্টা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়েরা শিখিত সূতা কাটিতে, বুনিতে এবং শেলাই করিতে। কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখিত। তাহাণ্ডা একপ্রকার “অবরোধে”ই জীবন যাপন করিত। বড় জোর অত্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে তাহাদের মেলামেশা চালাত।

মেয়েদের মহল ছিল বাড়ীর ভিতরকার একটা স্বতন্ত্র বিভাগ। হয় দোতালায় না হয় পেছন দিকে থাকিত “অন্দর”। পুরুষদের বিশেষতঃ অতিথিদের সেই মহলে ছিল “প্রবেশ নিষেধ”। বস্তুতঃ পুরুষ অতিথি দেখা করিতে আসিলে আখেন্সের গৃহস্থ-নারীরা অন্দরের আড়ালে চলিয়া যাইত। ঘরের বাহিরে বাহ্যিক মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। রাস্তায় দাসী চলিত সঙ্গে। ঘরের ভিতর তাহাদের উপর শাসন ছিল খুব কড়া।

নাট্যকার আরিষ্টোফানিস্ বলেন, আখেন্সের মেয়েদেরকে হুশাসনে রাখিবার জন্য অন্দরে মোলোস দেশের কুকুর রাখা হইত চৌকি দিতে। কুকুরের ভয়ে কোনো পরপুরুষ অর্থাৎ অপরিচিত লোকে মেয়েদের সঙ্গে একত্র হইতে পারিত না। কাজেই মেয়েদের সতীত্ব বাঁচিয়া যাইত। এসিয়া মাইনরের যোনীয় সমাজে হিজরা নপুংসক থাকিত মেয়েদের পাহারায়।

স্বভাবজ নপুংসক জুটানো সহজ নয়। কাজেই কৃত্রিম কৌশলে নপুংসক তৈয়ারি করিয়া লওয়া আথেনীয় সমাজে একটা ব্যবসাবিশেষ ছিল। ঐতিহাসিক হেরোদোটাস সেই ব্যবসা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নপুংসক গ্রীসে ত কাজে লাগিতই,—গ্রীসের বাহিরেও বিদেশী সমাজে কৃত্রিম হিজরার চল ছিল।

গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডেস্ স্ত্রী জাতিকে “অয়কুরেমা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। শব্দটা ক্লীবলিঙ্গ। নারী “বস্তু” বিশেষ, ব্যক্ত নয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঘরকন্না, গৃহস্থালী ইত্যাদির জন্য এই বস্তুটা কাজে লাগে। সম্ভান পয়সা করা ইহার প্রধান কাজ। দ্বিতীয় কাজ বাড়ীঘর দিক্জলিমিছিল রাখা অর্থাৎ দাসীগিরি করা।

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার , ৮৩

পুরুষ শারীরিক কৃতি কস্রত করিত। মেয়েদের তাহাতে কোনো যোগ দিবার এক্তিয়ার ছিল না। পুরুষেরা সজা করিত, বৈঠকে বসিত, গোষ্ঠিতে আচ্ছা মারিত। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষেরা এক সঙ্গে এই সকল সত্য কোনো অল্পটান চালাইত না।

পুরুষের তাঁবে দাসী থাকিত। আথেলের চরম উন্নতির যুগে বেস্তাবৃষ্টি সমাজে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পবর্ণমেষ্ঠ। এই পেশা কুনজরে দেখিত না। এই বেস্তাবৃষ্টির প্রভাবেই “হেতেরে” প্রথা দেখা দেয়। “হেতেরে” জগতে এক অদ্ভুত বারাকনা প্রথা। প্রাচীন দুনিয়ার আর কোথাও বারাকনা আথেলের মতন কলা বিস্তায় নিপুণতা লাভ করিতে পারে নাই।

গ্রীক সমাজে স্পার্টার নারী ছিল স্বাধীনতায়, দেমাকে এবং চরিত্রে প্রসিদ্ধ। আথেলের “হেতেরে”রা শিল্প ও সভ্যতার সকল অঙ্গে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বেস্তাবৃষ্টি অবলম্বন না করিলে কেহ এই সকল গুণ অর্জন করিতে পারিত না। এই তথ্য হইতেই আধুনিক সমাজে নারীর দুর্গতি বুঝিতে হইবে। সেখানে নারীর অপেক্ষা বেস্তাবৃষ্টিই ছিল উচ্চদরের বস্তু।

আথেলের পারিবারিক প্রথাই পরবর্তীকালে যোনীর সমাজের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। গ্রীসের অন্যান্য সমাজে ক্রমে আথেলের অনুকরণ করিতে অগ্রসর হয়। অন্তর মংলের বিধান, অস্ত্রপুত্র, অবরোধ ইত্যাদি এই পারিবারিক প্রথার আসল কথা।

কিন্তু গ্রীক নারীদিগকে সর্ব্বদাই পাহারা দিয়া অস্ত্র-মংলে রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল কি? কখনই না। স্বামীদিগকে

৮৪. পরিবার, পোজী ও রাষ্ট্র

ঠকাইবার বিভার তাহারা পাকিয়া উঠিয়াছিল। ঠকাইবার স্বযোগও জুটিত অনেক। পুরুষেরা “হেতেরেদের” সঙ্গে প্রেমে মজিত। মেয়েরা সতী সাজিয়া গৃহধর্ম রক্ষা করিত না।

প্রাচীন ছনিয়ার সভ্যতায়, প্রাচীন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষশীল দেশে একপতি-(পত্নী)-ষের জন্মকথা এই। ব্যক্তিগত প্রেম, কোনো পুরুষের প্রতি নারীর টান অথবা নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা—ইত্যাদি বলিলে বর্তমান যুগে যাহা কিছু বুঝায় এখানে তাহার নামগন্ধও নাই। বরং উন্টা বলিলেই ঠিক বুঝা যাইবে।

সাবেক কালে অর্থাৎ “উৎকর্ষের” যুগের পূর্বে নর-নারীর মিলনে অন্ততঃ পক্ষে একটা স্বাভাবিক যোগাযোগ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। আবার যোনি-সম্ভোগের আমলে যে যাহাকে চায় সে তাহাকে সহজেই পাইত এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন নয়। কিন্তু এই প্রকৃতি-মূলত স্বাভাবিক মেলামেশা “বার্কার” যুগের শেষে লোপ পাইয়াছে। উৎকর্ষের আমলে যে যোনি-সংস্রবের ব্যবস্থা কয়েম হইয়াছে তাহাতেই মানুষ সর্বপ্রথম স্বাভাবিক টানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কৃত্রিম বন্ধনের আয়োজন করিয়াছে। সেই কৃত্রিম সঙ্কল্প উৎপন্ন হইয়াছে ধন-দৌলত বা সম্পত্তি ভোগের তরক হইতে। একপতি-(পত্নী)-ষের বিধানে পারিবারিক প্রথা আর্থিক টানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার মাজাতার আমলের প্রাকৃতিক যৌথ-সম্পত্তির পরাজয় ঘোষিত হইতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নিজস্বজ্ঞান, স্বাধীন ইত্যাদির ধারণার বিজয়-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবাধ-যোনি-সংসর্গের এবং স্বাধীন প্রেমের ঠাইয়ে একপতি-(পত্নী)-ষ

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ৮৫

এবং তাহার জড়িত নারীর গোলামী ও হুগতি উৎপন্ন হইয়াছে।

গ্রীকরা ধোলাখুলি বলিত :—“পূজার্নে ক্রিয়তে সার্থ্য।” পরিবারের কর্তা পুরুষ। সন্তান-সন্ততির বাপের বংশ রক্ষা করিবে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে—ইহাই বিবাহের লক্ষ্য। এই বুঝিয়াই পারিবারিক প্রথা কয়েক দশক ধরে। অধিকন্তু গ্রীক চিন্তায় বিবাহ, পারিবারিক জীবন, একপতি- (পত্নী) স্ব-সবই দেবতার প্রতি কর্তব্য পালনের—“দেব-ঋণের” সামিল ছিল।—দেব-ঋণ মাত্র নয় এ একটা রাষ্ট্র-ঋণ (দেশ-ঋণ) এবং পিতৃ-ঋণও—বিবেচিত হইত। এই কর্তব্য-পালন অথবা ঋণ-শোধ না করিয়া কোনো গ্রীক স্বোন্নতি পাইত না। আবেশে বিবাহ করা আইনের বিধান ছিল—অর্থাৎ বিবাহ না করিলে শাস্তা হইত। অধিকন্তু সন্তান পয়সা করাও মাতৃয়ের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আইনে পরিগণিত হইয়াছিল।

বারাক্‌নার উৎপত্তি

একপতি-পত্নী-দ্বকে স্ত্রীপুরুষের একটা আপোষ বিবেচনা করা চলে না। ইহাকে বিবাহ-পদ্ধতির উচ্চতম রূপ বলিয়া গণ্য করাও সম্ভব নয়। বরং উল্টাই ঠিক। পুরুষ-নারীর লড়াই স্বত্ব হইয়াছে এই ব্যবস্থায়। নারীর গোলামী ত ঘটিয়াছেই।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মার্কসের সঙ্গে একত্রে আমি একটা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটায় নিম্নলিখিত মত প্রচাৰিত হইয়াছে,—“জগতে সর্ব প্রথম জন্ম বিভাগ দেখা দিয়াছিল স্ত্রী-পুরুষের সন্তানের জন্ম ও পালন লইয়া।” আজ তাহার ক্ষে

ছুটিয়া দিতেছি :—“অগতে শ্রেণীগত লড়াইয়ের প্রথম ঘটনা ঘটয়াছিল একপতি-পত্নী-দ্বয়ের পারিবারিক কেন্দ্রে,—পুরুষ-স্ত্রীর মধ্যে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারই প্রথম শ্রেণীগত নির্ধাতন।” হুনিয়ার ইতিহাসে একপতি-পত্নী-এক এক বিপুল উন্নতি দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব-সমাজে প্রত্যেক ইন্টারকাল সজে সজে কতগুলো কু আসিয়া ছুটিয়াছে। আজ পর্যন্ত একপতি-পত্নী-দ্বয়ের কু-কু এক সজে চলিতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং গোলামী এই দুই প্রথা বাদ দিয়া উৎকর্ষের যুগের বিবাহ-পদ্ধতি বিকশিত হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক স্তর-পরম্পরাগুলির দিকে নজর দিলে মাহুদের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতির ভিতর দলাদলি, ঘন্থ এবং সংগ্রাম সর্বদাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

জোড়-পরিবার এবং একপতি-পত্নী-এক অগতে দেখা দিবার পর মাহাত্ম্যের আমলের অবোধ-ঘোনি-সংসর্গ মানব-সমাজ হইতে এক-দম উঠিয়া গিয়াছে কি ? না। মর্গ্যান বলেন :—“সেই অবোধ-ঘোনি-সংসর্গ এখনো চলিতেছে। “পুণালুয়া” মতের পরিবার আর নাই বটে। কিন্তু আধুনিক পরিবারকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে “হেভেরে” প্রথা।”

“হেভেরে” প্রথা সম্বন্ধে মর্গ্যান এক বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একপতি-পত্নী-দ্বয়ের প্রথার আমীর নিজে নিজ পরিবারের বাহিরের কুমারী ভোগ করিতে অত্যাচার। এই কুমারীরা “হেভেরে।” খাঁটি বেড়া বলিলে বাহা বুঝায় “হেভেরে” ঠিক ভাষা নয়। তবে “হেভেরে” হইতে বেড়াবৃত্তির উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিমাণ ৮৭

মর্যাদার মতে “হেতেরে” প্রথা সাবেক কালের দলপত্নী বিবাহের অর্থাৎ বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-পতিত্বের শেষ চিহ্ন। অবাধ-যোনি-সন্তোষের উপর নিষেধ জারি হইবার সময় সমাজের স্বতিকায়ে প্রাচীন বা সনাতন ধর্মকে একদম তুলিয়া দিতে সাহসী হয় নাই। তাহার। “ন দোষো অমুক বয়সে,” অথবা “ন দোষো অমুক স্থানে”. ইত্যাদি ব্যতিরেকের বিধান করিয়াছিলেন।

দেবতার মন্দিরগুলি ছিল সেই সব ব্যতিরেকের কেন্দ্র। অর্থাৎ দেব-সেবার উপলক্ষ্যে দেব-গৃহের চৌহদ্দির ভিতর নারীরা অবাধ-সন্তোষের অধিকার পাইত। পুরুষেরা কুমারীদিগকে ভোগ করিবার অঙ্গ দক্ষিণা দিত। সেই দক্ষিণা মন্দিরের তহবিলে মোহান্তের জিম্মায় থাকিত। মন্দিরগুলি—দেবতার হানই জগতের সর্ব-প্রথম এবং সর্ব-প্রাচীন বেঙ্গালয়।

আর্মেনিয়া দেশের আনাইতিস্ দেবতার “হিরোছুলে” দাসীরা জগতের সর্ব-প্রথম বেঙ্গা। এই প্রেণীরই অন্তর্গত কোরিথের আক্রোদিতে-দেবীর দাসীগণ। ভারতীয় মন্দিরে “বায়াদেরে”ও সেই আদিম বেঙ্গা-প্রেণীরই বংশধর। পূর্ব দিক ভাষায় “বায়াদেরে” শব্দের অর্থ নর্ত্তকী।

এই ধরণের “দেবদাসী” হওয়া প্রথম প্রথম সকল নারীরই স্বধর্ম বিবেচিত হইত। পরে মন্দিরের পূজারিণীরা স্বধর্ম পালনে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। ইহারা “বধা নাম গোত্র” হিসাবে হুনিয়ার নারী-জাতির প্রতিনিধি রূপে দেবালয়ের আওতায় বেঙ্গা-বৃত্তি চালাইয়া থাকে।

অস্তিত্ব সমাজে বিবাহের পূর্বে কুমারীরা “হেতেরে” বৃত্তি

৮৮ পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অবলম্বন করে। এও সেই দলগত বিবাহ পদ্ধতিরই জের। তবে বিকাশটা অল্প পথে। অবাধ-বোনি-সন্তোষ রকমারি রূপে জগতে টিকিয়া রহিয়াছে।

“বার্কার” যুগের শেষ অবস্থায় মজুরী-প্রথা দেখা দেয়। অর্থাৎ বেতন দিয়া স্বাধীন শ্রমজীবী খাটানো হইত। তখন এক সঙ্গে গোলামী এবং স্বাধীন মজুরী—দুই-ই সমাজে প্রচলিত ছিল। ঠিক এই দুই শ্রেণীর পুরুষের অল্পরূপ দুই শ্রেণীর নারীও দেখা দেয়। গোলাম নারীকে কর্তারা বিনা আপত্তি ওজরে ভোগ করিতে অধিকারী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাজারের বেস্তা নামক নারীর উৎপত্তি হয়। তাহারা বেতন-ভোগী মজুরদের মত দেহ বিক্রী করিয়া অল্প সংস্থান করিত। উৎকর্ষের যুগের সম-সম কালে দেহ-বিক্রেতা নারী-সমাজের,— অর্থাৎ “হেভেরে”—প্রথার এক নবীন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

“উৎকর্ষ” বস্তুটা একটানা সোজা সবল রেখায় উন্নতির বিস্তার নয়। এ এক জটিলতাময় ঘন-ভরা ছুমুখো ধরণের জীবন বিকাশ। যে যুহুর্ন্তে এক-পতি-পত্নী-দ্বয়ের জন্ম সেই যুহুর্ন্তেই “হেভেরে” এবং তাহার চরম পরিণতি বেস্তাবৃত্তি জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব-সভ্যতার অস্তান্ত প্রতিষ্ঠানের মতন “হেভেরে”—প্রথা এবং বেস্তাবৃত্তিও সমাজেরই এক সনাতন “আবিষ্কার”। মাহুঘেরা মাহুতাতার আমলের অবাধ-বোনি-সন্তোষ এক ছুয়ারে বন্ধ করিয়া সেইটাই আর এক ছুয়ারে খুলিয়া দিয়াছে।

“হেভেরে”-মি বা-বেস্তাগিরি আজকাল মুখে মুখে সকলেই নিন্দা করে বটে কিন্তু পুরুষেরা সকলেই ইহা গহন করে,

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিমাণ ৮৯

বিশেষতঃ পরমাওয়ালারা। বিপদে পড়িয়াছে মাত্র নারীরা। কলঙ্কের বোল আনা ইহারা ভোগ করিতে বাধ্য। ইহাদের কলঙ্কের জন্ত পুরুষেরা ত দায়ী বটেই কিন্তু সে কথা মনে না রাখিয়া ইহারা বেড়াকে সমাজে একঘরে করিয়া রাখিয়াছে। নারীর উপর পুরুষের এ এক বিচিত্র জুলুম। একমাত্র “উৎকর্ষের” যুগেই এই জুলুম সম্ভবপর হইয়াছে।

একপতি-পত্নী-জ্বের ব্যবস্থায় এই গোল এক সামাজিক স্বন্দ বা বিরোধ। আর এক বিচিত্র স্বন্দ এই ধরণের পারিবারিক কেন্দ্রে জমিয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাতার আমলে সেই সামাজিক বিরোধ দেখা যাইত না। “উৎকর্ষের” যুগের স্বামীর বিবাহিতা পত্নীকে ঘরে রাখিয়া বাহিরে যাইয়া “হেতেরে”-গ্রেমে মজিতেন। সেই সুযোগে পত্নীরা পরপুরুষের সঙ্গে গুপ্ত গ্রেমে লিপ্ত হইত। প্রায় পরিবারেই এইরূপে নারীর কম পক্ষে একজন করিয়া “বাধা প্রেমভাজন অতিথি” দেখা যায়।

পরপুরুষে আসক্তি বর্তমান নারীর এক স্বধর্ম। ইহা নিকনীয় বটে এবং চরম মাত্রায় নিম্নিত হয়ও বটে। কিন্তু এক-পত্নী-পত্নী-স্ব এবং “হেতেরে”-প্রথা যেমন “উৎকর্ষের” যুগের “সভ্য” মানবের আবিষ্কার, পরপুরুষের প্রেমও সেইরূপ বর্তমান জগতের এক সুপ্রচলিত প্রতিষ্ঠান। এই তিনই পরস্পর সম্বন্ধ। একটার সঙ্গে আর একটা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাজেই জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্তমান “সভ্য” সমাজে সত্যানের “জনক” সম্বন্ধে কোনো কথা জোর করিয়া বলা যায় কি? না। জননী সম্বন্ধে মাদ্রাতার আমলে যেমন আজও তেমন কোনো সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জনক কে? মাদ্রাতার আমলের লোক

গোটা-গোটা বলিড—“জানি না।” কিন্তু “উৎকর্ষের” যুগে
যাহুব চোখ খুলিয়া কথা বলিতে প্রস্তুত নয়। সে একটা
“রকা” করিয়াছে।

রকাটা দেখিতে পাই করানী আইন “কোড নেপোলিয়নে।”
এই বিরাট স্বাভি-গ্রন্থের ৩১২ নং ধারায় প্রচাৰিত হইয়াছে :—
“বিবাহিত অবস্থায় নারীর গর্ভে সন্তান হইলে তাহার জনক
বিবেচিত হইবে নারীর স্বামী।” তিন হাজার বৎসর ধরিয়া
ছনিয়ার এক-পতি-পত্নী-ত্ব চলিতেছে। তাহার চরম আবিষ্কারই
এই। অর্থাৎ পরিবারের ভিতরেই “হেতেরে”মি এবং বেস্তাবুতি
চলিতেছে। সেই দিকে চোখ বুজিয়া থাকাই সভ্যতার লক্ষণ
এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

সভ্যতার যুগে গোটা সমাজে সে সকল বস্তু চলিতেছে তাহার
সকলগুলিই এক-পতি-পত্নী-ত্বের পারিবারিক কেন্দ্রে মজুত।
শ্রেণীগত লড়াই, মনিব-গোলামের লড়াই, সতী-বেস্তা বিরোধ,
স্ব-কু-সবই পরিবারের ভিতর একসঙ্গে চলিতেছে। নারীকে
বাঁধী করিয়া পুরুষ মানব-সমাজকে বেশী কিছু উন্নত করিয়া
ভুলিতে পারিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে না।

রোমাণ ও জার্মান

এতকণ গ্রীক-সমাজের কথা বলা হইতেছিল। কিন্তু গ্রীক
জাতির পারিবারিক প্রথা, কড়াকড় ভাবে অগভীর সর্বত্র প্রকটিত
হয় নাই। রোমের কথা ধরা যাউক। রোমানরা গ্রীকদের যতন
স্ব-যাজিত জাতি ছিল না বটে। কিন্তু বিধ-বিজয়ের ৩৭ লাখ
করায় তাহাদের চিন্তায় দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণতার অভাব ছিল না।

মেয়েদের উপর জীবন-মরণের অধিকার পুরুষেরা ভোগ করিত। পরপুরুষে আসক্তি নিবারণ করিবার জন্ত তাহারা নারীগণকে এই উপায়ে শাসন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু অপর দিকে মেয়েরা পুরুষের মতনই স্বৈচ্ছায় বিবাহ রহ করিতে অধিকারী ছিল। কাজেই রোমান সমাজে নারীর ইচ্ছা গ্রীক সমাজ অপেক্ষা বেশী থাকিবারই কথা।

প্রাচীন জার্মাণেরা যখন ইতিহাসে দেখা দেয় তখন তাহারা পুরাপুরি এক-পতি-পত্নী-স্ব গ্রহণ করে নাই। তখনও তাহাদের সমাজে জোড়-পরিবার চলিতেছিল। ল্যাটিন ঐতিহাসিক তাসিটুসের বিবরণে এই সম্বন্ধে তিনটা তথ্য জানা গিয়াছে। প্রথমতঃ জার্মাণেরা একটা স্ত্রী লইয়াই সম্বন্ধে থাকিত এবং স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাহাদের নজরও তীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু হোমড়া চোবড়া জন-নায়েক-গণ বহু-পত্নীকতা ভোগ করিত। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজের জোড়-পরিবার প্রথাও এইরূপ দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—জননী-বিধি তখন উঠিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পুরুষের আমল, বাপের নামে বংশ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি তখনও সমাজে বেশী দিনকার জিনিষ নয়। কার্ল মারের তাইকে—মায়াকে জার্মাণেরা তখনকার দিনে এমনকি বাপের চেয়েও বেশী আত্মীয়ই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিল। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজেও এই রীতি। বস্তুতঃ, কার্ল মার্কস্ ইণ্ডিয়ান প্রথা দেখিয়াই প্রাচীন জার্মাণ সভ্যতার চাবী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন।

তৃতীয়তঃ—জার্মাণ নারীরা যাদুশরনাই সম্মানিত হইত।

জনসাধারণের কাজকর্মে তাহাদের হাত ছিল। পুরুষের প্রাধান্য নিয়ন্ত্রিত একপতি-পত্নী-ষের ব্যবস্থায় এইরূপ সম্ভব নয়।

সকল তরফ হইতেই জার্মানদিগকে স্পার্টার তৈরীর সমাজের ছুড়িয়ার বিবেচনা করা চলে। স্পার্টার সমাজও জোড়-পরিবারের স্তর ছাড়াইয়া বেশী দূর উঠে নাই। কাজেই জার্মানরা মানব-সমাজে দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসে একদম একটা “নতুন কিছু” প্রবর্তিত হইতে থাকে।

রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতির ভিতর মিশিয়া জার্মানরা একপতি-পত্নী-ষের ব্যবস্থাকে ধানিকটা মোলায়েম করিয়া তুলিল। নারীর ইচ্ছা তাহার প্রভাবে ধানিকটা অন্ততঃ পক্ষে বাঁচিয়া গিয়াছে। আথেন্সে রোমে নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে নাই সেই স্বাধীনতার বিকাশ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর জার্মান আওতায় ঘটিয়াছে। এই যুগেই প্রথম বর্তমান জগৎ জ্বলন্ত “ব্যক্তিগত প্রেম” মানব-সমাজে প্রকটিত হয়।

জার্মান প্রভাবে নারীর দুর্গতি কিছু কমিয়াছে এবং ব্যক্তিগত ভালবাসার যুগ দেখা দিয়াছে। এই কথাটির অর্থ ইহা নহে যে, জার্মান চরিত্রে কতকগুলি তথ্য-কথিত সঙ্গুণ ছিল। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জার্মানরা তখনও একপতি-পত্নী-ষে অভ্যস্ত হয় নাই। জোড়-পরিবারের ব্যবস্থায় যতখানি অবাধ-বোনি-সভোগের সুযোগ থাকে তাহার ফলে নারীর স্বাধীনতা কতকিঞ্চি বাঁচিয়া যায়। জোড়-পরিবারের স্বভাবগুলি রোমান বিধানের সমাজে মিশিবার ফলে নারীর ইচ্ছা কিছু কিছু বাঁচিয়া গিয়াছে।

কক্সসাগরের দিকে যে সকল জার্মান নরনারী বসি গাড়িতে-

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিমাণ ২৩

ছিল তাহাদের সমাজে এই বিকাশ দেখা যায় না। তাহদের “টোপ” নামক লম্বা ঘাস-বহুল ময়দানে ঘোড়সওয়ারি করিতে করিতে সেখানকার অধিবাসীদের কতকগুলি কু-স্বভাব গ্রহণ করিয়াছিল। থাইকালি জাতি সম্বন্ধে আমিয়ারুব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রোকোপের মতে হেকলি জাতিও এইরূপ ছিল।

ব্যক্তিগত ভালবাসা একপতি-পত্নী-দ্বয়ের ব্যবস্থায় গড়িতে পাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পুরুষ নারী উভয় পক্ষের পরস্পর প্রেমের ফলে এই পারিবারিক প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে এ কথা সত্য নহে। বরং ঠিক উল্টা। সমানে সমানে ভালবাসা এই ব্যবস্থায় বাধাই পড়িয়াছে বলিতে হইবে।

জগতের সকল দেশেই আমীর-ওমরাহ ইত্যাদি সম্রাট ও ভদ্র সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা পুরুষ এবং নারী আপসে আপ করে না। বাপ-মারা এই বিষয়ে অধিকারী। জোড়-পরিবারের আমলে যে নীতি ছিল পুরুষ-প্রধান একপতি-পত্নী-দ্বয়ের আমলেও সেই নীতিই চলিয়াছে।

খাটি ব্যক্তিগত ভালবাসা অর্থাৎ পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের যৌনিগত টান বর্তমান জগতে দেখিতে পাই কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে? মধ্যযুগের যোদ্ধা, বীর এবং “কজ্রিয়” সমাজে। কিন্তু ইহাদের ভালবাসা বিবাহিত প্রেম নয়। বিবাহিত প্রেমের ব্যতিরেকই ছিল সেই সমাজের প্রচলিত ব্যক্তিগত টান।

ক্রান্তের দক্ষিণ পূব অঞ্চলের প্রোডজাল সমাজ মধ্যযুগের ইয়োৰোপীয় সভ্যতার বিশেষ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ব্যক্তিগত

শ্রেমের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। পর-পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর পিরীত ছাড়া সেই শ্রেমটা আর কিছুই নয়। কবিতা সেই “পরদার গমন” আর পর-পুরুষে আসক্তিই উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন। “পরকীয়া”দের কীর্তিই সেই সাহিত্যের রস।

সেকালের কবিদিগকে “আল্‌বা” বলিত। কজ্জি-বীর রাজিকালে একজন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে প্রেম করিতেছেন। বাহিরে চৌকিদার সকাল হয় হয় সময়ে তাঁহাকে আগাইয়া দিতেছে। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে বীর পলাইয়া যাইতেছেন! ছাড়াছাড়ির সময়টা অতি বিবাদাস্থক এই ছিল “আল্‌বা” পদাবলীর “মুদ্দা”।

উত্তর ক্রান্তের কবিতা এবং জার্মানির গায়করাও এই ধৃষা লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের তিনটা গান—ষড়িও দিনের বেলার জন্ত রচিত—এশেনবাথের গ্রন্থাবলীর ভিতর পাই। তিনি তিনটা বড় বড় জার্মান কাব্যগাথা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আল্‌বা-পদ্য গানগুলিই সরেস!

পুরুষ-নারীর অসাম্য

আজকালকার দিনে ইয়োরোপে দুই রীতির বিবাহ চলিতেছে। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী সমাজে বাপ-মারাই ছেলের জন্ত ক’নে চুঁড়িয়া আনে। কল দাঁড়ায়, স্বামী হয় “হেতেরে”—ভক্ত আর স্ত্রী হয় অম্বরক্ত পরপুরুষে। ক্যাথলিক ধর্মের বিধানে বিবাহ রদ করা সম্ভব নয়। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ধর্মের কর্তাদের বিবেচনায় মৃত্যু হইতে মানুষকে বাঁচান যেমন অসম্ভব সেইরূপ বেস্তাসক্তি, পরপুরুষে আসক্তি অথবা পরস্ত্রী-

এক-পড়ি (পড়া) স্ব-মূলক পরিমাণ ২৫

গমন হইতেও নর-নারীকে আটকাইয়া রাখা অসাধ্য ; কাজেই “জাইভোস” যত্ন না করিলেও লোকসান নাই ।

ধর্মসংস্কারের কলে কোন কোন ইয়োয়োপীয় সমাজে—অর্থাৎ প্রটেস্টান্ট মতের খুঁটান সমাজে তত্র যবের ছেলেরা খানিকটা স্বাধীনভাবে পাত্রী গছন্দ করিবার সুযোগ পায় । কাজেই কিছু কিছু ব্যক্তিগত ভালবাসা এই সমাজে প্রচলিত আছে এ কথা অস্বীকার যায় না । কিন্তু আসল ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক, পুরুষ এবং স্ত্রী লম্বা গলা করিয়া এই কথা সমাজে রটাইতে অভ্যস্ত । প্রটেস্টান্টরা স্বভাবতই মিথ্যা প্রিয় এবং ভণ্ডামির অবতার ।

যাহা হউক প্রটেস্টান্ট সমাজে এই কারণে “হেতেরে” প্রথার রেওয়াজ কিছু কম । বিবাহিতা নারীরাও পরপুরুষে আনক্ত হয় কিছু কম । কিন্তু হাজার হইলেও বিবাহের কলে মানুষের চরিত্র ত একদম বদলাইতে পারে না । বিবাহের পূর্বে যুব-যুবতীরা যে রূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহার জের দেখা দেয়ই দেয় । তথাকথিত বিবাহিত জীবনের “স্বর্গ সুখ” যে কি অপ্রিয় বস্তু তাহা গোটা সমাজের সুখী পরিবারগুলা গুণিয়া দেখিলে স্পষ্টাঙ্গাষ্ট্রি বুঝা যায় ।

ক্যাথলিক বিবাহের চিত্র বৃদ্ধিতে হইলে পড়া উচিত ফরাসী উপন্যাস আর প্রটেস্টান্ট বিবাহের চিত্র দেখিতে পাই জার্মান বিশেষতঃ বালিনী উপন্যাসে । দুই শ্রেণীর উপন্যাসেই দেখা যায় যে, নায়ক নায়িকা শেষ পর্যন্ত একজন “মনের মতনকে” পাইয়াছেন । তবে এই ৫৫ টির মধ্যে কেটা মজা আছে । রহস্তটা এই যে জার্মান নায়ক পায় সাধারণতঃ একটা মনের মতন

স্বামী। কিন্তু করাসী নাথকের কপালে কুটে তাহার জীব পর-
পুরুষে আসক্তি।

সাহিত্যে এই ধরণের বাধা চরিত্র বিন্যাস দেখিয়া দুই সমাজের
যোনিগত টানাটানের কথা সহজেই ধরিতে পারা যায়। জার্মান
ভাণ্ডেরা করাসী উপন্যাসকে নীতিহীন অশ্লীল ইত্যাদি বলিয়া
পালাপালি করে। এদিকে জার্মান কাহিনীগুলো করাসী চিন্তার
অপাঠ্য। বার্মিনের সাহিত্যে “হেতেরে” প্রথা এবং পরপুরুষে
আসক্তি ও “পরদার-গমন” এক দম আটপোরে কথার ঝাড়াইয়া
গিয়াছিল। আজকাল লেখকদের এট ঝোঁকটা কিছু কমিয়াছে।

কি ক্যাথলিক কি প্রটেস্ট্যান্ট দুই প্রথায়েই বিবাহ অহুষ্ঠিত
হয় সামাজিক লোকাচার এবং রীতিনীতি মার্কিন। নিজ নিজ
পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের আদর্শ মার্কিন যাহা কিছু ভাল মন্দ
সেই বিচারই থাকে মাপকাঠি। কলে দেখা যায় পুরুষ এবং স্ত্রী
উভয়েরই ব্যভিচার। হৃদয়ের ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক,—
স্ত্রী স্বামীর এবং বিশেষ ভাবে স্বামী স্ত্রীর উপর ভোগসত্ত্ব দাবী
করে। স্ত্রী বাজারের বেশা হইতে এই কারণে মাত্র বিভিন্ন যে,
তাহাকে ঘন্টা হিসাবে টাকার জন্য দেহ বিক্রয় করিতে হয় না,
সে চিরকালের জন্যই স্বামীর নিকট নিজকে বিকাইয়া দিয়াছে।

এই গেল পরসাপালা সম্পত্তিশালী ভ্রম সমাজের কথা।
নিঃস্ব দরিদ্র সম্পত্তিহীনদের সমাজে যোনিভোগ সম্বন্ধে এই
ধরণের বাধ্য-বাধকতা তত বেশী নাই। ব্যক্তিগত যোনির টান
বর্তমান জগতে যদি কোথাও থাকে তাহা কেবল গরীব নর-
নারীর ভিতরই আছে। তবে আইনের হিসাবে এই সকল
যোনি-সংস্রব বিধি-সম্বত কি না সে কথা স্বতন্ত্র।

নিধন সমাজে যোনি-গত স্বাধীনতার উৎপত্তি হইল কোথা হইতে ? ইহাদের ভিতর সম্পত্তি, ধনদৌলত, পুঁজি ইত্যাদি নাই বলিয়া। এই সব রক্ষা করিবার জন্তই জগতে পুরুষ-বিধি এবং একপতি-পত্নী-স্ব দেখা দিয়াছিল। এইগুলি যেখানে নাই অথবা যেখানে এ সবে প্রভাব কম সেখানে পুরুষের অত্যাচার, নারীর দুর্গতি এবং যোনি-সংসর্গে বিধি-নিষেধের প্রকোপও নাই অথবা কম।

অধিকন্তু বর্তমান জগতে ফ্যাক্টরি-শিল্পের প্রভাবে মেয়েরা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কাজকর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই ঘরের মমতা, বাস্তব-ভিত্তির আধিপত্য, পুরুষের প্রতাপ এবং একপতি-পত্নী-স্বও মজুর মহলে গজিতে পারে নাই।

কাজেই দেখিতে পাঠ, “পর-দার-গমন” এবং পর-পুরুষে আসক্তি নামক তথ্য নিধন সমাজে বিরল। সম্পত্তিহীন নর-নারীরা যথাসম্ভব আপসে আপ্ স্বাধীনভাবে অবাধ-যোনি-সংসর্গের নিয়ম পালন করিয়া চলিতেছে। ইহাদের বিবাহ ভাঙা অতি সহজেই সাধিত হয়। নারীর পক্ষেও ইচ্ছা-স্বাধীনতা কঠিন নয়।

আজকালকার আইনে নারীকে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক বিবাহেই বরকন্যা উভয়পক্ষেরই স্বাধীন পছন্দ আবশ্যক। তাহা ছাড়া বিবাহিত জীবনেও স্ত্রী-স্বামীর দায়িত্ব এবং অধিকার সমান। এই সকল কথা বর্তমান জগতের সকল আইনেই স্পষ্ট দেখা যায়।

কিন্তু এই ধরনের আইন থাকা স্বত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছে কি ? মজুর জীবনের

কথাগুলি আলোচনা করিলে বিষয়টা শট হইবে। আইনকারকেরা বলেন,—মজুরেরা স্বাধীনভাবে মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করিতে অধিকারী। কাগজে কলমে কর্মদাতা আর কর্মী স্ব স্ব প্রধান সম্বন্ধে নাই। আইনের হিসাবে এই যে স্বাধীনতা দেখা যাইতেছে আর্থিক হিসাবে সেই স্বাধীনতা আছে কি? কখনই না। পুঞ্জিजीवि এবং অন্নদাতার সঙ্গে শ্রমजीবি খোলা বাজারে দর কষকষি করিয়া নিজের ইচ্ছা রক্ষা করিতে কোনো মতেই সমর্থ হয় না। পেটের দায়ে মজুরেরা ধনপতিদিগের গোলামী করিতে বাধ্য।

ঠিক এই ধরণের গোলামীই বিবাহের বাজারে চলিতেছে। আইনে যাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ প্রথম স্বীকার্য প্রকৃত বাস্তব জীবনে তাহার টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ধরা যাউক যেন, আইন অনুসারে পাত্র এবং পাত্রী স্বাধীনতম রূপেই নিজ বিবাহের ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। কিন্তু আর্থিক অবস্থাগুলো কিরূপ? একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিব যে, বিবাহ বিবয়ক তথাকথিত স্বাধীনতার কিম্বৎ একদামড়িও নয়।

জার্মানিতে এবং ফ্রান্সে সম্মানসম্মতির জন্মের অধিকারেই কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে এই ধনে বঞ্চিত করিবার কোনো আইন নাই। বেশ কথা। জার্মান এবং ফরাসী সমাজে বিবাহ অস্বস্তিত হয় কিরূপে? আইন বলিতেছে—“বর এবং কন্যা পরস্পর নিজের মত হইলেই বিবাহস্বত্রে আবদ্ধ হইবে।” কিন্তু বাপমার পছন্দ না হইলে তাহারা নিজের খেয়াল বজায় রাখিতে পারে কি? কোনো মতেই না। তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তি

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ৯৯

হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। কাজেই বাপ-মার ইচ্ছা, আজ্ঞা, অনুমতিই শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী এবং জার্মান সমাজে বিবাহ নিয়ন্ত্রিত করে।

ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায় কি দেখিতে পাই ? এই দুই দেশে ছেলেমেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে বাপমার মতের বা ইচ্ছার অপেক্ষা করিতে হয় না। কাজেই বিবাহ আইনতঃ স্বাধীন। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বাছাই করাও বাপমার পক্ষে স্বাধীন অধিকার। ছেলেমেয়েরা বিগড়াইয়া যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিলে বাপমারাও যে কোনো লোককে ধনদৌলত দিয়া দিতে পারে।

“তোজা পুত্র” সর্বত্রই দেখিতেছি। যেখানেই ধনদৌলত, সম্পত্তি, পুঞ্জি, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সেখানেই বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র। অর্থাৎ নিজের পছন্দসই স্ত্রীভোগ করা এবং নিজের পছন্দসই স্বামীভোগ করা ধনদৌলতের বর্তমান আইনে কোনো পুরুষ-নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

বিনাহের স্বাধীনতাটাই একমাত্র “ভূয়ো” জিনিষ নয়। বর্তমান জগতের আইনে নাকি পুরুষকে নারীর সমানই অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বেশী কিছু দেওয়া হয় নাই। পুরুষ-নারীর এই তথাকথিত সাম্যটাও আর এক ভূয়োমাল। আজ কালকার আইনে নারী কোনো মতেই পুরুষের সমান নয়।

এই অসাম্য একদিনের সৃষ্টি নয়। যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুরুষ-নারীর অসাম্য চলিতেছে। আর্থিক হিসাবে নারী যে দিন হইতে পুরুষের তাঁবে আসিয়াছে সেই দিন হইতে সমাজে এবং রাষ্ট্রে

নারীকে পুরুষের অপেক্ষা হীন অবস্থায় থাকিতে হইতেছে। আইনের অসাম্য আর্থিক দুর্গতির ফল।

মান্বাতার আমলের জাতিগত যৌথ জীবনে পুরুষরা আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিত, আর মেয়েরা লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার জিন্মায় থাকিত। আহাৰ্য্য সংগ্রহ করা আর গণ্ডা গণ্ডা লোকের খাওয়াদাওয়ার জিন্মায় থাকা দুই-ই সমান দরের সরকারী বা সামাজিক কাজ বিবেচিত হইত। নারীর কাজ কোন অংশেই হীন বিবেচিত হইত না। এই সব গোটা জাতির পক্ষে বিশেষ দরকারীই ছিল।

কিন্তু পরবর্ত্তী সমাজ বন্ধনের যুগে সেই সাম্য উঠিয়া গিয়াছে। ঘরবাড়ীর তদ্বীর, খাওয়াদাওয়ার জিন্মায় থাকা ইত্যাদি কাজ একপতি-পত্নী-দ্বের যুগে আর দেশের কাজ, জাতির কাজ, সমাজের কাজ ইত্যাদির মধ্যনা পায় না। এইগুলি একটা পরিবারগত গতর-খাটা কাজ মাত্র। সামাজিক হিসাবে এই সবের দাম নাই। এ দিকে খাঁটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা দলগত কাজে নারীর কোনো ঠাই-ই নাই। নারী ব্যক্তিগত পরিবারের দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। পারিবারিক কাজে আর সামাজিক কাজে প্রভেদ একপতি-পত্নী-দ্বের এক মন্ত লক্ষণ।

তবে বর্ত্তমান যুগেও নারী সামাজিক কাজ হইতে একদম বঞ্চিত হয় নাই। সে ক্যাক্টরির মজুর মহলে। যে সকল নারী ক্যাক্টরিতে মজুরি করে তাহারা সেই সাবেক কালের মতন অনেকটা 'দেশের কাজই' করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু তখন আবার তাহাদিগকে পারিবারিক জীব বলা চলে না। অর্থাৎ যদি তাহারা পরিবারের স্বধর্ম পালন করিতে ইচ্ছা করে তাহা

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১০১

হইলে তাহারা কারখানায় নকরি পায় না। আবার কারখানায় নকরি করিতে হইলে পারিবারিক জীবনে ইত্যাফা দিতে হইবে। কারখানায় এবং পরিবারে বিরোধ বর্তমান জগতের এক বড় কথা।

শিল্প কারখানার মতন ব্যাঙ্ক, আফিস, ব্যবসায় সম্বন্ধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোও পরিবারের বিরোধী। অর্থাৎ যে সকল নারী ব্যাঙ্কের কেরাণী অথবা আদালতের উকীল তাহারা পরিবারের স্বার্থ পালন করিতে বঞ্চিত হয়। তাহারাও মজুর-নারীদের মতন কতকটা মাস্কাতার আমলের সামাজিক কাজই করিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরিবার নামক কেন্দ্রের অধিকারে বঞ্চিত হইতে বাধ্য।

দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে মজুর-নারী, মেয়ে-উকিল, স্ত্রী-চিকিৎসক, নারী-কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর মেয়েরা আর্থিক হিসাবে স্বাধীন কিন্তু একপতি-পত্নী-স্ব নামক বন্ধ ইহাদের জীবনে একপ্রকার জুটে না।

একপতি-পত্নী-স্বের ব্যবস্থা নারীর অবস্থা মজুর-নারী ইত্যাদি স্বাধীন মেয়েদের উল্টা। এই কেন্দ্রে স্বামী উপার্জন করিয়া স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করে। “ভর্তা” “ভাৰ্খা”র সম্বন্ধই পরিবারের গোড়ার কথা। অর্থাৎ স্বামী মালিক, স্ত্রী দাসী। আজকাল-কার ফ্যাক্টরির দৃষ্টান্তে বলা যাইতে পারে যে পরিবার একটা কারখানা বিশেষ। এই কারখানায় মজুরি করে নারী আর মজুরকে নিয়োগ করে স্বামী। এই অবস্থায় বিবাহিত জীবনের আইনে পুরুষ এবং স্বামীর সমান অধিকার এই কথা প্রচার করিয়া কি হল? আইন যাহাই বলুক না কেন, আর্থিক হিসাবে নারী পুরুষের গোলাম হইয়া রহিয়াছে।

নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হইল, এ কথা বলা সম্ভব কখন? যখন নারী পুরুষের মতন জাতিগত, সামাজিক বা সরকারী সকল প্রকার কাজে স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে অধিকারী। তাহার পূর্বে নয়। কিন্তু সেইরূপ আর্থিক অবস্থায় সামাজিক জীবন কিরূপ থাকিবে? একপতি-পত্নী-ত্ব থাকিবে না। এই ধরণের পরিবার যত দিন মানব-সমাজে থাকিবে ততদিন নারী পুরুষের সমান হইতে পারিবে না। পুরুষ-নারীর সাম্য এবং একপতি-পত্নী-ত্ব পরস্পর বিরোধী।

সমাজ বিপ্লব

মাদ্ঘাতার আমল হইতে আজ পর্যন্ত ছনিয়ায় তিন প্রকার পারিবারিক প্রথা দেখা যাইতেছে। “স্রাস্ত্রোজ” বা “সহজ” যুগে দলগত বিবাহ অর্থাৎ বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-পতিত্ব ছিল পরিবারের ভিত্তি। পরবর্তী “বার্কার” বা গোড়াপত্তনের যুগে জোড় পরিবার বিকাশ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত উৎকর্ষের যুগে দেখা দিয়াছে একপতি-পত্নী-ত্ব। তবে ইহার সঙ্গে চলিতেছে পর-দার-গমন এবং পর-পুরুষে আসক্তি ও বেজ্ঞাবৃত্তি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগের সন্ধিকালে গোলাম-নারীর উপর পুরুষেরা যোনি-ভোগ দাবী করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু-পত্নীত্বও চলিয়াছে।

বিবাহ-পদ্ধতির ইতিহাসে মেহ-ভোগের ক্ষেত্রটা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। সঙ্কোচটা ঘটিয়াছে মাত্র নারীর পক্ষে, পুরুষের পক্ষে নয়। বস্তুতঃ আজকালকার দিনেও পুরুষেরা সেই মাদ্ঘাতার আমলের মতনই দলগত বিবাহ

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১০০

অর্থাৎ বহু-পত্নী-স্ব ভোগ করিয়া থাকে। নারীর পক্ষে আজ যাহা মহাপাপ বা দোষ পুরুষের পক্ষে তাহা বিন্দুল ছুঁশরীর নয়, বরং এমন কি অনেকটা বাহাদুরির কথা।

“হেতেরে”-প্রথা আজকালকার পুঁজি-পতি-শাসিত আর্থিক সভ্যতার দিনে জঘন্ত গণিকাবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। গণিকা-বৃত্তিও দিন দিন ছুনীতির চরম কোঠায় আসিয়া ঠেকিতেছে। এই গণিকাবৃত্তির প্রভাবে নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশী কলুষিত হইতেছে। যে নারী এই বৃত্তি অবলম্বন করে একমাত্র তাহারই চরিত্রহানি ঘটে। গোটা নারী জাতির তাহাতে বেশি কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজে গণিকা থাকার ফলে পুরুষ মাজই নীতি-ভ্রষ্ট হইতে থাকে।

আজকাল ইয়োরোপে বিবাহ “কথা” দিবার পর বর এবং কস্তা বহুকাল ধরিয়া বিনা বিবাহে কাটায়। এই প্রথা স্বাভাবিক পক্ষে অবিবাহিত পুরুষ-নারীকে অবাধ-মৈহিক সম্বোগের সুযোগ দেওয়া হয়। সমাজ এইরূপে একটা “হেতেরে”-মী বা কুমারীভোগের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দেশভুক্ত লোকে তাহার বিরুদ্ধে একপ্রকার কোনো প্রতিবাদ করে না।

ছুনিয়ায় একটা সমাজ-বিপ্লব আসিতেছে। তাহার ফলে একপতি-পত্নী-স্বের সঙ্গে সঙ্গে গণিকাবৃত্তির কারণস্বরূপ আর্থিক অস্থিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া যাইবে।

একপতি-পত্নী-স্ব জগতে দেখা দিয়াছিল কেন? পুরুষের হাতে ধনদৌলত পুঁজি হইবার ফলে। পুরুষ-নিজের সম্ভান-সম্মতিক্রমে বিনা সন্দেহে চিনিয়া তাহাদিগকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া দিবার জন্যই নারীকে এক-পতিস্ব-বাধ্য করিয়াছে।

ধন-দৌলতের অধিকার এবং উত্তরাধিকার চিরকাল এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে না। গোটা সমাজ, জাতি বা দেশ ধনদৌলতের অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করিয়া বসিবে। ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের হিস্তা যারপরনাই কমিতে থাকিবে। এই অবস্থায় পরিবারের রূপ বা গড়নও বদলাইতে বাধ্য।

কিন্তু একপতি-পত্নী-ত্ব বদলাইবে কি? এই বিষয়ে সন্দেহ উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলেন,—“না, বদলাইবেই যে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বরং বদলাইবে না এইরূপই বিশ্বাস পরিবার কারণ আছে। একপতি-পত্নী-ত্ব সর্বদ্বন্দ্বীত রূপেই হয়ত ফুটিয়া উঠিবে। ধনদৌলত যদি ব্যক্তির হাত হইতে গোটা দেশের হাতে সরিয়া আসে তাহা হইলে সমাজে সাহিয়ানাঙ্গীবি শ্রমবিক্ষেতা নামক কোনো শ্রেণী থাকিবে না। তাহা হইলে দেহ বিক্রয়ের জন্য নারীর দল অর্থাৎ গণিকাশ্রেণীও সমাজে দেখা যাইবে না। গণিকাবৃত্তি যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে পুরুষেরাও অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া এক-পত্নী-ত্বেই সন্তুষ্ট থাকিবে। বস্তুতঃ তাহা হইলে নারীর পক্ষে একটা মাত্র স্বামীর মতন পুরুষের পক্ষেও একটা মাত্র জীব বিধান কথাই কথা মাত্র থাকিবে না। একপতি-পত্নী-ত্ব একটা সত্যিকার বাস্তবে পরিণত হইবে।”

গোটা সমাজ যদি ধনদৌলতের অধিকারী এবং উত্তরাধিকারী বিবেচিত হইতে থাকে তাহা হইলে পুরুষের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। নারীর চরিত্র এবং কাৰ্য্যকলাপেও পরিবর্তন দেখা দিবে। পরিবার সমাজের এবং জীবনযাত্রার আধিক কেন্দ্র থাকিবে না। ঘরকরা অনেকটা সামাজিক বা সরকারী

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১০৫

অস্থিঠানে পরিণত হইবে। ছেলেপুলে মাহুয করা জনক-জননী মাত্রেয় কর্তব্য না হইয়া গোটা দেশের সমবেত ধর্মরূপে দেখা দিবে। জারজ এবং বিবাহজ উভয় প্রকার সন্তানই সমাজের পক্ষে সমান সমাদৃত হইতে থাকিবে। তাহার ফলে কোনো নারী অত্যধিক ভালবাসার প্রভাবে কোনো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে সমাজে তাহার কলঙ্ক রটিবে না।

কুমারী-ভোগ, সতীত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে মাহুযের চিন্তাপদ্ধতিতে বিপ্লব আসিবে। স্বাধ-দৈহিক-সন্তোগ আবার দেখা দিবে। গণিকাবৃত্তি উঠিয়া যাইবামাত্র মানব-সমাজের পারিবারিক জীবনে এক বিচিত্র স্বাধীনতার যুগ প্রকটিত হইবে।

যোনির টান

সেই সময়ে ব্যক্তিগত যোনির টান নামক শক্তি তাহার যথোচিত কর্মক্ষেত্র পাইবে। এই শক্তি সেই “বার্কার” যুগের অন্তিমকালে অতি সামান্তরূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু গোটা তথাকথিত একপতি-পত্নী-দ্বয়ের যুগে সেটা ধামাচাপা হইয়া লোপ হইয়াছিল। আর্থিক বিপ্লব ঘটিবার পর এই শক্তি মানব-চরিত্রকে নানা অস্থিঠান প্রতিষ্ঠানের কারণ করিয়া তুলিবে।

মধ্যযুগের পূর্বে ব্যক্তিগত দৈহিক-প্রেম ছিলই না বলা চলে। ইয়োরোপীয় সমাজের কথা বলা হইতেছে। তখনও অঙ্গ-লাবণ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ করা, ভাল লাগা ইত্যাদি প্রভাব পুরুষ-নারীর মেলামেশায় কম বিস্তর দেখা যাইত সম্ভেহ নাই। কিন্তু বর্তমান

পাশ্চাত্য মানব ব্যক্তিগত ভালবাসা বলিলে যে বস্তু বুঝে সে সাবেক কালে ছিল না।

(১)

প্রাচীন ইয়োরোপে বাপমারা ছেলেমেয়ের বিবাহ ঠিক করিয়া দিত। পাত্রপাত্রী পরস্পরে চিনিত না। তাহাদের ভালবাসা শুরু হইত বিবাহের পূর্বে নয়, পরে। বস্তুতঃ সেটা পরস্পর ভাল লাগা বা পছন্দ করার ফল মোটেই নয়। যে ছিল একটা সামাজিক কর্তব্য বিশেষ। ছুটা মাহুষ যখন যেন তেন প্রকারে এক ঠাইয়ে জুটিয়াছে তখন তাহারা একসঙ্গে থাকিতে বাধ্য। ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত চিন্তা স্বকৃষ্টি পাক বা না পাক। সেদিকে নর-নারীর মেজাজ থাকিতই না।

খেলিত না একদম এরূপ বলা চলে না। সমাজের বাহিরে ছিল খাটা ব্যক্তিগত দৈহিক টানের ক্ষেত্র। প্রাচীন কবিগণ মেঘপালক ও চাষীশ্রেণীর লোকের প্রেমের কথা গাহিয়া গিয়াছেন। থেওক্রিতোস এবং মোন্ডস ইত্যাদি কবির সাহিত্যে সেই প্রেম কাহিনী পড়া যায়। কিন্তু এই সকল লোক ছিল গোলাম জাতীয়। স্বাধীন নাগরিক বা ভদ্র সমাজের ভিতর তাহাদের ঠাই ছিল না।

খাটা ভদ্র-সমাজে ব্যক্তিগত ভালবাসা দেখা যায় “হেড্ডেরে” প্রথার সম্পর্কে—তাহাও আবার আখেলের গৌরব বৃদ্ধি নয়। আখেল যখন ডাঙন লাগিয়াছে এবং রোমে যখন গণতন্ত্রের পর রাজতন্ত্র কায়েম হইয়াছে সেই সময়ে নব নব সামাজিক প্রতিষ্ঠান কম বেশী দেখা দেয়। তাহার ফলে পুরাণো গোলাম

এক-পত্নী (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১০৭

স্বাধীনতা পায়। দেশের ভিতর বহু বিদেশী লোকের সমাগনও হইতে থাকে। এই সময়কার “হেতেরে” সমাজে গ্রীক এবং রোমান পুরুষেরা দেহগত টানের স্বেচ্ছা কিছু কিছু পাইয়াছিল।

স্বাধীন পুরুষের গোলাম-নারীর ভালবাসা মাঝে মাঝে দেখা যাইত। কিন্তু তাহাও পর-দার-গমন বা পর-পুরুষে আসক্তি। আসল ব্যক্তিগত দৈহিক টান বলিলে যাহা বুঝা যায় গ্রীক রোমানরা তাহা জানিত না। সেই যুগের কবি আনাক্রেয়ল প্রেম-সাহিত্যে নামজাদা। এমন কি ইনিও তাহার প্রিয়তমার নারীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কবিত্ব চালান নাই।

প্রাচীন ইয়োরোপের এরস বা কামদেবতা ইঞ্জিয়াভূতির বিগ্রহ মাত্র। কিন্তু একমাত্র ইঞ্জিয়ারামই বর্তমান যুগের প্রেম নর। পরস্পর পরস্পরকে চাওয়াই বর্তমান আদর্শের পুরুষ-নারীর মিলনের গোড়ার কথা। এই হিসাবে পুরুষ এবং নারী উভয়ে স্বাধীন। কিন্তু সাবেককালে এরসদেবতার অর্থাৎ নারীর মত একপ্রকার লওয়াই হইত না।

অধিকতর বর্তমান আদর্শে এই টান অতি নিবিড় এবং অনেক দিন থাকে। পুরুষ নিজের নারী ছাড়িয়া এবং নারী তাহার পুরুষ ছাড়িয়া থাকা সম্বন্ধ করিতে পারে না। বিরহ এই যুগে এক বিপুল দুঃখোগ। এক জন অপরকে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রাচীন ইয়োরোপে একদম ঘটিত না। ঘটিত মাত্র গণিকা লইয়া।

তাহা ছাড়া বর্তমান ইয়োরোপে দৈহিক-সংস্রব বিচার করা হয় একদম নয়া মাপকাঠি অনুসারে। প্রব্রটা কেবল এ নয় যে :—“এই সংযোগটা আইন-সম্মত না বে-আইনি?” আসল

১০৮ শরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

কথা এই—“পুরুষ এবং নারী উভয়ে স্বাধীনভাবে পরস্পরকে চাহিয়াছিল কিনা?”

এখন কথা এই যে বর্তমান ইয়োরোপীয় সমাজের এই আদর্শ কাজে পরিণত হইতেছে কতখানি? নেহাৎ কম। “ভদ্র সমাজে” পয়সাওয়ালা শ্রেণীর ভিতর এই নয়া আদর্শ বা মাপকাঠি মুখে মুখে চলে মাত্র এইটুকু পর্য্যন্ত বলা চলে। ইহার বেশি বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(২)

ধোনি-গত টানের ইতিহাসে প্রাচীন ইয়োরোপের দান কিছুই নয়। “হেভেরে” প্রথার উপর সেকালের লোক উঠিতে পারে নাই। মধ্যযুগের লোকেরা তাহার উপর পর-দার-গমন এবং পর-পুরুষে আসক্তি জুড়িয়া দিয়াছিল মাত্র। বীর-যুগের প্রেম সঙ্কীর্ণতা তাহার পরিচয় পাই। বিবাহিত জীবনের ব্যতিরেক ছিল তাহাদের দেহ-গত টানের উৎস। কিন্তু দেহ-গত টানের ফলে পুরুষ নারীর পরস্পর পছন্দসই যে বিবাহ হয় সেই টান এবং সেই বিবাহ মধ্যযুগের সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই।

তরল-মতি রোমান সমাজের ত কথাই নাই, গভীর প্রকৃতি জার্মান জাতির ভিতরই বা কি দেখিতে পাই? “নিবেলুড” সাহিত্যের এক নায়িকা ক্রিমহিড গোপনে জীগক্রিডকে ভালবাসে। জীগক্রিডও ক্রিমহিডকে ভালবাসে। কিন্তু ক্রিমহিডের অভিভাবক গুন্টর বলিতেছে যে সে তাহার জন্য এক বীর পছন্দ করিয়া রাখিয়াছে। সেই “পাত্রেস” নাম পর্য্যন্ত করা গুন্টর আবশ্যক বোধ করে নাই। ক্রিমহিড

এক-পাতি (পদ্ম) স্ব-মূলক পরিবার ১০৯

কি জবাব দিল? নায়িকা বলিতেছে—“আমার মতামত লইবার কোন দরকার নাই। তোমার হুকুম আমার শিরোধার্য। তুমি যাহাকে আমার স্বামী রূপে গৃহস্থ করিয়া দিবে সেই আমার স্বামী হইবে।” অর্থাৎ নিজ টানের কথা নায়িকার মাথায় আসে নাই। একদম অজানা অচেনা পুরুষকেও সে বরণ করিতে রাজি।

অস্ত্রান্ত বীর-সাহিত্যেও এই দস্তুর। তবে এক আইরিশ কাহিনীতে দেখিতে পাই যে, তিন বীর এক নায়িকা গুরুত্বকে “দেখিতে” আসিয়াছে। এইক্ষেত্রে নায়িকা তিনজনের দুই জনকে বিদায় দিয়া একজনকে বাছিয়া লইল।

কিন্তু মোটের উপর এই ধরণের স্বয়ংবর মধ্যযুগের ইয়ো-রোপে বিরল। যুবরাজের জন্ত পাত্রী চুঁড়িবার কাজে বাপ-মারাই অধিকারী। তাহাদের মৃত্যু হইলে যুবরাজ নিজে নিজের পত্নী বাছাই করিতে পারে বটে। কিন্তু এই বাছাই স্বাধীন নয়। দরবারের আমীর-ওমরাহ্ ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের মঞ্জুর হইলে তবে যুবরাজ বিবাহ করিত।

বড় ঘরের বিবাহ একটা সামূলি সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র ছিল না। রাজ-রাজরা, নবাব-জমিদারের পত্নী বাছাই একটা দস্তুর মতন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্তা। ব্যক্তিগত ভালবাসা, দৈহিক-টান, পরস্পর গৃহস্থ হওয়া ইত্যাদি কথা এই সকল বিবাহের প্রসঙ্গে উঠিতই না। বংশের ইচ্ছা, বংশের দিগ্‌বিজয়, রাজ্য বিস্তার, জমিদারী বাড়ানো ইত্যাদির চাপে প্রেম মাহাত্ম্য মাথা তুলিতে পারিত না।

নাগরিকদের জীবনও এইরূপই ছিল। মধ্যযুগের মধ্যবিত্ত

এবং খনজীবী সমাজে “শ্রেনী” বা শিল্পীদের “গিষ্ঠ” প্রধান স্থান অধিকার করিত। “গিষ্ঠ”গুলির নিয়ম কাছন ছিল বড় কঠোর। “জাত পাত” বিচার চলিত অত্যধিক। ইহাদের অধিকার এবং ক্রমতা বিবহক অঙ্গশাসনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়,—এক শ্রেনী হইতে অপর শ্রেনীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। অধিকন্তু শিল্পীদের ভিতরও উচ্চ নীচ ভেদ করা হইত খুব বিস্তৃত এবং গভীর ভাবে। কারিগর এবং কর্মী, ওস্তাদ এবং সাগরেত, ইত্যাদি শিল্প সংসারের স্তরগুলি বিশেষ কঠোরতার সহিত রক্ষিত হইত। একে ব্যবসায় বা শিল্প হিসাবে নাগরিকগণের ভিতর পার্থক্য এবং বিশিষ্টতা, তাহার উপর বয়স, বিজ্ঞা, কর্ম-তৎপরতা, ওস্তাদি ইত্যাদির হিসাবে বিভিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্য মধ্য যুগের নাগরিক জীবনে বহুবিধ অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সকল অনৈক্য এবং স্বতন্ত্রতার ফল বিবাহের লেন-দেনেও যথেষ্ট দেখা যাইত। যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো নারীকে দেহের টানে অথবা ভাল লাগে বলিয়া বিবাহ করিতে পারিত না। প্রত্যেক শ্রেনী তাহার অধিকার ভেদ মানিতে বাধ্য থাকিত। কাজেই বিধি-নিষেধের আওতা ছাড়াইয়া কোনো লোক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিত না। জাতি-ভেদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, একমাত্র কতকগুলো বাধা ঘর বা “মেল” হইতেই বর-কন্যা বাছাই সম্ভবপর হইত। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত প্রেমের পরিবর্তে বংশের ইচ্ছাই পারিবারিক বন্ধনের কারণ হইত।

মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ ছিল

এক-পতি (পত্নী) স্ব-স্বলক পরিবার ১১১

বিবাহের রীতি। বর এবং কন্যা পরস্পরকে চিহ্নক না চিহ্নক এবং ভাল বাসুক বা না বাসুক তাহার বাপমা আত্মীয়-বন্ধনের মতামুসারে ঘর করিতে বাধ্য হইত। সেই অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের দলগত বিবাহের যুগে যেরূপ ছিল ইয়োরোপীয় সমাজে মধ্য যুগের লোকেরা তাহার উপর নূতন কিছু কায়েম করিতে পারে নাই।

প্রাচীনতম প্রথায় শিশুর জন্ম হইবামাত্র সে একটা গোটা দলের স্বামী কিম্বা স্ত্রী। পরবর্ত্তীকালের দলগত বিবাহেও নিয়মটা ছিল এইরূপই,—তবে পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে কথকিং সঙ্কুচিত হইতে থাকে মাত্র। জোড়-পরিবারের ব্যবস্থায় জননীরা দুই তরফ হইতে “কথা দিয়া” রাখিত। ইহারা কথা দিবার সময় গোষ্ঠীতে যাহাতে মেয়ে-জামাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়ে একমাত্র অথবা প্রধানতঃ এই দিকটা আলোচনা করিয়াই ছেলে মেয়েদের বিবাহ ঠিক করিত।

এই প্রতিপত্তির কথাই—ধন-সম্পদে ক্ষমতালাভ করিবার প্রবৃত্তিই পরবর্ত্তী যুগে ব্যক্তিগত ধনদৌলতের আমলে জনক-জননীদের পাইয়া বসিয়াছে। পুরুষ-বিধি স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকারের আইন—এই সবের প্রভাবে বিবাহ প্রবলভাবে একটা আর্থিক অঙ্গুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। খোলাখালি কেনা-বেচার আকারে বিবাহ আর অঙ্গুষ্ঠিত হয় না বটে কিন্তু প্রত্যেক বরের এবং প্রত্যেক কন্যার এক একটা বাজার-দর আছে। এই বাজার-দরটা ব্যক্তির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। তাহার তহবিল কত বড় এই তথ্যই পাত্র-পাত্রীর দর নির্ধারণ করিয়া থাকে।

পুরুষ এবং নারীর পরস্পর ভাল লাগা যে বিবাহের কারণ হইতে পারে এ কথা একটা গল্প, উপন্যাস বা নাটকের কাহিনী মাত্র। বড় ঘরে, স্বচ্ছল ঘরে, ধনদৌলত-ওয়ালা সমাজে এই বস্তু দেখা যায় না। মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত মানব-সমাজ সম্বন্ধে এই মত প্রচার করা সম্ভব।

(৩)

আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জগতে নানা দিকে নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক লেন-দেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য যার-পর-নাই প্রসার লাভ করিয়াছে। ধনজীবী পুঁজি-পতি ইত্যাদির প্রভাব সমাজে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে মানবজীবনের নানা কর্মক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের নিয়মকানুন-কায়েম করা হইয়াছে। বিবাহ-পদ্ধতিতেও এইরূপ দেখা যায়। তাহার ফলে বিবাহ একটা “স্বাধীন চুক্তি” রূপে বিবৃত হইতে শুরু করিয়াছে।

ব্যবসায়ের চোখে দুনিয়ার সব জিনিষই বিনিময়ের মাল মাত্র। এই চোখ দিয়া মানুষ জগৎকে দেখিতে শুরু করিয়া মাত্র পুরাণো ধারণাগুলো বদলাইতে থাকে। সাবেক কালের রীতি-নীতি, সনাতন ধর্ম ইত্যাদি বস্তু সবই নবরূপে দেখা দেয়। বিবাহও আর জনক-জননীর কর্তামির ক্ষেত্র না থাকিয়া রর-কস্তার ‘আপ্সে আপ’ বাছিয়া লওয়া কাণ্ড বিবেচিত হইয়াছে।

বিলাতি সমাজতত্ত্ববিৎ মেইন বলেন :—“মান্বাতার আমলে আর বর্তমান যুগে তফাৎ এই যে সাবেক কালের লোকেরা স্থিতি, সনাতনী রীতি বা যা আছে তাই ঠিক এই নিয়মের

এক-পতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১১৩

বিধানে জীবনযাত্রা চালাইত আর আজকালের নয়নারী পুরাণে রীতিনীতির বা বংশমর্যাদার দোহাই না দিয়া স্বাধীন ভাবে জীবনযাপনের সর্ব বাচ্ছিয়া লয়।" এই স্থিতির নাম সর্ব সম্বন্ধে "কমুনিষ্ট ম্যানিফেস্টে" ("ধনসাম্যের মোসাবিদা") নামক প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এই আবিষ্কারের ভিতর সত্য আছে অনেক।

একটা চুক্তি বা সর্ব করিতে পারে কাহারো? যাহারা স্বাধীন এবং পরস্পর সমান। ধনপতি শাসিত সমাজ প্রথম হইতেই এই ধরনের স্বাধীন এবং পরস্পর সাম্যশালী জীব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। প্রথম প্রথম সেই সৃষ্টির উপর একটা ধর্মের আগল ছিল।

তখন চলিতেছিল খৃষ্টান জগতে ধর্মসংস্কারের যুগ। আর্মিগির লুথার এবং ক্রাস্লেস ক্যাল্ডা উভয়েই প্রচার করিয়াছিলেন :—"স্বৈচ্ছায় যাহা মাহুষ করে একমাত্র তাহার জন্তই সে দায়ী। কাজেই কোনো লোককে জোর জবরদস্তি করিয়া একটা দুর্নীতিমূলক কাজ করাইবার ব্যবস্থায় বাধা দেওয়া মাহুষ মাজেরই কর্তব্য বিশেষ।"

বিবাহের বেলায় এ মতটা খাটিত কেমন? "বুর্জোয়া" সমাজে বিবাহ ছিল অস্ত্রান্ত ব্যবসায়ের অহুষ্ঠানের মতনই একটা চুক্তির জিনিষ। চুক্তিটা স্বাধীনও বটে। কিন্তু এই তথাকথিত চুক্তি এবং স্বাধীনতার "ভিতরকার কথা" কি? কানায়ুধা না করিয়াও সকলেই টের পাইত বরকজার মতামতের পশ্চাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তির ইসারা, অজুলিসঙ্কেত এবং চোখ রাজানি কাজ করিয়াছে।

কিন্তু ব্যবসাদারীর যুগে যখন সর্বত্র চলিতেছিল আইনগত স্বাধীনতা তখন যোনিসঙ্যোগ সম্বন্ধে স্বাধীনতাটা শব্দ মাঝে পর্য্যবসিত থাকিবে ইহা যুবকযুবতীর ধারণায় দাঁড়াইতে পারে নাই। অধিকন্তু ধর্ম্মে তখন পাপের বিকল্পে লুড়াই বহুসংখ্যক নরনারীকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে বিজয়ী করিয়াছে। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-জ্ঞান, স্বাধীন-চিন্তা, স্বতন্ত্রতা যখন গির্জাকেও ভাঙিয়া ফেলিতে পারিয়াছে তখন জীবনযাত্রার নিজ কর্ণে একটা মৌখিক আইনগত স্বাধীনতা লইয়া নরনারী সঙ্কট থাকিতে পারিত না।

এই দিকেও ভাঙন দেখা দিয়াছিল। তখন চলিতেছিল বস্তুতঃ জগৎ ভরিয়াই একটা মহাভাঙনের যুগ। পুরাণো ছনিয়ার সীমানাগুলি উঠিয়া গিয়াছিল। নবীন গোলাধ্বজ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং দেশদেশান্তরে অহরহ গতিবিধির প্রভাবে মানুষ সাবেককালের বিধিনিষেধ, কর্তব্যাকর্তব্য এবং ঈতিনীতিগুলিকে নেহাৎ সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। বাহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে মেক্সিকোয় এবং পর্তুগীসিতে সোনারূপার খাদের সন্ধানে বিশ্বপর্য্যটন করিতে বাহির হইয়াছিল তাহারা কি আর সনাতন শীল, শিষ্টাচার বাপমার আব্দার ইত্যাদি সাবেক কালের স্বধর্ম্মগুলার তোআত্ম রাখিতে পারে? কাজেই বিবাহের বন্ধনে স্বাধীনতা, যেচ্ছায় চুক্তি, বোনির টান ইত্যাদি ক্রমে ক্রমেও বাস্তব সত্যে পরিণত হইতেছিল।

কমসেকম প্রটেস্ট্যান্ট নরনারীর সমাজে এই বিপ্লব দেখা দিয়াছিল বল। চলে। বিবাহটা যে একমাত্র পুরুষের অধিকার

এক-পাতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১১৫

নর, ইহাতে নারীর অধিকার ও ইচ্ছা ধর্মসংস্কারের যুগের পূর্বে এই তথ্য বাস্তবজীবনে আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিন্তু সম্পত্তির টানকে যোনির টান কোনো মতেই পরাস্ত করিতে পারে নাই। রাজরাজড়াদের মহলে, ধনী বাঁকলারী মহলে, এক কথায় সম্রাট ও ভক্ত সমাজে যোনির টানে বা স্বাধীন চুক্তির প্রভাবে বিবাহ রহিয়া গিয়াছে ব্যতিরেক। এখানে ধনদৌলতের প্রভাবে বিবাহই নিয়ম। অপর দিকে, বড়ই মজার কথা—নিঃস্ব ধনদৌলতহীন নরনারীরাই জানে আসল স্বাধীন সন্তের বিবাহ কি বস্তু। যোনির টানে বিবাহ একমাত্র গরীব সমাজেই নিয়ম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধনীনিধনের এক প্রভেদ এই যে “মানবের অধিকার”—পুরুষের অধিকার এবং নারীর অধিকার—বলিলে যাহা কিছু বুঝায় তাহার প্রায় সবগুলাই ধনীর একচেটিয়া। কিন্তু প্রেমের অধিকার নামক যে মানবাধিকার তাহা কেবল নিধনরাই চাখে।

বিবাহে পূরানুরি স্বাধীনতা কায়ম করিতে হইলে সমাজ হইতে ব্যক্তিগত ধনদৌলতের আধিপত্য তুলিয়া দিতে হইবে। টাকাপয়সার দৌরাত্ম্য যতদিন আছে ততদিন যোনির টান জগতে মাথা তুলিতে পারিবে না।

ভবিষ্যতের পরিবার

বাথোফেন বলিয়াছেন :—“দলগত বিবাহ তুলিয়া দিয়া জোড়পরিবার কায়ম করিবার প্রয়াসে নারীর কৃতিত্বই প্রধান-ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।” পরন্তু পরবর্তী যুগে জোড়পরিবার

ভাঙিয়া একপতি-(পত্নী)-র কার্যে পরিবার জন্ত পুরুষের আত্মতরিতাই দায়ী। পুরুষ নারীকে নিজের বশে রাখিয়া তাহাকে স্বাস্থ্যবৎ একেলা ভোগ করিবার জন্তই সে ছোড়-পরিবার প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। পুরুষ অবশ্য নিজের উন্নয়ন হইতে যথেষ্টরূপে বহু নারী ভোগের ক্ষমতা বিদায় দেয় নাই।

এখন যদি নারীকে কোনো মতে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহা হইলে সে পুরুষকে বহু-পত্নীক হইবার স্বেচ্ছা হইতে বঞ্চিত করিবে। নারী তখন সত্যসত্যই পুরুষের সমান হইতে পারিবে। ইহাতে নারীর পক্ষে বহু-পুরুষ ভোগের লোভ বাড়িবে না। কেননা বর্তমান অবস্থায়ই দেখা গিয়াছে যে নারী সাধারণতঃ একটা পুরুষ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। লাভ হইবে এই যে, পুরুষ আজকালকার মতন একাধিক নারীর সঙ্গে সন্তোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া খাঁটি এক-পত্নীক হইতে বাধ্য হইবে।

আজকালকার পারিবারিক ব্যবস্থায় পুরুষের একাধিপত্য প্রবল। তখন এই পুরুষতন্ত্র উঠিয়া যাইবে। অধিকন্তু আজকাল বিবাহ ভাঙা এক প্রকার অসম্ভব কাণ্ড। বিবাহ একদম অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বরূপ বিবেচিত হয়। নারী আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিলে বিবাহ ভাঙা বেশী কঠিন থাকিবে না।

বিবাহের বন্ধন যে অচ্ছেদ্য এই ধারণাটা মানব-সমাজে গজিয়াছে কি করিয়া? প্রথম কারণ এক পতি-(পত্নী)-স্বের আমলের পুরুষাধিপত্য এবং নারীর আর্থিক পরনির্ভরতা। এখনোঁলত সমাজে পুরুষের উপর নারীর এই যে গলগ্রহ থাকা এই তথ্যটা আবার ধর্মের মোহাইয়ের সঙ্গে বাধা পড়িয়াছে।

এক-পাতি (পত্নী) স্ব-মূলক পরিবার ১১৭

বুঝিয়া না বুঝিয়া জগতের নরনারী জী-স্বামীস্বর সঙ্ঘ কে একটা তথাকথিত আধ্যাত্মিক কিছু সম্বন্ধিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই কারণে বিবাহ ডাঙিয়া ফেলা বর্তমান সমাজে একটা অতি ভয়ানক কাণ্ডকারখানা বিবেচিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যোনির টানে বিবাহই যদি বিবাহরূপে সম্মানিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে থাকে তখন যতদিন পুরুষ-নারীতে পরস্পর ভাললাগার সঙ্ঘ থাকিবে ততদিন বিবাহ জটুট থাকিবে। কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিতে যোনির টান এক এক পুরুষের বা নারীর পক্ষে এক এক প্রকার। বিশেষতঃ পুরুষেরা এই হিসাবে নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। কেহ বেশিদিন কেহ কমদিন কোনো এক নারীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারে। কিন্তু বধনই এইরূপ সহবাসের প্রবৃত্তি কমিতে থাকে তখনই পরিবারটা ডাঙিয়া ফেলা পুরুষ এবং নারী উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। নারীর আর্থিক স্বাধীনতার যুগে তাহাতে সমাজের কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং ডাইভোর্স নামক কলঙ্কময় জীববর্জন বা স্বামীবর্জনের মোকদ্দমা হইতে হুনিয়া উদ্ধার পাইবে।

ধনদৌলতে স্বাধীনতা আনিলে সমাজ এই উপায়ে নানা দিকে নানা দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আজকালকার সমাজব্যাপী বহু নু একে একে উঠিয়া যাইতে থাকিবে। জগৎ একদম নতুন চরিত্রের পুরুষের এবং নতুন চরিত্রের নারীর আবাগদুমিতে পরিণত হইবে। টাকার জোরে পুরুষ আর নারীর যোনি কিনিতে সমর্থ হইবে না। নারীরাও আর ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো পুরুষের গঙ্গ লইবে না।

অধিকতর আর্থিক ছরবছার ডগে ইহারা নিজেদের পছন্দসই পুরুষের সঙ্গে সহবাস করা হইতে বিরত হইবে না। জগতে একটা নতুন নীতি, নতুন মাপকাঠি, নতুন লোকমত তৈয়ারী হইতে থাকিবে।

এইখানে আবার মর্গ্যানের মত উদ্ধৃত করা যাউক। তিনি বলিয়াছেন :—মানবজাতির সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ইতিহাসে পরপর চার প্রকার পারিবারিক প্রথা দেখা গেল। আজকাল “উৎকর্ষ” বা সভ্যতার আমলে একপতি-পত্নী-ত্ব চলিতেছে। কাজেই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক,—এই প্রথাটাই আর কতদিন থাকিবে? এইটা কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? ইত্যাদি। “উৎকর্ষের” আমল শুরু হওয়া হইতে আজ পর্যন্ত এই প্রথাটা নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সমাজ যেমন যেমন বদলাইয়াছে একপতি-পত্নী-ত্বও তেমন তেমন বদলাইয়াছে। এই বদলানোর উন্নতিই প্রকটিত হইয়াছে। কাজেই বিশ্বাস করা চলে যে, ভবিষ্যতেও আরও নয়া নয়া রূপ দেখা দিবে, এবং সেই সকল রকমওয়ারি পারিবারিক প্রথায় মানবজীবনের উন্নতিরই নানা ধাপ খুলিয়া যাইবে। পুরুষ এবং নারীর সাম্য একপতি-পত্নী-ত্বের চরম উন্নতি লক্ষ্য হইবে। কিন্তু একপতি-পত্নী-ত্ব যদি মানব-সমাজের নয়া চাইদা পূরণ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে একদম অভিনব রূপের পরিবার জগতে আসিবে। তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভবিত অসাধ্য।”

তৃতীয় অধ্যায়

ইক্সোকোঅাদেন্স গোষ্ঠী প্রথা

“গেন্স”

কুটুম্বাচক শব্দ ও আত্মীয়তার সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে ইয়াকি পণ্ডিত মর্গ্যান সাবেক কালের পারিবারিক প্রথাগুলি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই ধরনেরই আর এক আবিষ্কারের জন্য মর্গ্যান নৃতত্ত্ববিজ্ঞান আসরে নাম করিয়াছেন। মানব-সমাজে সুপ্রচলিত গোষ্ঠী বা জাতিপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের অন্তর্গত।

আমেরিকার “ইণ্ডিয়ান” সমাজে যোন-কেদ্রগুলি এক একটা কানোআরের নামে অভিহিত হয়। এইগুলি মর্গ্যানের মতে গ্রীকদের “গেনেআ” এবং রোমানদের “গেন্ডেস” হইতে অভিন্ন। ইণ্ডিয়ান রূপগুলিই গ্রীক-রোমান রূপ অপেক্ষা পুরাণে। গ্রীক রোমান প্রথা ইণ্ডিয়ান হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে সমাজ “গেন্স”, “কাজী” এবং “টাইব” বা “জাতি” এই তিন স্তরে পর পর সাজানো ছিল। ইণ্ডিয়ান সমাজের তরবিজ্ঞানও অবিকল এইরূপ। মর্গ্যান আরও বলেন যে, “উৎকর্ষের” যুগে পদার্পণ করা পর্যন্ত ছুনিয়ার সকল “বার্কার” জাতিই “গেন্স” প্রথার ভিত্তি দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

এই আবিষ্কার সাধিত হইবামাত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের

বহু কঠিন ও ভীষণ প্রকারে বৃদ্ধিতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু খাটো রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার পূর্বে আদিম মানব কোন্ পথে কি উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়েও ধারণা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদেরা এতদিন প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে “গা-জুরি” করিয়া যে-সে মত বাজারে চালাইতেছিলেন। মর্গ্যানের সিদ্ধান্তে সেই সব এক নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও মর্গ্যান তাহার আবিষ্কারগুলো প্রচার করিতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সমাজবিজ্ঞানের রাজ্যে একটা যুগান্তর সাধিত হইয়াছে।

মর্গ্যান “গেন্স্” নামক ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করিয়া ইণ্ডিয়ানদের যৌন বা বিবাহকেন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক “গেনোস্” এবং ল্যাটিন “গেন্স্” আর্থ্য ধাতু গণ (জন) হইতে উৎপন্ন। গণ (জন) ধাতুর অর্থ উৎপন্ন করা। “গেনোস্,” “গেন্স্,” সংস্কৃত “জন,” গথিক “কুনি,” প্রাচীন “নস” এবং অ্যাংলো-সাকসন্ “কিন,” ইংরেজি “কিন,” মিড্‌ল হাই জার্মান “ক্যিয়ে” এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি একরূপ। প্রত্যেক শব্দেই উৎপত্তি, বংশ ইত্যাদি বুঝায়। ল্যাটিন এবং গ্রীক শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে এইরূপ এক যৌনকেন্দ্র বুঝান হইত যাহার লোকেরা কোনো এক পূর্বপুরুষের সম্ভান বলিয়া নিজকে গৌরবাচিত্ত বিবেচনা করিত। এই কেন্দ্রের নরনারীরা কতকগুলো ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি পালন করিয়া অন্তান্ত কেন্দ্রের লোকজন হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যত্ন লইত। “গেন্স্” এবং

“গেনোসের” উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মর্গ্যানের পূর্বে ঐতিহাসিকেরা এক প্রকার অজ্ঞ ছিলেন। “গেন্স”কে জাতি বা গোষ্ঠী ধরিয়া লইতেছি।

“পুনালুয়া” প্রথার পরিবার আলোচনা করিলে “গেন্স” সম্বন্ধে কতকগুলি মূলতথ্য পাওয়া যায়। এই প্রথায় “পুনালুয়া” অর্থাৎ “নিকট আত্মীয়”দের ভিতর পরস্পর বিবাহ চলিত। “পুনালুয়া”রা আপন মায়ের পেটের ভাই-বোন নয়, নিকট আত্মীয় মাত্র। তখন ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সেই অবস্থায় বাপের নাম জানা ছিল না। মায়ের নামে চলিত পরিবার এবং বংশলতিকা। কোনো জননীর বংশধর হিসাবে যে সকল নরনারী এক কেন্দ্র গড়িয়া তুলিত, তাহারাই হইত “গেন্সের” লোক। মেয়েদের অল্প স্বামী আসিত অল্পকাল কেন্দ্র হইত। কাজেই পৌত্রপৌত্রীরা “গেন্সের” লোক বিবেচিত হইত না। ইহারা অল্পকাল “গেন্সের” লোক। কিন্তু মেয়েদের সন্তানেরা নিজ “গেন্সের”ই ব্যক্তি বিবেচিত হইত।

গোষ্ঠী-শাসন

ইরোকোআ সমাজের সেনেকা “জাতি” আট গোষ্ঠী বা জাতিকেন্দ্রে বিভক্ত। প্রত্যেকের নাম আলাদা। জানোআর হিসাবে নামকরণ হয়। প্রথম জাতিকেন্দ্রের নাম নেকড়ে বাঘ, দ্বিতীয়ের নাম ভল্লুক, তৃতীয়ের নাম কচ্ছপ, চতুর্থের নাম বীভার, (চতুর্দশ উভচর জীব। ইহুর জাতীয় শুক্লপায়ী। এ জানোআরের লোম পাশ্চাত্যের পোষাকে ব্যবহার করে।) অপর চারটা জানোআর বা গোষ্ঠীর নাম হরিণ, আইপ (লম্বা

টোট ওয়ালা কলাশর চারী পাখী,) হেরণ (পাখী) এবং বাজ (পাখী) । প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলো “ধর্ম” আছে ।

প্রথমতঃ, শান্তির সময় গোষ্ঠী কর্তৃক “সাথেম” (নায়ক) বাছাই করা হয় । লড়াইয়ের সময়ও এক ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচিত হয় । “সাথেম” গোষ্ঠীরই একজন । মোটের উপর বলা বাইতে পারে যে, এই পদ একপ্রকার বংশাঙ্কুরমিক । কিন্তু লড়াইয়ের নায়ক গোষ্ঠীর বাহির হইতে নির্বাচিত করা সম্ভব । এই পদে অনেক সময় কোনো লোক বহাল না থাকিলেও চলে, কিন্তু “সাথেমে”র পদ কখনই খালি থাকিতে পারে না ।

“সাথেম” বংশাঙ্কুরমেই নির্বাচিত হয় বটে । কিন্তু পুত্র তাহার পিতার গর্ভিতে বসিতে পায় না । কেননা পুত্র তাহার জননীর গোষ্ঠীর লোক । “জননীবিধির” নিয়মে ভাই কিম্বা ভাগ্নেই উত্তরাধিকারী ।

যেযু পুরুষ উভয়েই “সাথেম” বাছাইয়ে ভোট দেয় । কিন্তু কোনো এক গোষ্ঠী একাকী তাহার গোষ্ঠী-নায়ক নির্বাচনে অধিকারী নয় । অপর সাত গোষ্ঠী মত দিলে তবে “সাথেমে”র বাছাই ইরোকোআ-কেডারেঙন বা “মুক্তরাষ্ট্রে”র বড় সভায় মঞ্জুর হয় ।

“সাথেমে”র এক্টিয়ার প্রধানতঃ নৈতিক ধরণের । জোর জবরদস্তির কোনো ব্যবহার তাহার তাবে নাই । সেনেকা “জাতি”র সভায় তাহার ঠাই আছে । অধিকন্তু সর্ব “জাতি” সমন্বিত গোটা ইরোকোআ-কেডার্যান সভায়ও তাহার বসিবার কর্তৃত্ব আছে ।

লড়াইয়ের নায়ক লড়াই ছাড়া অন্য কোনো অধিকার ভোগ করে না।

দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠী যখন তখন খুশী অহুসারে ছুই নায়ককেই বরখাস্ত করিতে পারে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে। বরখাস্ত হইবার পর ইহারা সমাজে অন্তর্ভুক্ত পুরুষের মতন মামুলি যোদ্ধা অথবা অন্য কিছু রূপে জীবন চালাইতে থাকে। আর এক কথা, নরনারীদের মতের বিরুদ্ধে “জাতি” সভা অর্থাৎ আটগোষ্ঠী-সমন্বিত সেনাকা-পরিষৎ কোনো গোষ্ঠীর নায়কদিগকে বরখাস্ত করিতে অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিধানই গোষ্ঠীর বন্ধন-রজ্জ্ব। নিয়মটা “নেতি”-মূলক বটে, কিন্তু এই “নিষেধাত্মক” নিয়মেই রক্ত-সম্বন্ধের “অস্তিত্ব” সমাজের উপর তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। ইহার জোরেই রক্তের টান অহুসারে জাতিকেন্দ্রে গড়িয়া উঠে।

এই তথ্যটা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মর্গ্যান যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে “সাহস্রজ” এবং “বার্কার” নরনারীদের বিবাহ-প্রথা কোনো পর্য্যটক এবং গবেষকই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই সকল সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং গোজা-মিলপূর্ণ বৃত্তান্ত দিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতেন এই সকল সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলার ভিতর পরস্পর বিবাহ হয় না। কিন্তু এই তথ্যের অর্থ বুঝা কঠিন। ষ্টল্যাণ্ডের নৃত্যবিৎ ম্যাকলেনান নেপোলিয়ানি বথেন্সাচারের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন :—“জাতিগণা ছুই জেলীর অন্তর্গত। এক জেলীকে একসোগেমাস বলে। অর্থাৎ

ইহার পরস্পরবিবাহ নিষিদ্ধ। অপর এণ্ডোগেমাস বলে। এখানে কেন্দ্রের ভিতরকার নরনারী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।”

এই ধরনের হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি করিয়া ম্যাক্লেনান আর এক অভূত আবিষ্কারে মাতিয়া গিয়াছিলেন। “এক্সোগেমি বা (বহির্বিবাহ) পুরাণো কি “এণ্ডোগেমি” (অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ) পুরাণো এই আলোচনায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে। রক্তসংশ্রবের জোরে গোষ্ঠী কায়েম হয়, সুতরাং গোষ্ঠীর ভিতর নরনারীর বিবাহ অসম্ভব, মর্গ্যান যেই এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন তখনই ম্যাক্লেনানের অভূত মতগুলা চাপা পড়িয়া গেল। ইরোকোআদের ভিতর নিষেধ বিধানটা বেশ জারি।

চতুর্থতঃ, লোক মারা পড়িলে তাহাদের সম্পত্তি গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যক্তির হাতে আসে। গোষ্ঠীর বাহিরে কেহ এই ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় ভাই, বোন এবং মামারা। মেয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিজ ছেলেপুলে এবং বোন, কিন্তু ভাইয়েরা নয়। স্বামীর ধনে জীর অধিকার নাই, জীর ধনেও স্বামীর অধিকার নাই। আবার ছেলেপুলেরা জনকের সম্পত্তি ভোগ করিতে অধিকারী নয়।

পঞ্চমতঃ, গোষ্ঠীর ব্যক্তির পৰস্পর পবস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ কোনো বিদেশী যদি তাহাদের কোনো এক জনের লোকসান করে তাহা হইলে গোটা গোষ্ঠী প্রতিহিংসার ধর্মে মাতিয়া উঠে। লোকসান মাত্রই গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোটা ইরোকোআ সমাজে “রক্তহিংসা” সুপ্রচলিত। বিদেশীর হাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে গোষ্ঠী সেই বিদেশীর প্রাণ সংহার করিতে অধিকারী। যদি

দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠী আপোনে মাপ চায় অথবা ক্ষতি পূরণ করিতে রাজি হয়, তাহা হইলে কোমো কোনো সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী তাহাতেই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শাস্ত না হইলে গোষ্ঠী এক বা একাধিক লোক বহাল করিয়া সেই দোষীকে যমালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। যদি দোষী এই উপায়ে পঞ্চদ্বপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার গোষ্ঠী হইতে কোনো নালিশ চলিতে পারে না। খুনের সাজা খুন,—এই নীতি সকল গোষ্ঠীই মানিয়া থাকে। *

ষষ্ঠতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলি বাধা নাম আছে। এই নামকরণ একচেটিয়া। অর্থাৎ অন্যান্য গোষ্ঠীতে কোনো ব্যক্তি এই সকল নামে পরিচিত হইতে পারে না। কাজেই একটা নাম শুনিবামাত্র তাহার “জুষ্টির খবর” বলিয়া দেওয়া সম্ভব। নামের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দাবীদাওয়াও গোষ্ঠীগত।

সপ্তমতঃ, বিদেশীকে নিষেধ করিয়া লওয়া গোষ্ঠীর এক্টিয়ারের অন্তর্গত। একবার কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলে বিদেশীরা গোটা “জাতির” লোকই বিবেচিত হয়। লড়াইয়ের বন্দী সকলকেই খুন করা হয় না। যাহারা বাচিয়া থাকে তাহারা এই প্রণালীতে গোষ্ঠীর পোস্তগুরু বিশেষ। এই ধরণের বহু পোস্ত সেনকা “জাতির” অন্তর্গত হিসাবে “গোষ্ঠীর” এক্টিয়ার ভোগ করে। পোস্তগ্রহণ করিবার জন্ত গোষ্ঠীর কোনো লোককে বলিতে হয়,—“আমি অমুককে ভাই বা বোন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।” মেয়েরা পোস্তগ্রহণ করিবার সময় বলে,—“অমুক বিদেশী আজ হইতে আমার সম্বান।” পোস্তগ্রহণ কাণ্ড একটা বড় গোছের ঘটাসম্বন্ধিত উৎসববিশেষ।

গোষ্ঠীতে লোক কমিতে থাকিলে এই উপায়েই লোকসংখ্যা বাড়ানো হইয়া থাকে। এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠীতে শোভা লওয়ার রেওয়াজ অনেক দেখা গিয়াছে। ইরোকোআদের ভিতর “জাতি”-সভার প্রকাশ্য বৈঠকে ধর্মকর্মের সহিত “পোস্ত-বজ্জ” অর্হুতিত হয়।

অষ্টমতঃ, ধর্মকর্ম নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র অর্হুতান ইতিয়ান সমাজে দেখা যায় না। গোষ্ঠীর সংজ্ঞাবেই ইহাদের ধর্মসংস্কার-জাতীয় সকল কাণ্ড অর্হুতিত হয়। সেই উপলক্ষে “সাথেম” এবং লড়াইনায়ক পুরোহিতের কাজ করে। ইহাদিগকে তখন ধর্মরক্ষক বলা হয়। বৎসরে ছয়টা মহোৎসব ইরোকোআদের পঞ্জিকায় ঠাই পাইয়াছে।

নবমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটা সার্বজনিক কবরের ঠাই আছে। নিউইয়র্ক প্রদেশে যেতান নরনারীরা ইরোকোআদের সকল জায়গাই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাজেই আজকাল আর ইহাদের স্বতন্ত্র গোরস্থান দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে ছিল। ইরোকোআদের নিকট-আত্মীয় তুকারোরা এবং অন্যান্য সমাজে আজও গোষ্ঠীগত সার্বজনিক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ইহারা খ্রীষ্টধর্মে পরিণত। তথাপি গোরস্থানের ভিতর প্রত্যেক গোষ্ঠীর অল্প নিজ নিজ কবরের সারি নির্দিষ্ট আছে। জননীকে তাহার সম্মানসম্বন্ধিতর সারিতেই কবর দেওয়া হয়। কিন্তু জনকের ঠাই অন্তর্জ। ইরোকোআ সমাজে গোটা গোষ্ঠী অন্তর্জক্রিয়ায় সাহায্য করে।

দশমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটা করিয়া সভা বা পরিষৎ থাকে। প্রবীণ বয়সের যে কোনো পুরুষ এবং নারী এই সভায়

বসিতে পারে। প্রত্যেকের অধিকারও সমান। “সাথেম,” লড়াই-নায়ক এবং ধর্মরক্ষক তিনজাতীয় কর্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠী-সভার কাজ। প্রতিহিংসা লওয়া এবং পোস্তগ্রহণ করাও এই সভায় আলোচিত হয়। গোষ্ঠীর সকল কাজেই সভার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই দশ দফা হইতে বেশ বুঝা যায় কেন মর্গ্যান ইণ্ডিয়ান সমাজকে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সমান। “সাথেম” ইত্যাদি নায়কেরাও কোনো বিষয়ে “হাতীঘোড়া” নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাধীনতার সহায় এবং সংরক্ষক।

গোষ্ঠী যখন এই রূপ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যের নিয়মে গঠিত, তখন গোষ্ঠী-সমন্বিত “জাতি” এবং জাতি-সমন্বিত “কেডোরে-শান” ও সাম্যমূলক গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মর্গ্যান গোষ্ঠীর স্বধর্মগুলি আলোচনা করিতে গিয়াই ইরোকোআ এবং অন্যান্য সমাজের “মুক্তরাষ্ট্রের” বনিয়াদ দখল করিতে পারিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান-সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মকর্তৃত্বের গোড়ার কথা গোষ্ঠীর জীবন।

উত্তর আমেরিকা যে সময় ইয়োরোপের আবিষ্কারে আসে, তখন সেখানকার সকল অধিবাসীই “জননীবিধির” নিয়মে গোষ্ঠীর বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। কেবলমাত্র ডাকোটা সমাজে গোষ্ঠী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু ওজিবাওয়া, ওমাহা এবং যুকাটানের “মারা” সমাজে মেয়ের ঠাইয়ে পুরুষের উত্তরাধিকার দেখা দিয়াছিল।

ক্রাজী

কোনো কোনো “জাতি” পাঁচ ছয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের তিন, চার বা পাঁচটায় মিলিয়া এক একটা সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিত। এই ধরণের গোষ্ঠী-সমবায়কে মর্গ্যান প্রাচীন গ্রীক প্রথার অনুরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। এই গোষ্ঠী-সমবায়কে ইনি গ্রীক “ক্রাজী” শব্দে অভিহিতও করিয়াছেন। ইরোকোআদের সেনেকা “জাতির” আট গোষ্ঠী। এই আট গোষ্ঠী দুই ক্রাজীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ক্রাজীতে চারটা করিয়া গোষ্ঠী ছিল।

এই ক্রাজীগুলার উৎপত্তি হইল কি করিয়া? সাবেক কালে ক্রাজী স্বয়ংই একটা সম্পূর্ণ জাতি বিবেচিত হইত। প্রত্যেক ক্রাজীতে অন্ততঃ দুইটা করিয়া গোষ্ঠী থাকা আবশ্যক হইত কেননা তাহা না হইলে বিবাহের বরকছা জুটিত না। মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

“জাতিটা” লোকসংখ্যায় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীও দুই বা ততোধিক টুকরায় ভাঙিয়া গিয়াছিল। তখন এক একটা সাবেক গোষ্ঠী ক্রাজীতে পরিণত হইত। ক্রাজীর সঙ্গে গোষ্ঠীর রক্তসম্বন্ধ অতি নিকট।

সেনেকা এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান-সমাজে ক্রাজীর অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলো পরস্পর তাই স্বরূপ। অপরাপর ক্রাজীর গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সব গোষ্ঠীর সম্বন্ধ খুঁড়তৃত, জ্যেষ্ঠতৃত বা মাসতৃত, পিসতৃত তাইয়ের মতন। এই কারণে প্রথম প্রথম সেনেকার ক্রাজীর

ভিতর বিবাহের আদান প্রদান নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পরে একমাত্র গোষ্ঠীর ভিতর এই নিষেধ আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ভল্লুক এবং হরিণ এই দুই গোষ্ঠীকে সেনেকারা সর্ব প্রাচীন বিবেচনা করে। ইহাদের লোকপরম্পরা অনুসারে অগ্ন্যগ্ন গোষ্ঠী এই দুই গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গোষ্ঠীগুলি কোনো কোনো সময় “নির্কংশ”ও হইয়াছে। তখন কোনো ক্রাভ্রী হইতে একটা গোটা গোষ্ঠী আসিয়া তাহার ঠাই পূরণ করিয়াছে। এই কারণে গোষ্ঠীর নাম দেখিয়া অতি সহজে তাহার সঙ্গে ক্রাভ্রীগুলার এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধ বুঝা যায় না। সর্বত্রই কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্ট হইয়াছে।

ইরোকোআদের ক্রাভ্রীকে কোনো কোনো বিষয়ে সমাজ-কেন্দ্র বিবেচনা করিতে হইবে। ধর্ম-কেন্দ্র রূপেও ইহার কাজকর্ম লক্ষ্য করা কর্তব্য।

১। বল খেলার বেলায় ক্রাভ্রীতে ক্রাভ্রীতে টক্কর চলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সেরা খেলোয়ার পাঠায়। দুই দলের অগ্ন্যগ্ন লোকেরা দুই দিকে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ খেলোয়ার-দিগকে উৎসাহিত করে। খেলার উপর বাজীও চলে।

২। “জাতি”-সভায় প্রত্যেক ক্রাভ্রীর “সাথেম” এবং লড়াই-নায়েকেরা পরস্পর উল্টাদিকে মুখামুখি হইয়া বসে। বক্তারা দুইদিকে ফিরিয়া দুই স্বতন্ত্র দলের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া থাকে।

৩। কোনো লোক খুন হইলে গোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ক্রাভ্রীর অগ্ন্যগ্ন গোষ্ঠীর নিকট আবেদন করে। ক্রাভ্রীর বৈঠক ডাকিয়া শোনা করে। পরে খুনের ক্রাভ্রীকে ক্ষতিপূরণের জন্য তলব করা হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বাদানুবাদ চলে না। মামলা

১৩০ পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

মোর্কদমা নিম্পন্ন হয় ক্রাজীতে ক্রাজীতে। এই ক্ষেত্রে ক্রাজীকে “সাবেক কালের “জাতির” জেরই বিবেচনা করা উচিত।

৪। গোষ্ঠীতে কোনো নামজাদা লোক মারা পড়িলে নিজ ক্রাজীর নরনারীর। শোকের ভার বহন করে মাত্র। কিন্তু কবর দেওয়া এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্ত্যস্ত কাজের জন্য “জাতির” অপর ক্রাজী দায়িত্ব গ্রহণ করে। “সাথেমে”র মৃত্যু হইলে জাতিকে এবং ইরোকোআ যুক্ত-সভাকে কবর দেওয়ার ভারও এই অপর ক্রাজীর হাতে।

৫। “সাথেমে” নির্বাচনের বেলায়ও একমাত্র নিজ ক্রাজীর মতামতই চরম নয়। অপর ক্রাজী আপত্তি করিলে বাছাই রদ্ হইতে পারে।

৬। ধর্মকর্মের কাণ্ডও প্রত্যেক ক্রাজী নিজস্ব রক্ষা করিয়া * চলে। সেনেকা-সমাজে ধর্ম লইয়া কিছু কিছু গুহ্য কারবার আছে। এই সকল কারবার দুই সমিতির অধীনে পরিচালিত হয়। যে-সে লোক এই সব সমিতিতে ঠাই পায় না। নানা প্রকার তুচ্ছতার চল আছে। তদনুসারে সভ্য বাছাই হয়। কিন্তু প্রত্যেক ক্রাজী এক একটা সমিতির অধিকারী ! সেনেকাদের আট গোষ্ঠীর দুই ক্রাজীর জন্য দুই সমিতি আছে।

৭। থাফালায় চার কোণে চার বংশ দিক রক্ষার ভার লইয়াছিল। খেতাজদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় এই সীতি দেখা গিয়াছে। এই চার বংশকে যদি চার ক্রাজী বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, গ্রীক সমাজের মতন ইণ্ডিয়ান-সমাজেও ক্রাজী ছিল সামরিক জীবনের কেন্দ্র। জাঞ্চাণ-সমাজেও এই ধরনের সামরিক কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক

বংশই নিজ পোষাকে সাজিয়া, নিজ নিশান লইয়া স্বতন্ত্ৰ হলে
লড়িতে যাইত। প্রত্যেক নায়কই ছিল স্বতন্ত্ৰ।

“জাতি” (টাইব)

একাধিক গোষ্ঠীৰ মিলনে হয় ক্ৰাজী। সেইরূপ একাধিক
ক্ৰাজীৰ সমবায়ে “টাইব” বা “জাতি” গড়িয়া উঠে। কোনো
কোনো ক্ষেত্রে,—বিশেষতঃ যেখানে লোক-সংখ্যা নেহাৎ
কমিয়া আসিয়াছে,—মধ্যের কেজ্জটা অর্থাৎ ক্ৰাজী আজকাল আর
দেখা যায় না।

ইণ্ডিয়ান-সমাজে “টাইব” (জাতি) কাহাকে বলিব? প্রত্যেক
গোষ্ঠী এবং ক্ৰাজীৰ মতন প্রত্যেক “জাতি”রও কতকগুলো
“সামান্য লক্ষণ” আছে। এইগুলিকে জাতির “বৈশিষ্ট্য” অন্তর্গত
বিবেচনা করিতে হইবে।

১। প্রত্যেক “জাতি” একটা স্বতন্ত্ৰ জনপদের অধিকারী।
ইহার একটা বিশিষ্ট নামও আছে। জনপদ স্ববিস্তৃত। শিকার
এবং মাছ ধরার সুযোগও জমিজমার অন্তর্গত। জাতিগত জন-
পদ বা “দেশের” লাগাও জমিন কাহারও সম্পত্তি নয়। এই
“খোলা মাঠের” সাহায্যে পরবর্তী জাতি হইতে স্বাভাব্য রক্ষা করা
হয়। অনধিকৃত “উদাসীনীকৃত” জমিনটার আয়তন কখনও
ছোট, কখনও বা বেশ বড়। জাতি দুইটা যদি ভাষায় লাগ-
লাগি হয়, তাহা হইলে অল্প মাত্র “খোলামাঠের” রেওয়াজ থাকে।
কিন্তু দুইএর ভাষায় যদি কোন প্রকার সংশ্লিষ্ট না থাকে তাহা
হইলে “উদাসীন” জমিনের বিস্তৃতি খুব বেশি।

ইণ্ডিয়ান-সমাজের এই জাতিগত বা দেশগত পার্থক্যের

নিম্ন প্রাচীন জাতিগণ সমাজেও দেখা গিয়াছে। বনভূমিগুলি ছিল জাতিগণদের সীমানা বিশেষ। সীমার বলেন, যুয়েতিরা তাহাদের স্বদেশকে মরুভূমি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ডেনিশ এবং জাতিগণ জাতিগণের পার্শ্ব সাধিত হইত “ইজার্ণহোর্ট” এর দ্বারা। ইহাকে ডেনিশ ভাষায় “য়ার্ণবেড” বলে। শ্রাক্সন্দের সীমানা ছিল “জ্যাক্সেন হ্রাস্ত” (শ্রাক্সন্ বল)। শ্রাভজাতি হইতে নিজেদের স্বাভাব্য রক্ষা করিবার জন্য জাতিগণরা “ব্রাগিবর” কায়েম করিয়াছিল। এই শ্রাভ শব্দ আজকালকার “ব্রাণ্ডেনবুর্গ” প্রদেশের মূলে দেখিতে পাইতেছি।

এই ধরনের সীমানার ভিতরকার সকল জমিজমা জাতির সমবেত সম্পত্তি। অন্যান্য জাতিরা সেই জাতির অধিকার স্বীকার করিয়া চলে। এই ভূমি অন্যান্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাহার কর্তব্যের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে না বাড়া পর্যন্ত স্বভূমির সীমানা কাঠায় বিধায় নির্দিষ্ট না থাকিলেও চলে। কিন্তু চৌহদ্দি নির্দেশ করার দরকার লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ই হয়।

জাতিগুলার নামকরণ কেন হয় বলা কঠিন। নরনারীরা নিজে বাছিয়া একটা নাম গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। নাম একটা আকস্মিক অচিন্তিতপূর্ব ঘটনাবিশেষ। কোনো কোনো সময়ে নিজেরা হয়ত একটা নাম বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী জাতি তাহাকে অন্য এক নামে ডাকে। জাতিগণদের নামও তাহাদের পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রজাতির দেওয়া।

২। প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ভাষা এবং জাতি আয়ত্তনে সম্বন্ধিত। যতদূর স্বভাষা, ততদূর

স্বজাতি। আমেরিকার পুরাণে ভাষা ভাঙিয়া নয়া নয়া ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া জাতিও দেখা দিয়াছে। এইরূপে নব নব ভাষা ও জাতি র উৎপত্তি আজও চলিতেছে। কখনো কখনো দুই দুর্বল জাতি সম্মিলিত হইয়া একটা জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ব্যবস্থায় উভয়েই নিম্ন নিম্ন ভাষার ব্যবহার রক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। গড়পড়তা ২০০০ হাজার নরনারী এক একটা ইণ্ডিয়ান ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ এতগুলো লোক এক একটা জাতির অন্তর্গত। চেরোকীরা গুণ্টিতে ২৬০০০। অন্য কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশি নয়।

৩। প্রত্যেক জাতি নিজ ক্রাজীর অনুমোদিত এবং গোষ্ঠীর নির্বাচিত “সাথেম” এবং লড়াই-নায়ক কে প্রকাশ্য সভায় গদিতে বসাইবার অধিকারী।

৪। গোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধে জাতি ইচ্ছা করিলে এই নায়কগণকে বরখাস্ত করিতেও পারে। গোষ্ঠী-নায়কেরা সকলেই “জাতি-সভার” সভ্য। কাজেই তাহাদের উপর জাতির এক্টিয়ার থাকা অস্বাভাবিক নয়। জাতিগুলো আবার এক বৃহত্তর কেন্দ্রের (ফেডারেশনের) অন্তর্গত। কাজেই ফেডার্যাল-সভাও ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠীনায়কগণকে বরখাস্ত করিতে পারে।

৫। প্রত্যেক জাতি কতকগুলো সার্বজনিক ধর্মকর্ম মানিয়া চলে। অন্যান্য “বার্কার”দের মতনই ইণ্ডিয়ানরাও ধার্মিক জাতি। তাহাদের দেবদেবী-তত্ত্ব এবং রীতিনীতিগুলো সম্বন্ধে সবে মাত্র গবেষণা শুরু হইয়াছে। মানুষের আকারে তাহারা দেবদেবীর কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিমা গড়িবার যুগ

পর্যন্ত ইহারা উঠিতে পারে নাই। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শক্তিপূর্ণ আরাধনা তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার কথা। সর্বভূতে ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পথে ইহারা ধাপে ধাপে উঠিতেছে। নাচগান, খেলাধুলা সমন্বিত মজাচ্ছবের সঙ্গে প্রত্যেক জাতি যোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত। নাচ এই সকল পালা-পার্কণের বিশেষত্ব। ধর্মকর্মে প্রত্যেক জাতি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে।

৬। সার্বজনিক কাজকর্ম চালাইবার জন্য প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া সভা থাকে। এই সভায় বসে জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীনায়েকেরা। ইহারাই খাঁটি প্রতিনিধি,—কেন না ইহাদের যখন তখন বরখাস্ত করা সম্ভব। সভার কাজকর্ম চলে খোলা বাজারে। অর্থাৎ জাতির যে কোনো লোক—মেয়েরাও—সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ দিতে অধিকারী। কিন্তু বিচার এবং ব্যবস্থা করিবার এক্টিয়ার একমাত্র সভারই। প্রত্যেক বিধান “সর্বসম্মতি”ক্রমে জারি হওয়া চাই। জার্মানদের “মার্ক”-সভায়ও এইরূপ “সর্বসম্মতি”র নিয়ম ছিল। “বিদেশী” অর্থাৎ অন্তর্গত জাতির সঙ্গে—“পররাষ্ট্র” বিষয়ে—সভার কাজগুলো প্রধান ঠাই অধিকার করে। বিদেশীদের দূত গ্রহণ করা এবং গুড়াই বা সন্ধি ঘোষণা করাও সভার কাজ। স্বেচ্ছাসেবকরাই লড়াইয়ের প্রধান ফৌজ।

যে যে জাতির সঙ্গে মিত্রতার সন্ধি কায়েম হয় নাই, তাহাদের সঙ্গে জাতিমিত্রেরই লড়াইয়ের নীতি চলিতে পারে। এই ধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নামজাদা যোদ্ধারা লড়াইয়ের কাজকর্মে ভার লয়। পণ্টনের সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য

ইহারা "লড়াইয়ের নাচ" শুরু করিয়া দেয়। যে যে এই নাচে
শ্লেগ দেয় তাহারাই স্বৈচ্ছাসেবক। বাহা নাচে ষোগ, তাঁহা *
দলগঠন এবং রণযাত্রা। অপরপক্ষেও স্বয়ংসেবকেরাই "স্বদেশ"
রক্ষার ভার লয়। লড়াইয়ের যাত্রার সময় এবং লড়াই হইতে
ফিরিবার সময় দেশ শুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ এবং মহোচ্ছাব
চলে।

এমন কি "জাতিসভার" অহুমতি না লইয়াই স্বয়ংসেবকেরা
এই ধরনের লড়াই বাধাইতে পারে। তাসিতুব-বিবৃত জার্মান
সমাজেও এই ধরনের স্বয়ংসেবকনিয়ন্ত্রিত লড়াইয়ের নিয়ম
দেখিতে পাই। কিন্তু জার্মানদের ভিতর স্বয়ংসেবকের দল স্থায়ী
সংগঠনের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। শান্তির সময়ও এই দল
বজায় থাকিত।

বিপুল সেনাবাহিনী এই বিধানে দেখা যায় না। দূরদেশের
বিকক্ষে যুদ্ধযাত্রার উপলক্ষেও ইণ্ডিয়ানরা অল্পসংখ্যক ফৌজের
দলই কায়ম করিতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক দল নিজ নিজ নেতার
হুকুম তামিল করে। এই সকল নেতারা একত্রে মিলিয়া
রণনীতি এবং লড়াইয়ের কৌশল সম্বন্ধে শল্লা করে। খৃষ্টীয়
চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাইণের আলেমানি জার্মানরাও এই
প্রণালীতেই লড়াইয়ের ব্যবস্থা করিত।

৭। কোনো কোনো জাতির মাধ্যম একজন নায়ক
দেখিতে পাই। তাঁহার ক্ষমতা অবশ্য যথেষ্ট সঙ্কচিত। সাধারণতঃ
এই ব্যক্তি অল্পতম "সাধেম"। "জাতিসভা" বলিয়া ব্যবস্থা করি-
বার পূর্ব পর্যন্ত এই জাতি-নায়ক কাজ সামলাইতে অধিকারী।
মোটের উপর ইহাকে "স্থায়ী কর্মধ্যক্ষ" বিবেচনা করা বলিতে

পারে। উচ্চতম লড়ায়-নামকই পরবর্তী কালে স্থায়ী কর্মস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

সংযুক্ত-জাতি

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ভিতর একাধিক জাতি সম্মিলিত হইয়া এক একটা লীগ বা জাতিসমবায় বা “সংযুক্ত-জাতি” গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই ধরণের “সংযুক্ত-জাতি”ই ইণ্ডিয়ান সমাজ বিজ্ঞানে চরমতম কেন্দ্র।

অল্পসংখ্যক লোকের জাতিগুলি পরস্পর লড়াই করিয়া মরিত। ইহাদের অধীনে জমি থাকিত অনেক। পরস্পরের ভিতর ব্যাপ্তানও স্থানহিসাবে যথেষ্ট। এই সকল অসুবিধা এড়াইবার জন্ত মাঝে মাঝে আত্মীয় বা কুটুম শ্রেণীর জাতিরা লীগ গড়িয়া তুলিতে সূচিত। কিন্তু লীগগুলি বেশিদিন টিকিত না। আবার দুর্যোগ চলিয়া গেলেই জাতিরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িত। শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাষ্ট কোনো কোনো জাতি লীগ ভাঙ্গিয়া দিবার পরও আবার এক লীগ কায়েম করিয়াছে। ইরোকোআরা ইণ্ডিয়ানদের “সংযুক্ত-জাতি” গঠনের প্রয়াসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে ইরোকোআদের আদিম বাসস্থান। ইহারা বোধ হয় বিশাল ডাকোটা সমাজেরই এক অংশ। নানা জনপদে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে ইহারা বর্তমান নিউ-ইয়র্ক প্রদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। ইরোকোআদের পাঁচ জাতি :—সেনেকা, কাযুগা, ও নোঙগা, ও নাইডা এবং মোহক।

মাছ এবং হরিণের মাংস ইরোকোআদের প্রধান খাদ্য। আদিম ধরণের বাগান হইতে শাকসব্জীও আসে। ইহাদের পল্লীগুলি খুঁটার বেড়া দিয়া দুর্গাকারে সুরক্ষিত। ইহাদের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। কোনো কোনো “গোষ্ঠী” পাঁচ জাতির প্রত্যেকটাই বিচ্ছিন্ন। ইহাদের সকলের ভাষা প্রায় এক ভাষারই বিভিন্ন শাখা স্বরূপ। “দেশগুলি”ও পরস্পর লাগা।

পুরাণে ইণ্ডিয়ানদিগকে খেদাইয়া দিয়া ইরোকোআ ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্কের জনপদে জনপদে জুড়িয়া বসিয়াছিল। শত্রুদের উপর বিজয় লাভের ফলে ইহাদের দখল অধিকার হইয়াছে। এই কারণে,—বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—পাঁচ বিজয়ী জাতি “যাবচ্ছ দিবাকরো” এক লীগ-বা মিত্রসম্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরোকোআ “সংযুক্ত-রাষ্ট্রের” চরম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাদের তাঁবে ছিল বিপুল জনপদ। বহু নরনারী ইহাদের করনাতায় পরিণতও হইয়াছিল।

মেক্সিকো, নিউমেক্সিকো এবং পেরু এই তিন দেশের ইণ্ডিয়ানরা “বার্কার” যুগের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য আদিমবাসীরা কোনো দিন “বার্কার” অবস্থার নিম্নতর কোঠা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। নিউইয়র্ক প্রদেশের ইরোকোআ “সংযুক্ত-রাষ্ট্র” এই সকল নিম্নতর “বার্কার” সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থিতি।

ইরোকোআদের “সংযুক্ত-রাষ্ট্র” নিম্নলিখিত বিধানের পরিচয় পাই :—

১। সমরকাল পাঁচ “জাতি” চিরকালের জন্য মিত্রসম্মে

পরিণত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক জাতি পুরাপুরি স্বাধীন। জাতিগুলার ভিতর পরস্পর সাম্যও স্বরক্ষিত। রক্তের ঐক্যই এই যুক্তজাতির গোড়ার কথা। তিনটা জাতিকে জনকস্থানীয় বিবেচনা করা হইত। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া ডাকিত। 'অপর দুই জাতি ছিল সজ্ঞানস্থানীয়। ইহারাও পরস্পর ভাই স্বরূপ।

প্রত্যেক জাতির ভিতরকার "গোষ্ঠী"গুলার ভিতরও রক্তের টান বেশ স্পষ্ট। সর্বপ্রধান তিনটা গোষ্ঠী পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই জীবিত ছিল। গোষ্ঠীর লোকেরা (বিভিন্ন "জাতির" অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও) পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

আর তিনটা গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটা জাতির ভিতর জীবিত ছিল। ইহারাও পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

ভাষার ঐক্যও পাঁচ জাতিকে এক পূর্বপুরুষের এবং এক রক্তের কথা স্বরণ করাইয়া দিত। ইরোকোয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির দুর্বলতার কোনো কারণ ছিল না।

২। "সংযুক্ত-রাষ্ট্রের" জন্ম ছিল সংযুক্ত-সভা বা পরিষৎ। এই ফেডার্যাল সভায় বসিত পঞ্চাশজন "সাধেম"। ইহাদের ক্ষমতা এবং ইচ্ছা সমান সমান। যুক্তজাতি-সম্পর্কিত অর্থাৎ ফেডার্যাল সকল কাজ কর্ম সম্বন্ধেই এই পরিষদের অধিকার।

৩। যুক্তজাতি-সম্পর্কিত কাজ কর্মের জন্ম প্রত্যেক জাতিকে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীকে দায়িত্ব লইতে হইত। সেই সকল দায়িত্বের কাজে সংযুক্ত-পরিষৎ পঞ্চাশ "সাধেম"কে বহাল করিত। বস্তুতঃ ফেডার্যাল নামে এই পঞ্চাশটা পদ নয়া কার্যেয় করা হইয়াছিল। পদগুলার জন্ম কর্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠীর

অধিকার। গোষ্ঠী দ্বারা ইহাদিগকে বরখাস্ত করাও সম্ভব। কিন্তু সংযুক্ত-সভা মঞ্জুর না করিলে কোনো “সাথেম” সংযুক্ত কাজের গদিতে বসিতে পারিত না।

৪। সংযুক্ত-পরিষদের কর্মচারীস্বরূপ এই “সাথেম”রা নিজ নিজ জাতির “সাথেম”ও থাকিত। নিজ নিজ “জাতি-সভায়”ও ইহাদের আসন ছিল।

৫। সংযুক্ত-পরিষদের সকল বিধানে “সম্মতসংগতি” আবশ্যক।

৬। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ ভাবে মত দিত। অর্থাৎ “জাতি-সভার” লোকেরা সংযুক্ত-সভায় বসিয়া আলাদা আলাদা যার যেরূপ খুশী ভোট দিতে পারিত না।

৭। যে কোনো জাতি সংযুক্ত-সভার বৈঠক বসাইতে অধিকারী ছিল। আপন খেয়ালে সংযুক্ত-সভা নিজের বৈঠক ভাঙিতে পারিত না।

৮। সংযুক্ত-পরিষৎ খোলা বাজারে কাজ চালাইত। ইরোকোআ সমাজের যে কোনো লোক সভায় উপস্থিত থাকিতে অধিকারী ছিল এবং আলোচনায় যোগ দিতেও পারিত। কিন্তু ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র পরিষদের সভ্যদের।

৯। ইরোকোআ যুক্ত-রাষ্ট্রের মাথায় কোনো নায়ক বা স্বায়ী কণ্ঠাধিক্য ছিল না।

১০। লড়াইয়ের অস্ত্র দুই জন নাচকের ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের ক্ষমতা এবং কাজকর্ম একরূপ ও সমান। স্পার্টায় এই ধরণেরই দুই রাজাকে এবং রোমে দুই কনসালকে শাসন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গস্বরূপ দেখিতে পাই।

রোমাণ সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ঐতিহাসিকগণের নিকট পাইয়াছি। সেইগুলি সবই এই ইণ্ডিয়ানদের শাসন প্রণালীর অনুরূপ। যেখানে যেখানে গ্রীক ও রোমাণ জীবন বিষয়ক তথ্য কম মিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান সমাজের নজির দেখিলেই প্রাচীনতম ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারিবে।

কি অপূৰ্ণ স্বন্দর সরল এই গোষ্ঠী প্রথা! কোন ফৌজ, বরকন্দাজ, পাহারাওয়াল, নবাব, আমীর, জমিদার, রাজা-বাহুশাহ্, কোতোয়াল, হাকিম, জজ, জেল, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির দরকার হয় না। অথচ সকল কাজই চলিতেছে সিজিলমিছিল।

কগড়াবাটি সবই গোটা কেন্দ্রের—গোষ্ঠীর স্বাভাবিক অথবা জাতির শালিশীতে মীমাংসা করা হয়। রক্ত-প্রতিহিংসার বিধান আছে বটে, কিন্তু সে প্রায় এক প্রকার ব্যতিরেক বিশেষ—চরম অবস্থার ব্যবস্থা মাত্র। আজকালকার প্রাণদণ্ড তাহারই আধুনিক রূপ। বর্তমান যুগের “সভ্যতা” মাকি সকল প্রকার হু-কু ইহার সঙ্গে জড়িত।

বর্তমান কালের জটিল আমলাতন্ত্র এই সমাজে অপরিচিত। অথচ তাহার বিধানে আজকালের চেয়ে বেশি পরিমাণ সার্বজনিক কাজ সাম্ভালানো হইয়া থাকে। বাস্তবিকভাবে একাধিক পরিবার সমবেত ভাবে বসবাস করে। জমিদার গোটা জাতির সম্পত্তি। তবে বাগানগুলোকে বাস্তবিকভাবে সামিল বিবেচনা করা হয় মাত্র। অর্থাৎ সাময়িক ভাবে এই জাতিগত সম্পত্তির উপর পরিবারের ভোগস্বত্ত্ব থাকে।

মামলার বিচারে দুই দলই খোলসাতাবে সামান্যমান নিষ্পত্তি করিতে অভ্যস্ত। যুগযুগান্তরের গতাঃগতিক সনাতন নিয়মগুলাই বিচার কার্যে আইনবিশেষ। নিধন বা অভাবগ্রস্ত নামক কোন শ্রেণী এই সমাজে নাই। বুড়া, রোগী এবং অকর্মণ্য নরনারীর জন্য যৌথ সম্পত্তি হইতে ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তিমাঝেই স্বাধীন এবং পরস্পর সমান। মেয়েদের স্বাধীনতাও অজানা জিনিষ হয়। গোলামের উৎপত্তি হয় নাই। পরাধীন বাল্যাও কোনো জাতি এখানে দেখা যায় না।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইরোকোআরা “ঈরী” এবং আর এক “উনাসীন” জাতিকে হারাইয়া নিজেদের সঙ্গে সমান ভাবে “সংযুক্ত-জাতি”র সামিল করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। পরাজিতেরা এই সংযোগ বিধানে আপত্তি করায় তাহাদিগকে তাহাদের মুক্ত হইতে খেদাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগকে গোলামে পরিণত করিবার অথবা বিজিত জাতি রূপে নিজ তাঁবে রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই সমাজের নরনারী কি খাসা! যে সকল শেতাঙ্গ পর্যটক ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারা ইহাদের আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবত্তা এবং সংসাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

সাহসিকতার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগের জীবনেও অনেক পাওয়া গিয়াছে। জুলু এবং নিউবিয়ান জাতির লোকেরা বিনা বন্দুকে একমাত্র বল্লমের সাহায্যে ইয়োরোপীয় সৈন্যদিগকে কাবু করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ পণ্টন ইহাদের রণনৈপুণ্যে অনেকবার কতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য

হইয়াছে। ইংরেজরা বলে যে, এক এক কাকির চক্ষিণ ঘণ্টায় ঘোড়ার চেয়ে বেশি চলিতে সমর্থ।

সেকালের নরনারী ছিল এইরূপ। বর্তমান যুগের ধনী-নির্ধনশ্রেণী-বিভক্ত সমাজের মজুর চাকীরা, “বার্কার” যুগের গোষ্ঠীশাসিত স্বাধীন ব্যক্তিদের তুলনায়, যারপরনাই নগন্য। দু’য়ে প্রভেদ বিপুল।

কিন্তু এইখানেই সেই গোষ্ঠী-সভ্যতার সীমানা। ইণ্ডিয়ানরা জাতি-কেন্দ্রের উপরে উঠিতে পারে নাই। সন্ধির ফলে যে যে ক্ষেত্রে লীগ বা “সংযুক্ত-জাতি” গড়িয়া উঠিয়াছিল সে সকল ক্ষেত্রে একটা উচ্চতর কেন্দ্রের অধীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা চলিত। কিন্তু অপরাপর জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিত মাত্র স্বাভাবিকের। জাতির বাহিরে, অতএব গোষ্ঠীর বাহিরে, অতএব শত্রু—এই ছিল “নীতি-শাস্ত্র”। আর শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে পাশবিক নির্দয়তার যথেষ্ট ব্যবহার চলিত।

প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে ইণ্ডিয়ানরা শিখে নাই। এই জন্যই সুবিস্তৃত মহাদেশের অতি সামান্যমাত্র জনপদে অল্প সঞ্চয় নরনারীর বিকাশ সন্নিহিত হইতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের জীবনের উপর প্রকৃতি অতি ভীষণভাবে দখল বসাইয়াছিল। জগতের যা কিছু সবই তাহাদের চিন্তায় গুহ, রহস্যময়, পবিত্র। এমন কি গোষ্ঠী, কুলী, জাতি ইত্যাদি সমাজ-কেন্দ্রগুলোও যেন প্রকৃতির গড়া প্রতিষ্ঠান, অতএব প্রণয়া, সকল অবস্থায়ই স্বীকার্য। এইরূপ ছিল তাহাদের চিন্তাপদ্ধতি, ইহাই তাহাদের ধর্মের ভিত্তি।

“বার্কার” যুগের গোষ্ঠীশাসিত জনসমাজগুলো সর্বত্রই এইরূপ

ইরোকোয়াদের গোষ্ঠী প্রথা ১৪৫

প্রকৃতির দাস। কোনো একটা জাতিকে অপর কোনো জাতি হইতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। শিল্পের মতন প্রত্যেকের নাড়ীই আদিম প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সমাজ জগতের সর্বত্রই ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোষ্ঠী-প্রথার পরিবর্তে “সভ্যতার” জগতে আসিয়াছে কি বস্তু ? ধনী নিধন প্রভেদ, অর্থ-পৈশাচিকতা, পরনিপীড়ন এবং সমবেত সামাজিক ধন-দৌলতের উপর দুইচারদশজনের প্রভুত্ব। সেকালে আর একালে কি প্রভেদ ? গোষ্ঠী-সমবায় বনাম “শ্রেণী”-বিরোধ।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীক সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা

মাকাতার আমলের গ্রীক নরনারী

প্রাচীন গ্রীসে নানা জাতি বসবাস করিয়াছে। গ্রীক, পেনাস্‌গিয়ান ইত্যাদি নামে এই সকল জাতি অভিহিত। বোধ হয় ইহারা সকলে একই জাতির বিভিন্ন শাখা বা বংশধর।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজে যে ধরনের শাসন-প্রণালী দেখা যায় মাকাতার আমলের গ্রীক-সমাজেও সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল। গোষ্ঠী, ক্রাট্রী, জাতি এবং “সংযুক্ত-জাতি” বা জাতি-সম্ম এই চার প্রকার পর পর উচ্চতর কেন্দ্রে তাহাদের সার্বজনিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত।

এই চার কেন্দ্রের কোনো কোনোটা কোনো কোনো গ্রীক সমাজে হ্রাস বা ফুটিয়া উঠে নাই। কিংবা ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না। জেরীর সমাজে ক্রাট্রী দেখিতে পাই না। অনেক কেন্দ্রেই “সংযুক্ত-জাতি” বা জাতি-সম্ম নামে কেন্দ্রীয়াল কেন্দ্র গড়িতে পারে নাই। কিন্তু সর্বত্রই গোষ্ঠী-প্রথা চল ছিল।

গ্রীকেরা যখন ইতিহাসের দ্বারায় পা দেয় তখন তাহারা সর্বদা কালের “সাম্রাজ্য” এবং “বার্কার” তর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। “উৎকর্ষের” যুগে তখন তাহাদের জীবন যাত্রা

প্রবেশ করিতেছিল। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজের সর্বোচ্চ কোঠায় আর এই সকল গ্রীক সমাজে বেশ বড় ছই ধাপ তফাৎ। “বীরযুগের” গ্রীকেরা ইরোকোআদের চেয়ে এই ছই ধাপ উচুতে অবস্থিত ছিল।

এই কারণে ইরোকোআদের আদিম ধরণের গোষ্ঠী-প্রথা গ্রীক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। দলগত যৌন-সম্বন্ধ বা বিবাহ গ্রীসে এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। “জননী-বিধি”র ঠাইয়ে পুরুষাধিপত্য পাকাপাকি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত ধনদৌলত বা নিজ স্বপ্রথা সম্বন্ধে মাথা তুলিতেছিল।

স্বদেশের নিয়মে,—উত্তরাধিকার লইয়া একটা নূতনবড় দেখিতে পাই। পুরুষ-বিধি অহুসারে সম্পত্তিশালিনীর ধনদৌলত তাহার স্বামীর প্রাপ্য। অর্থাৎ কস্তার গোষ্ঠী হইতে সম্পত্তি অপর এক গোষ্ঠীতে চলিয়া বাইতে বাধ্য। কিন্তু এই নিয়ম পছন্দসই ছিল না। গোষ্ঠীর এক্টিয়ার বজায় রাখিবার জন্য নিয়ম করা হইয়াছিল যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে নিজ গোষ্ঠী হইতেই স্বামী গ্রহণ করিতে হইবে।

এইখানে গোষ্ঠী-প্রথার গোড়ার কথাই চাপা পড়িয়াছিল। কেননা গোষ্ঠীর সনাতন বিধানে সমরসুজ্ঞদের ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্পত্তির নববিধানের খাতিরে যৌন সম্বন্ধে বিপ্লব সাধন করিতে নরনারীরা কুণ্ঠিত হয় নাই।

গ্রোটের গ্রহে গোষ্ঠী-লক্ষণ

আটিকা গ্রহেশের (আথেনিয় সমাজের) গোষ্ঠী-প্রথা আলোচনা করিতে বাইয়া ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রোট তাঁহার

এসিদ্ধ “গ্রীসের ইতিহাস” গ্রন্থে যে সমাজ-বন্ধন বিবৃত করিয়াছেন তাহার চিত্র নিম্নরূপ।

১। কতকগুলি সার্বজনিক ধর্মকর্ম অঙ্গীকৃত হইত। গোষ্ঠীর প্রবর্তক স্বরূপ কোনো পূর্বপুরুষকে দেবতা বিবেচনা করা হইত। এই দেবতাকে এক বিশিষ্ট নামে পূজা করিবার ব্যবস্থা ছিল। পুরোহিত, পূজার আয়োজন ইত্যাদি সবই গোষ্ঠীর পক্ষে সার্বজনিক।

২। গোষ্ঠীর ভ্রাতৃ এক সার্বজনিক গোরস্থান থাকিত (সেমোথেনিসের “ইউবুলিডেস্” ভ্রষ্টব্য।)

৩। গোষ্ঠীর ব্যক্তির পরম্পর উত্তরাধিকারস্বত্বে সম্পত্তি ভোগ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইত।

৪। অত্যাচার উপদ্রব ইত্যাদির সময় গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরম্পর সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিত।

৫। অভিভাবকহীন মেয়েদের সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভ্রাতৃ এবং অন্তঃস্থ বিশেষ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ভিতর জনগণের পরম্পর বিবাহ বিধিসম্মত কর্তব্য বিবেচিত হইত।

৬। গোষ্ঠীর অধীনে খানিকটা সার্বজনিক সম্পত্তি থাকিত। এই সম্পত্তির জন্য একজন সার্বজনিক তত্ত্বাবধায়কও বহাল হইত।

একাধিক গোষ্ঠীর মিলনে ক্রাটীর উদ্ভব হইত। কিন্তু ক্রাটীর বন্ধনগুলো বিশেষ রূপে শক্ত ছিল না। তবে কতকগুলি ধর্ম এবং সামাজিক কাজকর্মে ঐক্য রক্ষিত হইত। বিশেষতঃ ক্রাটীর কোনো ব্যক্তি কোনো উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং অগণের হাতে মারা পড়িলে তাহার প্রতিহিংসা লওয়া গোটা ক্রাটীর কর্তব্য থাকিত।

জাতির অন্তর্গত ক্রাট্রীওলা সকলে মিলিয়া কতকগুলি ধর্মসংক্রান্ত পালা পার্কণ রক্ষা করিত। এইগুলি জাতি-নারক “কিলোবাগিলিউন্” কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। এই নায়ককে “ইউপাত্রিকেস্” বা সহায় শ্রেণী হইতে বাছাই করিবার ব্যবস্থা ছিল।

এই পর্য্যন্ত গেল গ্রোটের কথা। এইখানে মার্ক্‌স্ টিল্লনী কাটিয়া বলিতেছেন :—“স্কাহ্লেজ (যথা ইরোকোআদের) রীতিনীতি গ্রীক গোষ্ঠীর ধরণ-ধারণে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।” এই মতের সপক্ষে আরও প্রমাণ আছে।

গ্রীক গোষ্ঠীর অন্তান্ত লক্ষণ নিয়ে বিবৃত হইতেছে :—

৭। বংশ এবং উত্তরাধিকার বাপের নামে চলিত।

৮। গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। একমাত্র ব্যতিরেক ঘটিত যখন কোনো মেয়ের উত্তরাধিকারে খনদৌলভ প্রচুর আসিত। এই অবস্থায় মেয়েকে নিজ গোষ্ঠী হইতে পাড় টুঁড়িতে হইত। কিন্তু এই ব্যতিরেক হইতেই সাধারণ নিয়মটী রক্ষা যাইতেছে।

বিবাহের সাধারণ নিয়ম অন্তান্ত রীতি হইতেও বুঝা যায়। কোনো নারী বিবাহের পর নিজ অর্থাৎ বাপের বাড়ীর ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর গোষ্ঠীর রীতিনীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত। স্বামীর ক্রাট্রীতেই নারীর নাম লেখানো ছিল সাধারণ দস্তর। অগোষ্ঠীর বাহিরেই যে বিবাহ অবশ্যকর্তব্য এই কথা “দিকায়ার্কস্” এবং “চারিক্লেস্” ইত্যাদি গ্রন্থে স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়।

৯। গোষ্ঠীতে “বিশেষীকে” পোষ্যরূপে নিজের করিয়া

লইবার নিয়ম ছিল। সার্বজনিক ঘটনা করিয়া কোনো কোনো পরিবারকে এইরূপ পোষ্য গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত। কিন্তু পোষ্য-প্রথার রেওয়াজ সু-বিদ্যুত ছিল না।

১০। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করিয়া “আর্কান” বা নায়ক থাকিত। নায়ক বাছাই এবং বরখাস্ত করা গোষ্ঠীর তাঁবে ছিল। বাপের পর ছেলে এই পদের অধিকারী হইত বলিয়া কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। “বার্কার” যুগের শেষ পর্যন্ত বংশ-পরম্পরায় নায়কত্বের উত্তরাধিকার বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। তখনকার দিনে ধনীনিধনের অধিকার যখন সমান ছিল তখন কোনো এক পরিবারে গোষ্ঠী-নায়কত্ব একচেটিয়া হওয়া অসম্ভাবিক।

পরিবার-কেন্দ্র গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের মূল নয়

গোষ্ঠীর ত কথাই নাই, নীবুর, মম্মেন ইত্যাদি জাতিগণের গ্রীক ঐতিহাসিকগণও গোষ্ঠী-প্রথায় ফেল মারিয়াছেন। ইহারা এইটা একদম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সকলেই প্রাচীন গ্রীক সমাজের মোটা কথাগুলো তথ্য হিসাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। গোষ্ঠীকে ইহারা কতকগুলো পরিবারের দল বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আসল কথা পরিবার গোষ্ঠী-প্রথার কেন্দ্র বা গোড়ার জিনিষ নয়। প্রত্যেক পরিবারে হুই বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তি,—পুরুষ এবং স্ত্রী,—সমবেত হইত। কাজেই পারিবারিক কেন্দ্র আধাআধি পুরুষের গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আধাআধি স্ত্রীর গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন-বিষয়ক আইনেও পরিবারের কোন ঠাই ছিল না।

বস্তুত: আজ পর্যন্ত জুনিয়ার কোথায়ও “পাবলিক ল” অর্থাৎ রাষ্ট্র-শাসন সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থায় পরিবার নামক কেন্দ্রের কোনো ঠাই নাই। “প্রাইভেট ল” অর্থাৎ প্রজা বা ন্যায়িক জীবন বিষয়ক আইনে পরিবারের দাবীদাওয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে মাত্র।

এইখানেই উনবিংশ শতাব্দীর নামজাদা ঐতিহাসিকগণের মত ভুল প্রমাণিত হইতেছে। ইহারা পরিবারকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল সম্বিয়া ছিলেন। অধিকন্তু এই পারিবারিক প্রথাকেও তাহারা এক-পতি-(পত্নী) রূপে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই অবৈজ্ঞানিক মত পণ্ডিত মহলে চলিয়া আসিতেছে।

মার্কস পণ্ডিতগণের ভুল দেখাইয়া বলিতেছেন:—“গ্রোট মহাশয়ের লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, গোষ্ঠী-প্রথাটা গ্রীকেরা তাহাদের দেবদেবীতন্ত্রের জন্মকাল পর্যন্ত পেছনে লইয়া গিয়া ঠেকাইয়াছে। বস্তুত: এই প্রথা তাহারও আরও পশ্চাতে জন্মিয়াছিল। দেবদেবীদের জন্মকথা এবং দেবদেবী-বিষয়ক “পুরাণ” সাহিত্য সবই গোষ্ঠীদের গড়া মাল।”

গ্রোটের ভুল

মর্গ্যানের মতে গ্রোট একজন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বটে। এই কারণে গ্রোটের সাক্ষ্যই মর্গ্যানের আলোচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রোট বলেন:—“আটিকার প্রত্যেক গোষ্ঠীর নামকরণ তাহার প্রবর্তক পুরুষের নাম হইতে অঙ্কিত হইত। আধেনিয় স্বত্বিকার সোলোনের আমলে পূর্বে এবং পরেও

গোষ্ঠীর লোকেরা উইল না করিয়া মরিলে তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত গোষ্ঠী। কোনো ব্যক্তি ম্রু হইলে ম্রুীর বিব্রুে নাশিত করিতে অধিকারী ছিল প্রথমে তাহার আত্মীয়বর্গ, পরে গোষ্ঠীর লোক এবং ক্রান্তী। প্রাচীনতম আধুনিক নীতিশাস্ত্রের সকল বিধানই গোষ্ঠী এবং ক্রান্তী কেন্দ্রের জীবন কথাই পরিস্ফুট করিতেছে।”

মার্ক্স বলেন :—“একই পুরুষের সম্মান স্বরূপ যে এই গোষ্ঠী তাহার তত্ত্ব বুদ্ধিয়া উঠা পাঠশালার পণ্ডিতমূর্খদের ধাতে কুলায় নাই। ইহারা ত প্রথমেই এই উৎপত্তির কাহিনীকে অলৌকিক গল্প ধরিয়া লইয়াছিলেন। তারপর পরম্পর সম্বন্ধহীন ভিন্ন ভিন্ন পরিবারগুলি কেমন করিয়া গোষ্ঠী সৃষ্টি আবদ্ধ হইল তাহার কারণ অহুদজ্ঞান করিতে যাইয়া পণ্ডিতমহাশয়েরা গলদদর্শ হইয়াছেন।”

কিন্তু গোষ্ঠী-প্রথাকে কোনো না কোনো উপায়ে ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। ব্যাখ্যা করিবার কোনো পথ না পাইয়া শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা নানা বাকবিতণ্ডার পর “নয্যে নতহে” রূপে মন্তব্য কাড়িয়াছেন :—“হাঁ, গোষ্ঠী একটা নিরেট সত্য বস্তুই বটে। তবে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে একটা তথ্য-কথিত আদি-পুরুষের দোহাই দেওয়া হয় সে একদম গীজাখুরি গল্প মাত্র।”

থ্রোটের চরম কথা এই :—“বস্তুতঃ এই আদি পুরুষ হইতে গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনাই অনিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র সার্বজনিক পালাপার্কণ, মহোজ্ঞাব ইত্যাদি উপলক্ষ্যেই এই তথ্য জনগণের ভিতর আত্মপ্রকাশ করে।”

মার্ক্সের টিগ্ননী টিটকারি

গ্রোটের অকৃতকার্যতাকে ঠাট্টা করিয়া মার্ক্স গোষ্ঠী-প্রথার ওকালত পণ্ডিত-সমাজে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রোট বলিতেছেন :—“ছোটখাটো গোষ্ঠীগুলোও নামজাদা গোষ্ঠীদের মতনই কতকগুলো সার্বজনিক ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে। একজন আদি পুরুষ হইতে নিজেদের উদ্ভব স্বত্বকেও ইহারা নাম-জাদাদের মতনই দৃঢ় ধারণা পোষণ করে।”

মার্ক্সের টিটকারি :—“বড়ই বিষয়জনক ! কি বলেন, গ্রোট মশাই ?” “আ ! সে কি ? এমন কি নেহাৎ অপ্রসিক গোষ্ঠীগুলার ধারণাও এইরূপ ! বড়ই আশ্চর্যের কথা !”

গ্রোটের বক্তব্য :—“সকল গোষ্ঠীরই বনিয়াদ এবং আদর্শ একরূপ।”

মার্ক্সের ঠাট্টা :—“আজ্ঞে ! গ্রোট মশাই, এ নেহাৎ আদর্শ মাত্র নয়। গোষ্ঠী স্বত্বকে খাঁটি আধিভৌতিক, বাস্তব বা বাস্তবাত্মিক তথ্যই এই।”

মর্গ্যানও গ্রোটের সমালোচনায় এইরূপই বলিয়াছেন। মার্ক্স এই উপলক্ষ্যে আবার বলিতেছেন :—“গোষ্ঠী ধরনের রক্তের ঐক্যের কথা অন্যান্য সমাজের মতন গ্রীক-সমাজেও পরম্পরের আত্মীয়তা দৃঢ় বন্ধনে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নরনারীরা শৈশব হইতেই এই নিকট স্বত্বের কথা শিখিয়া রাখিত।”

“পরে যখন এক-পতি-পত্নী-ক পরিবার দেখা দেয় তখন এই আত্মীয়তার স্তরগুলো আর লোকের মনে ছিল না। তবে গোষ্ঠী-

গত নামের ইচ্ছা এবং সঙ্গে সঙ্গে বংশলতিকার কিম্বৎ কেহই তুলিতে পারিত না।”

“এই অবস্থায় গ্রোট্‌ এবং নীবুর ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণের পক্ষা অহুসরণ করিয়া গোষ্ঠীর ভিতরকার আত্মীয়তাগুলি অস্বীকার করা অথবা এইগুলিকে একটা আজগুবি কল্পনাপ্রসূত বা মনগড়া কুটূষ সম্বন্ধ বিবেচনা করা একমাত্র কল্পনা-প্রবণ বিজ্ঞানবীর অথবা কেতাবকীটের পক্ষেই সাজে! অতি পুরাণো কালের আদি-পুরুষের কথা এক-পতি-পত্নীকষের আমলে গোষ্ঠীর লোকেরা তুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতমূৰ্খেরা আগাগোড়া সকল তথ্যই ভুলো বা কাল্পনিক সম্বন্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।”

ক্রাজী ও জাতি

গ্রীকদের ফ্রাজী ইরোকোআ এবং অস্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ক্রাজীর মতনই কতকগুলো গোষ্ঠীর সমবায় গড়া জননী-গোষ্ঠী স্বরূপ ছিল। একই পুরুষপুত্র হইতে সকলগুলার উৎপত্তির ইতিহাস ক্রাজী সম্বন্ধেও পরিস্ফুট হইত। গ্রোট্‌ বলেন :—“হেকাতেরাস ক্রাজীর সকল সমসাময়িক নরনারী যোল পুরুষ উর্ধ্বে অবস্থিত কোনো আদি-দেবতার বংশধর। এই কারণে এই ক্রাজীর অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলো পরস্পর ভাই বিশেষ।”

হোমারের কাব্যে নেস্তর আগামেয়নকে পরামর্শ দিতেছেন :—
“কৌজগুলোকে ক্রাজী ও জাতি হিসাবে সাজাও। ক্রাজীরা পরস্পর এক সঙ্গে থাকিবে আবার জাতিরাও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে।”

ক্রাজীর অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি “বিদেশী”র হাতে মারা

পড়িলে গোটা ক্রাজী তাহার “রক্ত-হিংসা” নহেতে ব্যথা। এই ছিল সাবেক কালের গ্রীক নীতি। অধিকন্তু ধর্মকর্মের কার-
বারেও ক্রাজী কতকগুলো সার্কজনিক প্রথা মানিয়া চলিত।
প্রাচীনতম “আর্য্য” প্রকৃতি-পূজার বিবিধ অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গ্রীক
সমাজের গোষ্ঠী এবং ক্রাজীদের কৃতিত্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ক্রাজীর মাথায় এক নায়ক থাকিত। তাহার নাম
“ক্রাজিয়ার্খোস্”। ফরাসী পণ্ডিত দ’কুনাশ্ বলেন :—“ক্রাজী
সভাসমিতি করিয়া বিধিনিষেধ জারি করিত। এইগুলো মানিয়া
চলা ক্রাজীর অন্তর্গত লোকজনের কর্তব্য বিবেচিত হইত।”
পরবর্তী কালে যখন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে তখন গ্রীকেরা তাহাদের
গোষ্ঠীগুলোকে সার্কজনিক শাসন বিধে একপ্রকার তুলিয়াই
গিয়াছিল। কিন্তু তখনও ক্রাজীর তাঁবে কতকগুলো সরকারী
অধিকার বজায় ছিল।

গ্রীক-সমাজে কতকগুলো ক্রাজীর সমবায়ে জাতির উৎপত্তি
হইত। আটিকার ছিল চার জাতি। প্রত্যেক তিন ক্রাজীতে
বিভক্ত। আবার প্রত্যেক ক্রাজীর গোষ্ঠী সংখ্যা ত্রিশ।
এই ধরনের অঙ্ক কথিয়া সংখ্যা ঠিক করিয়া দল বাধাবাদি হইতে
মনে হয় যে, আধেনিয় নরনারী কৃত্রিম উপায়ে সমাজে প্রাকৃতিক
ক্রমবিকাশের সমাজ-বিজ্ঞানে পরিবর্তন সাধন করিতেছিল।
ঠিক কখন এবং কেন এইরূপ সাধিত হইয়াছিল ইতিহাসে তাহার
প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীকদের জীবনন্বতি ঐতিহাসিক
তথ্যের দিক দিয়া “বীরঘূষের” উর্দ্ধে গিয়া ঠেকে নাই।

গ্রীকদের দেশ ছিল অতি ক্ষুদ্র। লোকেরা বসবাস করিত
অতিশয় শ্বেৎশার্বেশি ভাবে। কাজেই ইহাদের ভিতর তাহার

প্রভেদ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই সকল হিসাবে গ্রীকদের অবস্থা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমেরিকার মতন মহাদেশে সহজেই বিভিন্নতার সৃষ্টি হইত। কিন্তু এমন কি গ্রীসেও প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যেই সমাজে ঐক্য দেখা যাইত। গ্রীক ভাষাভাষী জাতিগুলি পরস্পর সামাজিক ঐক্যমূর্ত্তি গ্রহিত হইত। আটিকা প্রদেশের ভাষা কালে গ্রীক-গদ্য-সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়।

হোমারের মহাকাব্যে “ট্রাইব” বা জাতিগুলিকে “নেস্তন” বা জাতিসমবায়ের পরিণত দেখিতে পাই। কিন্তু তখনও প্রত্যেক গোষ্ঠী, ক্রাজী এবং জাতি নিজ নিজ বিশেষত্বগুলি বৰ্দ্ধন করে নাই। দেওয়াল-ঘেরা নগরে তাহারা জীবনযাপন করিত। পশুচারণ, কৃষিকর্ম এবং হস্তশিল্পের দ্বারা ধনোৎপাদন সাধিত হইত। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও বাড়িতেছিল। সম্পত্তির বিতরণে একটা অসাম্য উপস্থিত হইতেছিল। তাহার ফলে বড়লোক, গরীবলোক, সম্ভ্রান্ত্রণী, নিঃশ্রমণী ইত্যাদি জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল।

হোমার-সাহিত্যের “নেস্তন”-গুলি পরস্পর কামড়াকামড়ি করিতে অভ্যস্ত ছিল। লড়াইয়ের উদ্দেশ্য এক,—সর্বশ্রেষ্ঠ জনপদসমূহ নিজ নিজ তাঁবে আনা। যুদ্ধের বন্দীরা গোলামে পরিণত হইত।

হোমার-সাহিত্যের “জাতি”-শাসন

সেকালের শাসন-প্রণালী মোটের উপর নিম্নরূপ :—

১। প্রত্যেক জাতির সার্বজনিক সভা থাকিত। সভার

নাম “বুলে।” প্রথম প্রথম প্রত্যেক গোষ্ঠী-নাগরক (আর্কন) জাতি-সভায় বসিতে পাইত। পরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় গোষ্ঠী-নাগরকদের ভিতর বাছাই করিয়া কয়েকজনকে সভায় টাই দেওয়া হইত।

বাছাইয়ের ফলে ধনী, সম্ভ্রান্ত, বা কুলীন শ্রেণীর প্রতিনিধি সমাজে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। “বীরযুগে”র জাতি-সভাকে দিয়োনিসিওস্ খোলাখুলি “ক্রান্তিস্থ” অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদের বৈঠক-রূপে বিবৃত করিয়াছেন।

সকল বিষয়ে এই সভার মতই চরম বিবেচিত হইত। এম্মিলিসের নাটো থিব্‌স্ দেশের সভায় নির্ধারিত হয় যে, এতেওফ্‌লেসের শবকে সগৌরবে কবর দেওয়া হইবে। কিন্তু সেই সভার বিচারেই পলিনিকেসের দেহ সংক্ষেপে কুকুরে খাওয়ার দায় দেওয়া হয়।

গ্রীক-সমাজে “রাষ্ট্র” পড়িয়া উঠবার পর জাতি-সভা “সেনেট” প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

২। প্রত্যেক জাতিই সার্বজনিক আলোচনার ব্যবস্থা করিত। এই ক্ষণে সভার রেওয়াজ ছিল। এইরূপ সভাকে “আগোরা” বলিত। আমেরিকার ইরোকোয়া সমাজে নরনারীরা যেকোনো কেন্দ্রের বিধিসম্মত সভায় উপস্থিত হইয়া বাহাদুরবানে যোগ দিতে পারিত। হোমারের গ্রীক-সমাজে এইরূপ যোগদান পাকাপাকি প্রতিষ্ঠানের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। সাবেক কালের আশ্মাণ-সমাজেও এই ধরনের সর্বজন-সভা দেখিতে পাই।

“বুলে”ই এই “আগোরা”র বৈঠক ভাষিত। মজলিশে যে কোন লোক যতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী ছিল।

এসবিলসের “নিবেদক” নাট্যে দেখিতে পাই যে জনগণ হাত তুলিয়া ভোট দিতেছে। অল্পক্ষণ করিয়া ভোট দিবার ব্যবস্থাও ছিল। “আগোরার” সিদ্ধান্তই ছিল শেষ সিদ্ধান্ত।

জার্মান পণ্ডিত ভ্রম্যান-প্রণীত “গ্রীসের পুরাতন বিবরণ গ্রন্থে” জানিতে পারি যে,—কোনো বিষয় আলোচনা করিবার সময় জনগণের স্বাধীনতা পুরা মাত্রায় বজায় থাকিত। জোর অবরুদ্ধ করিয়া কাহাকেও কোনো মত গ্রহণ করাইবার কোনো প্রকার ব্যবস্থা হোমারীর সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ তখনকার দিনে প্রত্যেক লোকই ছিল যোদ্ধা। কাজেই এইরূপ সমাজে জনগণের অতিরিক্ত এমন কোনো কেন্দ্র ছিল না যাহার দ্বারা তাহাদিগকে কাবু করা সম্ভব হইতে পারিত। সাম্যমূলক গণতন্ত্র বোল কলায় পূর্ণ ছিল। এই কথা মনে রাখিয়া “বুলে” এবং “বাসিলিউন্স” বা জাতি-নাযকের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে মত প্রচার করিতে হইবে।

১। প্রত্যেক জাতির রণ-নাযক থাকিত। তাহার নাম “বাসিলিউন্স”। মার্ক্স বলেন,—“ইয়োরোপের বিজ্ঞানসেবীরা অধিকাংশই রাজরাজড়াদের পোষ্য অর্থাৎ অল্পভোজী গোলাম বিশেষ। কাজেই ইহারা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রীক-সমাজের “বাসিলিউন্স”কে “রাজা” বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ানি পণ্ডিত মর্গ্যান রিপাব্লিক বা গণতন্ত্রের নাপরিক। তাহার মতে ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ গ্রীক “বাসিলিউন্স” সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন।

মর্গ্যান বলিতেছেন :—“ব্রাড্‌টোন ‘বুকেল্ডন্স মূন্সি’ গ্রন্থে “বীরযুগে”র গ্রীক নায়কগণকে একদম রাজরাজড়া, আধীরওমরাহ

রূপে দাঁড় করাইয়াছেন।—যেন ইহারা আজকালকার ‘জেন্ট্‌লমেন’ নামধারী বাবু-সমাজ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রথম সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্রের দাবীদাওয়া বিদ্রূপক বিধান সম্বন্ধে পাকা প্রমাণ না পাইয়া হতাশ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।”

ইরোকোআ এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান-সমাজে “সাধেম” এবং রণ নায়কগণ নির্দোচিত হইত। সকল সার্কজনিক পদেই গোষ্ঠীর লোকেরা বাছাই করিয়া কর্মচারী বহাল করিত। গোষ্ঠীর ভিতরেই বংশাচক্রমে পদগুলি অধিকৃত হইত। সাধারণতঃ ভাই বা ভাগ্নে উত্তরাধিকারস্থলে পদের অধিকারী ছিল। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটিলে নায়ক-নিয়োগের এই নিয়ম ভঙ্গ করা হইত না।

“বাসিলিউস্” ও “রাজ”-পদ

গ্রীসে দেখিতেছি : “বাসিলিউসে”র পদে পুত্রেরই অধিকার ছিল। ইহাতে অঙ্কমান করা চলে যে,—সার্কজনিক বাছাইয়ের দলে পুত্রেরই কপালে উত্তরাধিকার জুটিত। জনগণের ভোট ছাড়া কখনো কেহ এই পদ অধিকার করিতে সমর্থ হইত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বংশাচক্রমে নেতৃত্ব বা নৃপত্বের গোড়াক্স এই ধরনের সার্কজনিক বাছাইয়ের রীতি গ্রীক সমাজে লক্ষ্য করিতে হইবে।

(১)

কম্বেকম্ “বুলে” এবং “আগোরা” এই দুই প্রতিষ্ঠানের সম্মতি “বাসিলিউস্” নির্বাচনের সময় অবশ্য গ্রহণীয় ছিল।

প্রাচীন রোমের “রেক্স” (বা “রাজা”) ও এই ধরণেই নিকীচনের অধীন জননায়ক বিশেষ। বংশগত রাজত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল,—পরবর্তী কালে।

“ইলিয়াদ” নামক গ্রীক মহাকাব্যে আগামেয়ন সকল গ্রীক জাতির অধীশ্বর নন। ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব প্রধান সেনাবলের সম্মুখ নায়ক রূপে তিনি শত্রুর নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। গ্রীকদের মধ্যে যখন মল্লাদলির প্রভাবে বগড়া দেখা দিয়াছিল তখন ওদিসিউস বলিতেছিলেন :—“বহু ব্যক্তির শাসনই বহু অনিষ্টের মূল। কোনো একজনকে শাসনকর্তা ও নায়ক সাব্যস্ত করা হউক।” ওদিসিউস শাসন প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন নাই। তিনি সকল গ্রীক জাতিকে কোনো এক নিশ্চিষ্ট সেনাপতির হুকুম তামিল করিতে উপদেশ দিতেছিলেন মাত্র।

ঐ নগরের সম্মুখে যে সকল গ্রীকে দেখিতে পাই তাহারা সকলেই যোদ্ধা। সকলেই রণবেশে সজ্জিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। কিন্তু এই লড়াইয়ের সময়েও সেকালের গ্রীকেরা সাম্য, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলিতেছিল। “আগোরা”র সম্মিলনে সমানে সমানে কথাবার্তার পরিচয় পাই। লড়াইয়ে পাওয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগবাটোআরা সম্বন্ধে আগামেয়নের এক-তিয়ার একদম নাই বলিলেই চলে। সকল ক্ষেত্রেই আধিনেসু “আকেআনদের পূজগণের” অর্থাৎ সমগ্র জনসাধারণের হাতে এই একুতিয়ার দিয়াছেন দেখিতে পাই।

(২)

আগামেয়নকে “জিউসের (বা মহাদেবের) বংশধর” অথবা “জিউসের প্রতিপালিত” ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই কারণে ইহাকে “মহতী দেবতা হেমা” বুলিতে হইবে না। কারণ প্রত্যেক গ্রীক গোষ্ঠীই এইরূপে কোনো না কোনো দেবতার সন্তান বিবেচিত হইত। অবশ্য “জাতি”-নামকের গোষ্ঠী কোনো বড় রকমের দেবতা (যথা জিউস) হইতে উৎপন্ন এইরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল।

দেবতা হইতে উৎপন্ন হওয়া গ্রীক-সমাজে একটা বিশেষ কিছু নয়। এমন কি শূকর-পালক ইউমেঅস্ এবং অস্ফাল্ল ব্যক্তিগত স্বাধীনতাবিহীন লোকেরাও “দেবসন্ত” (“দিয়োই” বা “থেয়োই”) বিবেচিত হইত। “ওদিসি” গ্রন্থ “ইলিয়াড” হইতে নবীনতর। এমন কি এই মহাকাব্যেও এই ধরণের দেবতা হইতে উৎপত্তির কাহিনী অতি মামুলি কথা। মূলিতস্ নামক মকীব এবং দেমোদোকোস্ নামক অঙ্গগায়ককেও “ওদিসি” গ্রন্থে “হেরোস্” বা বীর রূপে বিবৃত করা হইয়াছে।

“রাজা” কাহাকে বলে ?

কার্ল মার্কস্ প্রাচীনতম গ্রীক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—“হোমার-বিবৃত রাষ্ট্রকে তথাকথিত রাজতন্ত্র রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এইরূপ করা ভুল। “বাসিলিয়া”র বিধানে নামক রণক্ষেত্রে অনেকটা সর্কসর্কা সন্দেহ নাই কিন্তু “বুলে” এবং সার্কজনিক সভা এই দুই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কোনো মতেই কম নয়। কাজেই “বাসিলিয়া”কে সামরিক ক্ষমতা বিবেচনা করিলেই সেকালের সমাজ সম্বন্ধে বথার্থ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে।”

“বাসিলিউস্” একমাত্র সেনানায়ক ছিল এরূপ আনিবার কারণ নাই। ধর্মসংক্রান্ত পুরোহিতের কাজ এবং বিচারপ্রতির কাজও তাহার এলাকার অন্তর্গত। বিচারবিষয়ক অস্থানগুলি সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মকানুন দেখিতে পাই না। কিন্তু “জাতি” বা “জাতি-সমবায়” নামক যুক্ত দলবাদের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে “বাসিলিউসে”র পুরুতগরি অনিবাহ্য।

সাধারণ শাসনসংক্রান্ত কাজকর্মে “বাসিলিউসে”র এলাকা ছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু “বুলের” অধিবেশনে তাঁহার ঠাই থাকার অসম্ভব নয়।

“বাসিলিউস্” শব্দের তর্জমায় আধুনিক ইয়োয়োগীদ্যানরা “রাজা” শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। এই তর্জমা নেহাৎ ভ্রমাত্মক নয়। একটা গোষ্ঠীর সর্কার বলিলে যাহা বুঝা যায় রাজা-বাচক শব্দের ধাতুও সেই অর্থই প্রকাশ করে। কিন্তু বর্তমান জনগণের সমাজেও রাষ্ট্রে রাজপদের অধিকারীর যে ঠাই প্রাচীন গ্রীসের “বাসিলিউস্” নামক জননায়কের সেই ঠাই বুঝিতে গেলে মহা গোলে পড়িতে হইবে।

গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডিডিস্ “বাসিলিয়া”কে “পাত্রীকে” অর্থাৎ গোষ্ঠী-সম্বৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্তব্য ছিল। দার্শনিক আরিস্তটলও “বাসিলিয়া”কে স্বাধীন জনগণের “নেতৃত্ব” বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় “বাসিলিউস্” ছিল সেনাপতি, বিচারক এবং পুরোহিত। কাজেই আধুনিক হিসাবের “শাসন কার্য” “বাসিলিউসের” একতিয়ানে ছিল না বুঝিতে হইবে।

(২)

আধুনিক পণ্ডিতেরা গ্রীক-সমাজের “বাসিলিউন্স”-পদ বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন। প্রাচীন মেক্সিকোর আজ্‌তেক রণ-সর্দার সম্বন্ধেও ইহারা ঠিক এইরূপ ভুলই করিয়াছেন। আজ্‌তেক রণ-সর্দার ইহাদের তর্জমায় রাজা বিশেষ। মর্গ্যান এই বিষয় ভুল খরাইয়া দিয়াছেন। তুলটার জন্ত প্রধানতঃ স্পেনিষ পর্যটক ও সেনাপতিরাই দায়ী। ইহারা আজ্‌তেকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে কতকগুলো ভ্রমাত্মক মত রটাইয়াছিল।

মর্গ্যান বলেন—“মেক্সিকোর আজ্‌তেকরা “বার্কার” সভ্যতার মধ্যম স্তরে অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো প্রদেশের পুয়েরো নামক ইণ্ডিয়ান অগেঞ্চা আজ্‌তেক জাতি উচ্চতর কোঠায় উঠিয়াছিল। স্পেনিষ লেখকদের বিবরণগুলো হইতে আজ্‌গুবি কাহিনী, অসং এবং গীজাখুরি গল্প বাহ দিয়া সকল দিক দেখিয়া গুনিয়া মনে হয় যে— আজ্‌তেকরা তিনটা জাতির সমবায়ে একটা সংযুক্ত-জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সংযুক্ত-জাতির অধীনে কতকগুলো করদ-জাতি বসবাস করিত। সংযুক্ত-জাতির শাসন-কর্তা ছিল এক ফেডার্যাল বা সংযুক্ত-দরবার। লড়াইয়ের জন্ত এক ফেডার্যাল সেনাপতিও বহাল থাকিত। এই সেনাপতিকেই স্পেনের পর্যটক-লেখকেরা সম্রাট খেতাবে ভূষিত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

রোমানীয়-সমাজ “প্রাক-রাষ্ট্রীয়” জীবন-কেন্দ্র

“বীরযুগে”র গ্রীক-সমাজে সাবেক কালের গোষ্ঠী-প্রথা

বেশ সজীবই দেখিতে পাইতেছি। তবে ইহার ধ্বংস-সাধক শক্তিগুলার গোড়াও পাকড়াও করিতে পারিতেছি। “পুরুষ-বিধি,” পিতৃশ্রদ্ধে পূজকভাগধের অধিকার, এবং পরিবারের ভাবে সম্পত্তিসংরক্ষণ,—এই সকল ব্যবহার কলে গোষ্ঠীর একত্বের ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ধন-সম্পত্তির অসাম্যের দরুন পরিবারে পরিবারে ছোটবড়, উচ্চনীচ ইত্যাদি ভেদ জন্মিতেছিল।

এই ভেদই বংশগত কৌলীন্য বা আভিজাত্য এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দাস বা গোলামী দেখা দেয়। প্রথমতঃ, লড়াইয়ের স্বামীরা গোলামে পরিণত হয়। পরে গোটা জাতি বা গোষ্ঠীগুলার দাস-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে।

পূর্বে দাসা চলিত জাতিতে জাতিতে। ক্রমে এই দাস-প্রিয়তা পার্শ্ববর্তী সমাজের সম্পত্তি লুটপাট করিয়া নিজ দখলে আনিবার প্রয়াসে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে থাকে। “বিদেশী”দের পত্ত, দাস এবং ধনদৌলত কাড়িয়া খাওয়া গ্রীক-সমাজের স্বভাবে পরিণত হইতেছিল। ধনের “লালচ” গ্রীক জাতিকে গোষ্ঠী-প্রথা উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী করিয়াছিল। কিন্তু তখনও গোষ্ঠীর মোহাই দিয়াই পরজাতি-লুণ্ঠন অচলিত হইত।

প্রাচীনতম গ্রীক-সমাজেই গোষ্ঠী-প্রথা ভাঙিবার অল্পকাল শক্তির উৎপত্তি দেখিতে পাই। কেবল একটা জিনিষের তখনও অভাব ছিল। ধনসামগ্রীর বিধান ভাঙিয়া লোকেয়া ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ধনদৌলতের ব্যবস্থা করেন করিতেছিল। কিন্তু এই নবীন সম্পত্তিকে সাবেক কালের

গোষ্ঠী-ধর্মের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তখনও কায়েম হয় নাই।

এই “নবীন সম্পত্তি”কে “মাক্কাতার আমলে” অতি জবজ্বলি বিবেচনা করা হইত। এক্ষণে ইহাকে পবিত্র, ধর্ম-সম্বন্ধ, জ্ঞাত্য এবং মানব-সমাজের উন্নতি-সাপেক্ষরূপে প্রচারিত করিবার জন্য একটা “পাঁতির” দরকার হইতেছিল। সেই “পাঁতি” হেমোর-বিবৃত সমাজে পরিষ্কাররূপে দেখা দেয় নাই।

অধিকন্তু তখনকার দিনে নিত্য নতুন রকমের ধনদৌলত দেখা দিতেছিল। সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন ঠাইয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। এই সকল রকমারি সম্পত্তি এবং পুঞ্জিকে সমগ্র সমাজে “সনাতন” এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সভ্যতামূলক ও স্বীকার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি তখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

এক কথায় ধনগত অসাম্য অর্থাৎ শ্রেণী-ভেদ এবং নির্ধনের উপর ধনবানের-পোষারি এই সকল নীতির দ্বারা শাসিত সমাজকে চিরস্থায়ী করিবার যত্ন বা কৌশল তখনও দেখা যায় না। কিন্তু সেই যত্ন দেখা দেয় দেয় হইয়াছিল। সেই যত্ন বা কৌশলকেই বলে “রাষ্ট্র”।

পঞ্চম অধ্যায়

আধেনিয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া-চুরিয়া মানব-জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীর কোনো কোনো অঙ্গ একদম তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গগুলার কথঞ্চিৎ পরিবর্তন মাত্র সাধন করা দরকার হইয়াছিল।

গোষ্ঠী হইতে খাটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটাইতে অনেক কাল লাগিয়াছে। সাবেক কালে জনগণ গোষ্ঠী, জাতী এবং জাতি, এই তিন কেন্দ্রে অনেকটা স্ব স্ব প্রধান ভাবে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল। এই সকল কেন্দ্র তুলিয়া দিয়া তাহাদের ঠাইয়ে রাষ্ট্রকে বসাইয়া মানব-সমাজ এক নতুন অভ্যাসের জন্ম দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে “স্বদেশ” রক্ষা করিবার ক্ষমতা আসা জগতে এক বিপুল বিপ্লব বিশেষ। এই ক্ষমতা এক্ষণে “বিদেশী” শত্রুদের বিরুদ্ধে কায়েম হইতে পারে এমন নয়। স্বদেশের জনসাধারণকে দাবিয়া রাখিবার জন্তও এই রাষ্ট্রগত সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলার জন্ম ও শৈশব প্রাচীন আধেনির ঘটনাবলীতে অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। আধেনিয় সমাজের প্রস্তুতকৃত এই কারণে নৃতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষ কাজে লাগে। মর্গ্যান গোষ্ঠী হইতে রাষ্ট্রের জন্ম বুঝাইবার জন্য আধেনিয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই স্তর-পরম্পরা এবং

রূপান্তর বা ক্রমবিকাশের বৃত্তান্তে আর্থিক অর্থাৎ ধনদৌলত বিষয়ক তথ্যগুলো বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সেই দিকে মর্গ্যানের দৃষ্টি বেশি ছিল না। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় সেই অভাব পূরণ করা হইতেছে।

“বীরযুগ”

প্রাচীনতম অর্থাৎ “বীরযুগ”র কথা ধরা যাউক। তখনকার দিনে আধেনিয়গণ চার “জাতি”তে বিভক্ত ছিল। আটকা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই চার জাতি বসবাস করিত। জাতিগুলো বিভক্ত ছিল বার ফ্রাত্রীতে। ফ্রাত্রীগুলোও সেক্রোপস জনপদের ভিন্ন ভিন্ন বার নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। “বীরযুগ”র অন্তর্গত যেমন—আটিকায়ও “আগোরা” নামক সার্কজনির সভা এবং “বুলে” নামক পরিষৎ এই দুই প্রতিষ্ঠান জনগণের শাসন চালাইত। “বাসিলিউস” নামক লড়াই-নায়ক ছিল শাসন-পদ্ধতির তৃতীয় অঙ্গ।

যতদূর পর্য্যন্ত লিখিত ইতিহাসের নজির ঠেকানো যায়, ততদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে, জমিজমা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব রূপে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। “বার্কার” সভ্যতার উচ্চতম স্তরে ধনদৌলত এবং শিল্পবাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। শস্ত্র, মদ এবং তেল ছিল প্রধান দ্রব্য। ঈজিয়ান সাগরের বাণিজ্য ফিনিসিয় জাতির তাঁব হইতে আধেনিয়দের হাতে আসিয়া পড়িতেছিল।

ভূমি-সম্পত্তির কেনাবেচা চলিত বেশ স্বাধীনভাবে। কৃষি এবং শিল্প এই দুই ভিন্ন ভিন্ন পথে ধনসঞ্চয় হইত প্রচুর পরিমাণে।

জাহার উপর ব্যবসায় এবং নৌচালন এই দুই পথও আর্থিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নরনারীরা স্ব-স্বচ্ছন্দতা এবং সম্পদ বাড়াইবার নানা কৌশল কাজে লাগাইতে লাগাইতে শ্রমবিভাগ-নীতির নিয়মে অনেকটা বিশেষজ্ঞ বা ওস্তাদের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। লোকজনের মধ্যে লেনদেন, শ্রব্য-বিনিময়, কর্মের আদান-প্রদান বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলতঃ সাবেক কালের গোষ্ঠী, ক্রাদ্রী এবং জাতি নামক তিনটা স্ব স্ব প্রধান কেন্দ্রের সীমানাগুলি ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই সীমানা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর মেশামেশি অনিবার্য। এমন কি এই তিন কেন্দ্রের বহির্ভূত (অতএব সেকালের বিচারে “বিদেশী”) বহু লোক কেন্দ্রগুলার অন্তর্গত এবং স্বগ্রামের বাসিন্দারূপে “সনাতন” আর্থেনিয়-সমাজের সামিল হইতেছিল।

কিন্তু এই নবাগত নরনারীদিগকে তখনও পুরাপুরি “স্বদেশী” বা স্বসমাজের লোক বলিয়া স্বীকার করা হইত না। গোষ্ঠী, ক্রাদ্রী এবং জাতি নিজ নিজ শাসন-কার্য্যে এই সকল “অতিথি-নাগরিক” দিগকে কোনো এক্টিয়ার দিত না। ইহারা তখনও সনাতন কেন্দ্রের পুরা অধিকারী বিবেচিত হইত না।

কাজেই একটা হ-ব-ব-ব-ল এবং সামাজিক গৌজামিল চলিতেছিল। গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠাতে বোল আনা শৃঙ্খলা বজায় রাখা আর সম্ভবপর হয় না। “বীরযুগে”ই গোষ্ঠী-প্রথার ডাউন সেখা দিয়াছিল। “ধর্ম্মস্ত মানি” এবং “অভ্যুত্থান-মধর্ম্মস্ত” প্রকট হইতেছিল। এই অবস্থায়ই “যুগপ্রবর্তক” থিসিউস দেখা দেন। জাহার নামে একটা শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রাথেলের “স্বধর্ম্মে” এই এক বড় কথা।

থিসিউস্-সংহিতা

থিসিউসের বিধানে একটা কেন্দ্রীকৃত শাসন-ব্যবস্থা বন্ধ হয়।
এতদিন জাতিগুলি স্ব স্ব ঐশ্ব্যান ভাবে যে সকল কাজকর্ম
করিতেছিল, তাহার অনেকগুলো এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের তাঁবে
আসিল। আথেন্স একটা সমষ্টিতে—বৃহত্তম সমষ্টিতে পরিণত
হইল।

আমেরিকার ইরোকোয়া বা অন্ডাশু ইণ্ডিয়ান-সমাজে এই
ধরণের “শাসন”-কমতায়ুক্ত কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই।
এইখানেই আর্থেনিয় এবং ইণ্ডিয়ান-সমাজে ক্রমবিকাশের প্রভেদ।
ইণ্ডিয়ান-সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি মিলিয়া একটা ফেডার্যাল
বা সংযুক্ত-জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল সত্য। কিন্তু থিসিউসের
বিধানে একটা সংযুক্ত-জাতি মাত্র গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে
একটা ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীকৃত উচ্চনীচ-স্তরশীল “শাসন-সমষ্টি” উৎপন্ন
হইতে পারিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আইন বা “ধর্ম” সম্বন্ধেও যুগান্তর দেখা দেয়।
যাবেককালে ছিল গোষ্ঠী, ক্রাজী ইত্যাদির নিজ নিজ স্বত্তি ও
নীতি-শাস্ত্র। অর্থাৎ আটকায় চলিতেছিল এক সঙ্গে বহুবিধ
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বধর্ম। থিসিউসের ব্যবস্থায় সমগ্র আর্থেনিয়
সমাজের সমস্ত একটা সমষ্টিগত কাহ্নন জারি হইল। এই কাহ্নন
পুরাণে গোষ্ঠীগত কাহ্ননগুলো ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

থিসিউস্-সংহিতার জোরে আথেন্সে এক বিপুল “ধর্ম” বিপ্লব
হাঘী ঘর করিয়া বসিল। আথেন্সের নরনারীরা স্ব-গোষ্ঠী,
স্ব-ক্রাজী এবং স্ব-জাতির এলাকার বাহিরেও কতকগুলো দাবী-

মাওয়া এবং বিধি-নিবেশের সামিল হইতে পারিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আথেনিয় সমাজের বহির্ভূত বিদেশী, অজ্ঞাতকুল-শীল, “রেজ” ইত্যাদি ধরণের লোকও আথেলে খাটি স্বদেশী বা গোঁড়া আথেনিয়দের ইচ্ছা এবং অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হইল। এক কথায়, গোষ্ঠী-প্রথার পঞ্চদ-প্রাপ্ত ঘটিল।

এই গেল থিসিউসের প্রথম কীর্তি। আর এক কীর্তি দেখিতে পাই আথেনিয় সমাজের শ্রেণী-বিভাগ-করণে। সাবেক কালের গোষ্ঠী, ক্রাজী এবং জাতি এই তিন কেন্দ্রের পরিবর্তে নতুন ধরণের তিন কেন্দ্র থিসিউস-সংহিতার বিশেষত্ব। একটীর নাম “ইউপাত্রিদে”। ইহার অভিজাত শ্রেণীর লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম “গেওমোরাই”; ইহার চাষী। তৃতীয় শ্রেণীকে বলে “দেমিউর্গেয়” বা ব্যবসায়ী। পুরাণে তিন জীবন-কেন্দ্রের সঙ্গে এই নয়া তিন শ্রেণীর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

থিসিউসের বিধানে “ইউপাত্রিদে” বা কুলীনেরাই সরকারী পদের একমাত্র অধিকারী। এই এক্টিয়ার ছাড়া অভিজাতদের আর কোনো বিশেষ অধিকার ছিল না। আইনের চোখে তিন শ্রেণীর লোকই অন্তান্ত সকল হিসাবে স্বাধীন এবং সমান বিবেচিত হইত।

তবে এই সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের কাণ্ডে কতকগুলো নতুন শক্তি-সমাবেশের প্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছি। সাবেককালে গোষ্ঠী, ক্রাজী ইত্যাদি কেন্দ্রের সার্বজনিক পদগুলো বংশোদ্ধমিকরূপে অধিকৃত হইত। কতকগুলো পরিবার এই অধিকার প্রায় একচেটিয়ারূপে ভোগ করিতেছিল। এই প্রথার বাধা দিবার অথবা ইহার

বিকল্পে প্রতিবাদ করিবার কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া যাইবার সমসমকালে এই সকল অধিকার বিশিষ্ট পরিবারগুলো প্রভুত ঐশ্ব্যের মালিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব ধনদৌলতওয়ালা বংশ গোষ্ঠীর বাহিরে একটা ধনিক বা অভিজাত বা কুলীন শ্রেণী গড়িয়া তুলিতেছিল। থিসিউস-সংহিতায় এইরূপ অভিজাতশ্রেণীকে “ধর্মসম্বৃত” বা জ্ঞাত্যরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আধেনিয় “রাষ্ট্র”র জন্মকালে ধনপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব বা বিশিষ্ট অধিকারভোগ জনগণের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

আর এক কথা ধনোৎপাদনের প্রণালী যথেষ্ট বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল। কৃষাণ নরনারীদের কার্যকলাপ আর বণিক ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা দুই ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচিত হইত। অধিকন্তু, এই দুই ধরনের ধনস্রষ্টাদের প্রভাব সমাজে বিশিষ্টরূপেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ সাবেক কালের গোষ্ঠী ইত্যাদি বৈশ্বমণ্ডলীকে মানব-জীবনের স্বথবিধানের তরফ হইতে আর বেশি সম্মান করা হইত না। কাজেই আধিক হিসাবে এক নবীন শ্রেণী-বিভাগ থিসিউস-সংহিতায় অবশ্য কর্তব্যই বিবেচিত হইয়াছিল।

থিসিউসের বিধানে সনাতন গোষ্ঠী-প্রথা ভাঙিয়া গেল। একটা “নতুন কিছু” দেখা দিল। সাবেক কালের স্বধর্মের ঠাঁইয়ে মাঝা তুলিল এক নয়া স্বধর্ম। এই “নতুন-কিছু”র নাম “রাষ্ট্র”।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র একসঙ্গে থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইবামাত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব-

লোপ, এই তথ্যই প্রতিষ্ঠা করিতেছে। বতদিন গোষ্ঠী সম্বন্ধ ছিল, ততদিন রাষ্ট্র দেখা যায় নাই। যেই রাষ্ট্রের জন্ম হইল, অমনি গোষ্ঠী ভাঙা হইয়া গেল। রাষ্ট্রে গোষ্ঠীতে আদায় কাচ-কলার সম্বন্ধ।

গোষ্ঠীর ভাঙনটা আর একটুকু তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। এই ভাঙনের প্রথম কথা রক্তের ঐক্য বা সমতা সম্বন্ধে ঐক্যবাদের বা অবজ্ঞা। লোকেরা রক্তের টানকে একটা বড় কিছু বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা দলে দলে রেবারেয়ি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আড়াআড়িই নবীন ধর্মের লক্ষণ হইল।

দ্বিতীয় কথা, শ্রেণী-ভেদ এবং শ্রেণী-বিবাদ। একদল হইল ক্ষমতামূলক “অধিকারী”। অপরদল হইল ক্ষমতাহীন “অনধিকারী”। অধিকারীদের শ্রেণীর সঙ্গে অনধিকারীদের শ্রেণীর দ্বন্দ্ব গোষ্ঠী-ভাঙনের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। অনধিকারীরা চাষী এবং ব্যবসায়ী এই দুই আর্থিক শ্রেণীতে বিভক্ত।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে রক্তের টানের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং আর্থিক দলাদলি আধুনিক সমাজের মজাগত হইয়া পড়িয়াছিল। থিসিউস-সংহিতা আলোচনা করিবার সময় এই তথ্যটা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

রাগ-কানুন

থিসিউসের পরের যুগে “বাসিলিউসে”র পদ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী হইতে “আর্কন” বা রাষ্ট্র-নাযক বাছাই করা হইত। প্রমোদে তাহাদের প্রতিপত্তিও ছিল অনেক।

কুলীনদের বাড়াবাড়ি চরমে গিয়া ঠেকিতেছিল। বৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ সালে ইহা একপ্রকার অসম্ব হইয়া উঠিয়াছিল।

আধেন নগরের ভিতর এবং আশেপাশে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের আড্ডা ছিল। সম্ভ্র-বাণিজ্য এবং সম্ভ্র-ভাকাইতির সাহায্যে ইহারা ধন সঞ্চয় করিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নগর কাঁচা টাকা তাহাদের হাতে থাকিত অনেক। কিয়ান সমাজে এই টাকা ধার দিয়া তাহারা একসঙ্গে নিজেদের ধনবৃদ্ধিও করিত, আবার জনগণের উপর অত্যাচার চালাইতেও সমর্থ হইত। একে মুজার দৌরাখ্যা, তাহার উপর সুদখোর মহাজনদের প্রভুত্ব। এই দুই দফায় কৃষিজীবী সাবেক কালের সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

টাকার প্রচলনের সঙ্গে গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠান খাপ খায় না। কৃষিপ্রধান গোষ্ঠী-সমাজ ধনপতি সুদজীবীদের পাল্লায় পড়িয়া উচ্ছন্ন গেল। সুদজীবীরা কর্ক দিবার সময় জমিজমা বন্ধক লইতে সুরু করিয়াছিল। লগ্নি আর বন্ধকির কারবারে মহাজনেরা জাতি-কুটুম্ব, রক্তের টান, এক কথায় গোষ্ঠী, ক্রান্তী ইত্যাদি সম্পর্কের কথা মুখেও তুলিত না, বলাই বাহুল্য।

টাকা ধার পাওয়া, সম্পত্তি বন্ধক রাখা, ইত্যাদি কারবার “মাক্কাতার আমলে” জানা ছিল না। গোষ্ঠীর শাসনে অভ্যস্ত নরনারী এই ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা বুঝিতেই পারিত না। কাজেই উত্তমর্গ অধমর্গের সম্বন্ধ আধেনিয় সমাজে এক “নববুগ” আনয়ন করিল। এই নয়া সামাজিক সম্বন্ধের অসুস্থ নয়া আইন জারিও দরকার হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি টাকা ধার লইতেছে, সে মাক্কাতার টাকা

কথামত্রে কিরিয়া দিতে বাধ্য,—এইরূপ কাহ্ননের সাহায্যে মহাজনে বাধিয়া রাখা হইতেছিল। এই আইনে কিবাণরাই রোটার উপর খনপতি কুলীনদের তাঁবে আসিয়া পড়িতেছিল। আটিকা প্রদেশের প্রত্যেক পল্লীতেই জমির উপর বহুকির “হাসপত” স্বরূপ খুঁটা গাড়া থাকিত। তাহার দ্বারা বুঝা যাইত কোন্ জমিনের জন্ত কোন্ কিবাণ কোন্ মহাজনের নিকট কতটা কবী। অনেক জমির উপর এই ধরণের বহুকির খুঁটা দেখা যাইত না বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই, যে সেগুলো “দেউলিয়া” কিবাণেরা মহাজনদের নিকট বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সে যুগের জগৎ-কাহ্নন আধেনিয়দের পক্ষে যারপরনাই কষ্টকরই ছিল। বহুকির ফিরাইয়া পাওয়া কিবাণদের কপালে এক প্রকার ঘটিয়াই উঠিত না। অধিকন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র দেউলিয়া কিবাণদের ভোগে আসিত। তাহাও মহাজনদের দয়া-সাপেক্ষ। অবশিষ্ট সবই মহাজনদের প্রাপ্য বিবেচিত হইত।

বহুকির-জমি বেচিয়া ধার শোধ করা অসম্ভব হইলে কিবাণেরা নিজ পুত্রকন্যাগণকে বিদেশীদের নিকট বোঁচতে বাধ্য হইত। মহাজনের সেনা কোনো মতেই রেহাই হইত না। “পুরুষ-বিধি” এবং “এক-পতি-পত্নী-দ্বৈ”র ব্যবস্থায়ই সন্তান-বেচা মানব-সমাজে শুরু হইয়াছে। কিন্তু ছেলেগুলো বেচিয়াও ধার শোধ করা অসম্ভব হইলে স্বয়ং কিবাণদিগকে বেচিয়া টাকা উদ্ধার করা উত্তমূর্ণদের পক্ষে “ধর্মসঙ্কত” বিবেচিত হইত। “রাট্টের” উদ্যাকাল আধেনিয় সমাজে এইরূপ স্রমধুর দৃষ্টের সাক্ষী।

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থায় এইরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড অবশ্যই
হইত। ইণ্ডিয়ান-সমাজে আধুনিকদের এই রকম প্রকৃতি
হয় নাই। সেই সমাজের আর্থিক প্রচেষ্টার ধনীনিধন,
ঘেনাদার পাওনাদার, ইত্যাদি সমস্ত বিকশিত হইতে পারে
নাই। প্রকৃতির শক্তিগুলিকে খুব বেশি নিজের তাঁবে আনা
ইরোকোআদের ক্ষমতার কুলায় নাই। তাহারা নিজ কৃতিত্বের
এবং অধ্যবসায়ের সীমা সর্বদাই দেখিতে পাইত। ছোট ছোট
ক্ষেত্রের ফসল এবং হ্রদ নদীর মাছ ও বনের জানোয়ার ইত্যাদি
জীবের পরিমাণ তাহাদের অশানা ছিল না। এই জগার
বাড়তি-কমুতিতে তাহাদের সমাজে একটা ভয়ানক রকমের
সমাজবিপ্লব ঘটিত না; কারণ তাহারা কখনই ধনোৎপাদনের
নেশার আত্মগারা হইয়া অতিবৃদ্ধির পূজা করিত না। আর্থিক
স্বপ্ন-অভ্যুদয়। সমস্ত তাহারা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডী মানিয়া
চলিতে অভ্যস্ত ছিল। এই সীমানা ছাড়াইয়া উঠিবার ক্ষমতা
তাহাদের কোঁক দেওয়া যাইত না।

“বাকার” যুগের সভ্যতার এই এক মস্ত স্বলক্ষণ। “উৎকর্ষের”
যুগের সভ্যতার মাহুৰ আর স্বপ্ন-অভ্যুদয়ের সীমা বা
ধনোৎপাদনের গণ্ডী স্বীকার করিয়া চলে না। এইখানেই
বস্তু অনর্থের গোড়া। বর্তমান যুগে মানবশক্তি প্রকৃতিকে
দাসীতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার ফলে স্বপ্নের
লোকে অনেক বাড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা স্বাধীনভাবে
দলবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই ধনবৃদ্ধি ও দল-গঠনের যুগে
“বাকার” যুগের “সংযম” বা স্বপ্নের সীমা স্বীকার করা অসম্ভব
কি? সে যুগে প্রমিতেরা নিজেই ধনোৎপাদনের সীমা নির্ধারণ

করিয়া দিত। আজ যদি শ্রমিকদের আবার সেই ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে “উৎকর্ষের” বৃদ্ধি তাহার প্রধান দোষ হইতে অব্যাহতি পায়।

কিন্তু গ্রীক-সমাজে এই সীমা বা গভীর তোআকা রাখা হইত না। জানোয়ারের মালিকেরা এবং বিলাস-দ্রব্যের অধিকারীরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজারে লইয়া ঘাইয়া কেনাবেচা শুরু করিয়াছিল। এতদিন যে সকল জিনিষ বাস্তবিক পক্ষে মালিকের “নিজ পরিশ্রমের ফল”রূপে পরিচিত ছিল, সেইগুলি এখন “বাজারের মাল” বা “পণ্যদ্রব্য” মাত্রে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য, এই ধরণের “মালের” সঙ্গে আসল শ্রমিক বা উৎপাদকের সংযোগ কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। “মেহনতের ফলে” আর “মালে” যে প্রভেদের কথা বলা হইতেছে, এই প্রভেদেই ইণ্ডিয়ান আর আধেনিয় অর্থাৎ গোষ্ঠী আর রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানে প্রভেদ। এইখানে একটা বড় বিপ্লবের গোড়া টুঁড়িয়া পাইতেছি।

উৎপাদনকারীরা যখন নিজ মেহনতের ফল নিজে ভোগ না করিয়া এইগুলি অস্ত্রান্ত্র লোকের মেহনতের ফলের সঙ্গে অদল-বদল করিতে লাগিয়া গেল, তখন আর তাহারা নিজের কাজের উপর পূরাপূরি প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারিল না। নিজ পরিশ্রমের ফল কোথায় কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে সম্বন্ধে তাহাদের আর কোনো জানাশুনাই সম্ভবপর হইল না। বরং এই জিনিষগুলি তাহাদের হাত ছাড়া হইবামাত্র এইগুলি ব্যবহার করিয়া সমাজের কোনো কোনো লোক তাহাদিগকে নানা অসুবিধায়ই ফেলিতে পারে, এইরূপ অবস্থা ঘটিতেছিল।

সমাজে আর্থিক “বিনিময়”প্রথার কুফল এই প্রথম দেখা দিল।

উৎপাদনকারীর বিরুদ্ধে তাহার নিজ মেহনতের উৎপন্নস্বত্ব অতি অল্পকালের ভিতরেই আথেনিয় সমাজে প্রকৃষ্ট বিস্তার করিতে থাকে। মেহনতের ফল যেই বাজারের মালে পরিণত হইল, তখনই দেখা দিল টাকা বা মুদ্রা। বাজারের বিনিময় সহজসাধ্য করিবার জন্তই মুদ্রার জন্ম। এ এক অতি সহজ, সরল আবিষ্কার সন্দেহ নাই, কিন্তু যে যন্ত্র প্রত্যেক কেনাবেচার কাজে লাগে, যে যন্ত্রের নিকট সমাজের আপামর সকলেই মাথা নোয়াইতে বাধ্য, সে যন্ত্র নেহাৎ সহজ সরল নয়। ইহার দৌরাণ্ডো এবং স্রষ্টাচারে আথেনিয় নরনারী উত্তম-পুস্তম হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সনাতন গোষ্ঠী-সমাজ টাকার আবিষ্কারে বাধা দিতে পারে নাই। অথচ কেনাকোচা, ধার দেওয়া, ধার লওয়া, বন্ধকি ইত্যাদি সমাজিক সম্বন্ধের নয়া নয়া অহুষ্ঠান গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হজম করা অসাধ্য। এই অবস্থায় এক মাত্র অতীতের দোহাই দিয়া কি আর “সেকাল”কে ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে? মুদ্রা এবং ঋণতন্ত্র দুনিয়া হইতে ভাবুকতার জোরে তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইল না। এই আবিষ্কারগুলো আথেলে খাটি বাস্তব শক্তির “আকারেই জুড়িয়া” বসিয়াছিল।

অতএব কঃ পশ্চাৎ? গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান এইবার “খাটে উঠিলেন।” এতদিন ধরিয়া গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সমাজের আজ আঙুল মটকাইতেছিল, কাল ঠ্যাং ভাঙিতেছিল, পরশু চোখ কানা হইতেছিল। থিসিউসের আগে-পরে সর্বদাই নানা দিক,

হইতে গোষ্ঠীর ভাঙন চলিতেছিল। সেই ভাঙনই এক্ষণে চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে লোকের অজ্ঞাতসারেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে শিকড় গাড়িতেছিল। জম-বিভাগের নিয়মে নগর ও পল্লীর পার্থক্য সৃষ্ট হইয়াছিল। নগরের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল বিভিন্ন দলের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আটিকায় নানা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল।

দেশের ভিতর নানা প্রকার সার্বজনিক সরকারী পদ বা চাকুরির উৎপত্তি হইতেছিল। সামরিক বিভাগ এক স্বতন্ত্র পুষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছিল। দেশরক্ষার জন্য অথেনিয় সমাজে সর্বপ্রথমে নৌসেনা কায়েম হয়। প্রত্যেক “জাতি”কে বারটা “নৌকারিয়া”য় বিভক্ত করা হইয়াছিল। “নৌকারিয়া” নামক “সামরিক জেলা”গুলি প্রত্যেকে একটা করিয়া রণতরীর সম্পূর্ণ ভার লইতে বাধ্য থাকিত। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই দুই জন করিয়া ঘোড়-সওয়ার জোগাইবার জন্য মোতায়েন ছিল।

“নৌকারিয়া” প্রথায়ও গোষ্ঠীর গোড়ায় কুড়াল চালানো হইতেছিল। এতদিন ছিল সমাজের সকল লোকই দেশরক্ষার এবং ষণ্ড দিবার কাজে অধিকারী। এই নয়া ব্যবস্থায় “সরকারের” হাতে একটা বিশিষ্ট দল এবং বিশিষ্ট দণ্ড-ক্ষমতা আসিল। এই দল এবং এই ক্ষমতা যে-কোনো স্বার্থান্ধির জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব। অধিকন্তু, পূর্বে চলিত জাতি-কুটুম্ব অনুসারে জনগণের সরকারী ভাগা-ভাগি। কিন্তু এই ব্যবস্থায়

রক্তের টান আর বজায় থাকিল না। তাহার ঠাইয়ে আসিল “স্থানহিসাবে” বা বাস্তুভিটার তরফে কেন্দ্র-গঠন।

গোষ্ঠীর আমলে ধনীনির্ধন ভেদ ছিল না। এক শ্রেণী আর্থিক হিসাবে নির্ধ্যাতিত হইতেছে, অথবা পরের লাভের জন্য নিজে মেহনত করিয়া মরিতেছে, এবং আর এক শ্রেণীর লোক পরের রক্ত শুষিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, এই ধরণের দৃশ্য গোষ্ঠী-সমাজে অসম্ভব ছিল। কিন্তু খ্রিস্টসেতের যুগে এবং পরে নির্ধ্যাতিত প্রপীড়িত দুঃখী বলিয়া এক প্রকার শ্রেণী দিন দিন বাড়িতে থাকে। তাহাদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা গোষ্ঠীর নাই। এই রক্ষাকার্য্যে আশ্রয়ান হইল রাষ্ট্র। সোলোনের শাসন-পদ্ধতি নবযুগের নবীন সমস্তার মীমাংসা করিয়াছে। সোলোন আর্থেনিয় সমাজের আর এক যুগাবতার। সে প্রায় ৫৯৪-৬০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের কথা।

যুগাবতার সোলোন

টাকার চলন এবং ঋণের আইন এই দুই কারণে তখনকার লোকেরা কষ্ট পাইতেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব সমাজে যারপরনাই উৎপীড়নের কারণ হইয়াছিল। এই কারণে সোলোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষমতা কমাইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। ধনী মহাজনদের সম্পত্তি বাড়াইবার পথ আটক করিয়া দরিদ্র জন-গণের সম্পত্তি কোনোমতে বাঁচাইয়া রাখা সোলোন-নীতির আসল কথা। সোলোন আইনজারি করিয়া উত্তমর্গদের ঋণগুলো তামাদি ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঋণগ্রস্তেরা রেহাই পাইল।

সোলোন সমাজ সংস্কারক মাত্র নন। তিনি কবিতা রচনাও

হাত দেখাইয়াছেন। সোলোন-সংহিতায় যে সকল কথা স্পষ্টরূপে জানা যায় না, তাহার কিছু কিছু আন্দাজ করা যায় সোলোনের গাথা সমূহ হইতে। তাঁহার আইনের ফলে জমির উপরকার বন্ধকির দাসখত-স্বরূপ শুল্কগুলি উঠিয়া গিয়াছিল। যে সকল কিশোর জমিজমা ও বাস্তুভিটা ছাড়িয়া বিদেশে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল, অথবা ঋণের জন্ত গোলামরূপে বিক্রী হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে সোলোনের আইন স্বভূমিতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

যে কোনো রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে এইরূপ বিপ্লবসাধন এক মহাকীর্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, সোলোন খোলাখুলি স্বত্ব বা নিজস্ব ধনদৌলতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। গরীবদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া তিনি ধনবানদের প্রতি বেআইনি বা অবিচার করিয়াছেন।

মজার কথা,—রামার ধন শ্রামাকে অথবা পদার ধন হরাকে দেওয়াই সোলোনের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভিতরকার কথা। কোনো যুগ-প্রবর্তক বা সমাজ-সংস্কারকই একজনকে না মারিয়া আর একজনকে বাঁচাইতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-বিপ্লবেও এই কাণ্ডই আবার দেখা গিয়াছে। জমিদারের মধ্যযুগ-মান্বিক ধনদৌলতকে দাবিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা নবরূপের “বুর্জোয়া” মহাজনী সম্পত্তিকে মাথা তুলিতে স্বেযোগ দিয়াছে। এক হাতে লুটিয়া লওয়া, ডাকহুতি বা বাজেয়াপ্ত করা, অপর হাতে ধনদান, জলদান, বিজ্ঞাদান ইত্যাদি ধরণের ধনরান্ধি বা পরোপকার সূৰ্পে-সূৰ্পে নানা আকারে দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির

বিধানে মানুষ জনগণকে স্থখী করিবার আর কোনো কৌশল আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া নরনারী এই এক পথেই চলিতেছে।

কৰ্জ্জুলা তামাদি হইবার কলে কিষাণেরা গোলামী হইতে অব্যাহতি পাইল। সোলোন-নীতি একমাত্র এইখানেই ধামে নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে আবার কোনো লোক এইরূপ গোলামে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও সোলোনের এক কীর্তি। প্রথম কথা হইল এই যে, কোনো ব্যক্তি টাকা খার লইবার সময় নিজেকে বন্ধক রাখিতে পারিবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোনো ব্যক্তিই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশি নিজ দখলে আনিতে পারিবে না। এই উপায়ে এক দিকে রক্ষা পাইল আথেনিয় কিষাণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অপর দিকে বাধা পাইল ঋণপতিদের ভূমি-লিপ্সা।

শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সোলোনের সংস্কারগুলোও উল্লেখযোগ্য। পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক জাতি হইতে এক-শ' করিয়া সভ্য আসিবে, এইরূপ নিয়ম হইল। আথেলের পরিষদে এই উপায়ে চার-শ' ব্যক্তির ঠাই হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, সোলোন সাবেক কালের “জাতি”-কেব্রটা বজাই রাখিয়াই চলিয়াছিলেন।

কিন্তু অগ্রান্ত বিষয়ে সোলোন-নীতিতে পুরাণে “স্বতিশাক্তের” কোনো দফাই স্বীকৃত হয় নাই। দেশের নরনারীকে সোলোন চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। জমির পরিমাণ এবং আমদানি অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ সাধিত হইয়াছিল। পঁচিশ “মেদিয়” কসলের মালিকের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

তিন-শ' "মেদিয়নের" মালিকদিগকে দ্বিতীয় এবং দেড়-শ' ওয়াল-দিগকে তৃতীয় শ্রেণীর আধেনিয় বিবেচনা করা হইয়াছিল। এক এক "মেদিয়" ১১৬ বৃশেলের সমান। চতুর্থ শ্রেণীর লোক ছিল তাহারা, যাহাদের জমির আয় ১৫০ "মেদিয়" অপেক্ষা কম, অথবা যাহারা একদম ভূমিহীন।

প্রথম তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া কেহই সোলোনের বিধানে সরকারী চাকুরী পাইত না। সর্বোচ্চ পদে একমাত্র প্রথম শ্রেণীর লোকই অধিকারী। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা সার্বজনিক সভায় বসিয়া বাদানুবাদ করিতে পারিত; ভোট দিবার অধিকারও ছিল।* কিন্তু এই সভায়ই কর্মচারী বহাল হইত, আইন জারি হইত, খরচ-পত্রের হিসাব-নিকাস হইত। এইখানে চতুর্থ শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে গুণ্টিতে বেশি হওয়ায় দেশের ভাগ্যগঠনে তাহাদের হাত অনেকটা দেখা যাইত।

সোলোন-নীতি মোটের উপর গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিতে হইবে। পয়সাওয়ালাদের প্রতিপত্তি, আভিজাত্যের ইচ্ছা, এসবও যথারীতি রক্ষা পাইয়াছিল সন্দেহ নাই।

সামরিক কাণ্ডেও এই চারি শ্রেণীকেই কেন্দ্র বিবেচনা করা হইত। ঘোড়-সওয়ার আসিত প্রথম দুই শ্রেণী হইতে। তৃতীয় শ্রেণী জোগাইত "ভারী" পদাতিকের দল। "হালকা" পদাতিক হইত চতুর্থ শ্রেণীর লোক। ইহারাও আবার ক্রান্তরীণ খালসীপে দেশ রক্ষা করিত। বোধ হয় নাবিকের কাজ করার জন্য ইহারা বেতন পাইত।

বস্তিগত ধনদৌলত বা নিজস্ব সোলেন-নীতির এক নতুন কথা। ভূমির পরিমাণ ও আয় দেখিয়া জনগণের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রিত হইত। বলা বাহুল্য যেখানেই সম্পত্তির প্রভাব সেইখানেই রক্তের টান কম। গোষ্ঠী-প্রথায় আর এক দা লাগিল।

কিন্তু রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষকে সর্বত্রই যে সম্পত্তি অনুসারে নরনারীকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। ধনদৌলতের কম বেশি বিবেচনা না করিয়াও মানব-সমাজ রাষ্ট্র কায়েম করিতে পারে।

আথেম্বেই সম্পত্তির প্রভাব সর্বদা অটুট ছিল না। আরিষ্টিদেসের সময় হইতে সরকারী পদগুলো যে কোনো লোকের অধিকারে আসিয়াছিল।

গণতন্ত্রী স্বরাজ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি

সোলোনের পরবর্ত্তী যুগে জমি লইয়া কেনা-বেচা একদম উঠিয়া গিয়াছিল। জমির পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ধনবানদের খেয়াল আর বড় একটা দেখা যাইত না। বাণিজ্য এবং শিল্পকর্ম ইত্যাদির দ্বারা আথেম্বে ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিল। স্বদেশী গোলামদের উপর জুলুম অনেকটা কমিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছিল বিদেশী গোলাম ও ক্রেতাবিক্রেতাদের উপর আথেনিয়দের অত্যাচার।

স্বাবর সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। টাকাকড়ি, গোলাম, নৌকা ইত্যাদিই ধনদৌলতের মূর্তি গ্রহণ করিতে থাকিল। সোলোনের আগেকার লোকেরা

এই সকল ধন জমি কিনিবার জন্য খাটাইত। এক্ষণে ধনবানেরা আর সেরূপ না করিয়া জমিওয়ালাদেরর সঙ্গে ঐশ্বৰ্য্যের টক্কর শুরু করিয়াছিল। শিল্পবাণিজ্যের ধনী-সমাজ আর সাবেককালের ভূমি-সম্পত্তির ধনী-সমাজ, এই দুইয়ে বিরোধ উপস্থিত হইল। ফলতঃ ভূমিপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী-প্রথাও আর এক ধাক্কা খাইতে লাগিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর বহির্ভূত অনেক লোক এখন আথেলের বাসিন্দা। নাগরিক হিসাবে ইহারা বসবাস করিত। কিন্তু আসল সমাজে ইহাদের কোনো ঠাই ছিল না। অধিকন্তু, খাটি বিদেশীদের সংখ্যাও দিন-দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনো কানুন ছিল না। একমাত্র মানবীয় সম্ভাবের জোরেই ইহাদের সঙ্গে স্বদেশীদের লেনদেন চলিতেছিল।

জমিওয়ালার কুলীনদের সঙ্গে “নয়া-ধনী”দের বিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত নবীন ধনদৌলতেরই বিজয়লাভ ঘটে। ক্লাইস্‌থেনিসের শাসন-পদ্ধতি (৫০২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) এই ধনবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সাক্ষী।

(১)

ক্লাইস্‌থেনিসের সংহিতায় সাবেক কালের চার “জাতি” স্বীকার করা হইল। গোষ্ঠী, ফ্রাজী ইত্যাদি কেন্দ্রে এইবার একদম লুপ্ত হইল। রক্তের টানে কোন ব্যক্তিকে কোনো দল, সমাজ বা কেন্দ্রের সামিল বিবেচনা করা হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করা ক্লাইস্‌থেনিসের সর্বপ্রধান কার্য। আথেলে একটা খাটি যুগান্তর সাধিত হইল।

সোলোনের পূর্বে “নৌকারিয়ারাই” নামক বাস্তবভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত জনকেন্দ্র আথেনিয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। সেই কেন্দ্রই হইল ক্লাইসথেনিস-নীতির সামাজিক খুঁটা। রক্তের পরিবর্তে মাথা তুলিল “দেশ”।

(২)

গোটা আটিকাকে এক-শ’ জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই গুলার নাম “দেময়”। প্রত্যেক “দেময়” স্বরাট। “দেময়ের” লোকেরা নিজ নিজ জেলার দেমাথোস বা গণ-মুখ্য, খাজাঞ্চি এবং ত্রিশজন বিচারক বাছাই করিত। প্রত্যেক “দেময়ে”রই মন্দির এবং “দৈবরক্ষক” ছিল। “দেময়ে”র রক্ষাকর্ত্তা দেবকে গ্রীক ভাষায় বলে “হেরোস্”। মন্দিরের পুরোহিত জনগণ হইতে নির্বাচিত করা হইত। গোটা “দেময়”ই অধিবাসীদের পরিষৎ কর্ত্তক সকল বিষয়ে শাসিত হইত।

মর্গ্যান বলেন, প্রাচীন আথেন্সের “দেময়” বর্ত্তমান মার্কিন রাষ্ট্রের নগর প্রতিষ্ঠানেরই আদিম মূর্ত্তি। রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার সময় আথেনিয় নরনারী যে জীবনকেন্দ্রের জন্ম দিয়াছিল, জগতের নবীনতম শাসন-প্রণালীতে সেই কেন্দ্রই চলিতেছে।

ক্লাইসথেনিসের দশ “দেময়” একত্রে “ট্রাইব” নামে পরিচিত হইত। এই কেন্দ্র সাবেক কালের রক্ত-প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব বা জাতি হইতে স্বতন্ত্র। এই ট্রাইব রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক দুই হিসাবেই স্বরাট। ট্রাইবের মুখ্যকে বলা হইত ফিলার্কোস্। এই পদের অধিকারী “নির্বাচিত” হইত। ঘোড়-সওয়ারের দল ফিলার্কোসের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইত। পদাতিক দলের নামক

তাক্সিয়ার্থোন্সও “নির্বাচিত” হইত। অধিকন্তু সমগ্র ট্রাইব-কেন্দ্রের পন্টনের সহজে যে রণ-নায়কের হাতে সকল দায়িত্ব, তাহাকেও ট্রাইবের লোকেরা বাছাই করিতে অধিকারী ছিল। পন্টনে যোগ দিতে বাধ্য ছিল প্রত্যেক লোক। পাঁচটা করিয়া রণতরীর সকল দায়িত্ব প্রত্যেক ট্রাইবের হাতে থাকিত। ট্রাইবের নামকরণ হইত “দৈবরক্ষকের” নাম অনুসারে। প্রত্যেক ট্রাইব আথেল্লেসের পরিষদে পঞ্চাশ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত।

আটিকা ছিল দশ ট্রাইবের দেশ। কাজেই আথেল্লেসের কেন্দ্র-পরিষদে পাঁচ-শ’ সভ্য সমগ্র দেশের শাসন চালাইত। পরিষৎ ছাড়া “সার্বজনিক সভা” বা “আগোরা”ও আর একটা প্রতিষ্ঠান। এই সভায় আপামর সকলেই ভোট দিতে অধিকারী। “পাঁচ শ’-পরিষদের সকল কাজই এইরূপে “রাস্তার লোকের” সমালোচনার অধীন হইয়া পড়িত। আর্কন ইত্যাদি কর্মচারীরা শাসনের নানা বিভাগে মোতায়েন থাকিত।

ক্লাইস্‌থেনিস আথেল্লেসে যে যুগ প্রবর্তন করিলেন, সে যুগে পুরাণো গোলামেরা পুনরায় স্বাধীন নাগরিকরূপে চলাফেরা করার অধিকার পাইল। বিদেশীদিগকেও আইনতঃ স্বদেশীদের সামিল বিবেচনা করা হইত। মাক্কাতার আমলের গোষ্ঠী, ব্রাজী ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো এই যুগে শাসনক্ষমতাহীন, অ-রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র মাত্রে পরিণত হইল। ধর্ম ও সামাজিক লেনদেন ছাড়া অল্প কোনো উপলক্ষে এই গুলার আর ডাক পড়িত না।

অবশ্য অনেক দিনকার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের উপর এই গুলার “নৈতিক” প্রভাব বড় শীঘ্র কমিতে পারে নাই। বহুকাল ধরিয়াই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আমলেও সনাতন গোষ্ঠীপ্রথার “স্বধর্ম” নরনারীর জীবন-আদর্শ পরিচালিত করিতে থাকিল।

(৪)

দণ্ড দিবার ক্ষমতা থাকা রাষ্ট্রের আসল লক্ষণ। অধিকন্তু এই ক্ষমতার সরকারী অধিকারী জনগণ হইতে স্বতন্ত্র। ক্লাইস্‌থেনিসের আমলে আথেন্স-রাষ্ট্রের সেনা এবং রণতরী দুই-ই জনগণ কর্তৃক গঠিত হইত। এই দুইয়ের সাহায্যেই দেশকে বিদেশী শত্রু হইতে রক্ষা করা হইত। অধিকন্তু, দেশের ভিতরকার গোলাম শ্রেণীর গণ্ডগোল হইতেও দেশকে বাঁচাইবার ভার এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল। তখনকার দিনে আথেনিয় সমাজে গোলামরাই অধিক সংখ্যক লোক।

কিন্তু নাগরিক অর্থাৎ স্বাধীন আথেনিয় বাহারা, তাহাদিগকে রাষ্ট্র স্বরূপে আনিত কি করিয়া? সরকারী দণ্ডের ক্ষমতা ছিল পুলিশের হাতে। পুলিশ-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীরা “সঙ”বা উৎকর্ষশীল সমাজ বুঝাইবার জন্ত “পুলিশ-শাসিত সমাজ” বলিতে অভিযান্ত ছিল।

আথেনিয় রাষ্ট্রের পুলিশ ছিল তীরন্দাজ। পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার এই দুই দলে পুলিশ বিভক্ত থাকিত। গোলাম জাতীয় লোক ছাড়া আর কেহ পুলিশের চাকরী গ্রহণ করিত

না। স্বাধীন আথেনিয়দের চিন্তায় পুলিশ বিভাগে কাজ করা অতি গর্হিত বিবেচিত হইত। একজন স্বশস্ত্র গোলাম তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করুক, তাও সই, তথাপি তাহারা এইরূপ জঘন্য কাজে নকরি লইত না।

পুলিশসম্বন্ধে বিদেহ আথেনিয় সমাজে আসিল কোথাহইতে? ইহা তাহাদের সাবেক কালের সনাতন গোষ্ঠী-ধর্মের ফল। পুলিশ ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। কিন্তু রাষ্ট্র আথেলে একটা “নতুন কিছু”। এই নবীন প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাত সমাজে বহুমূল হওয়া মুখের কথা নয়। নয়ায়-পুরাণো দ্বন্দ্বই আথেলের সেকালে পুলিশ-বিদেষের গোড়ার কথা। যতদিন পুলিশের কাজকে জঘন্য বিবেচনা করা হইতেছিল, ততদিন আথেনিয় সমাজে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের “নৈতিক” প্রভাব অটুট ছিল বৃত্তিতে হইবে। বড় সহজে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান মানব-সমাজে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই।

“অনধিকারী” গোলাম শ্রেণী

যাহা হউক ক্লাইস্‌থেনিসের আমলে রাষ্ট্র এক প্রকার সকল অঙ্গেই দেখা দিয়াছিল। আথেনিয়দের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থাও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলার অহুরূপই বিকাশ লাভ করিতেছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা ধনসম্পদ বাড়িয়া চলিতেছিল। মাক্কাতার আমলের “কুলীন” আর “ইতর” এই ধরণের শ্রেণীভেদ যেন আর বড় একটা দেখা যাইত না। শ্রেণীভেদ এক নব রূপে মূর্তি গ্রহণ করিতেছিল। প্রথম তফাৎ করা হইত “গোলামে” আর “স্বাধীনে”। দ্বিতীয় শ্রেণীভেদ ঘটিত “স্বদেশী”তে আর “বিদেশী”তে।

আথেলের চরম গৌরবযুগে “স্বাধীন” আবালবৃদ্ধবশিতার সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০। ইহারা ৩৬৫,০০০ “গোলাম” নর-নারীর উপর কর্তৃত্ব করিত। তখন “বিদেশী” এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলামেরা ছিল গুণ্টিতে ৪৫,০০০। অর্থাৎ সাবালক স্বাধীন আথেনিয় যেখানে একজন, সেখানে গোলাম ছিল আঠার এবং বিদেশী ছিল দুই।

এত সব গোলাম জুটিবার কারণ ছিল। বড় বড় কারখানায় ইহাদিগকে মজুররূপে বহাল করা হইত। ইহাদের মাথায় মাথায় থাকিত স্বাধীন লোক, কাজ তদ্বীর করিবার জ্ঞান। সামাজিক ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই চার জন ধনী লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। কাজেই নিধন স্বাধীন আথেনিয়রা গোলামদের সঙ্গে মজুরির বাজারে টকর দিতে বাধ্য হইত। যাহারা গোলামদের সঙ্গে টকর দেওয়া অপেক্ষা মরণই শ্রেয় বিবেচনা করিত, তাহারা ক্রমশঃ সমাজ হইতে উপিয়াই যাইতেছিল।

এইখানে একটা গভীর এবং গুরুতর কথা মনে রাখা আবশ্যক। স্বাধীন আথেনিয়দের ভিতর নিধন লোকেরাই ধনবানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। কিন্তু যখন এই নিধনরা ক্রমে ক্রমে নির্বংশ হইতে থাকিল, তখন আথেনিয়দের সমাজের কোমর ভাঙিয়া যাইতে আরম্ভ করে। আথেল এই কারণেই ভ্রগং হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

ইয়োয়োরোপের পণ্ডিত মহাশয়েরা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইহারা রাজরাজড়া আমীর ওমরাহদের প্রশস্তি তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত। ইজুল-কলেজের মাষ্টার মহাশয়েরাও কেতাবি গং

আওড়াইয়া নবাব বাদশাহ্দের স্তুতিগান করিয়া থাকেন। ইহারা কাজেই প্রচার করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের স্বরাজ্যই আধেনিয় রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ।

এই বাখ্যা ভ্রমাত্মক। প্রজাতন্ত্র শাসনের কলে আধেনিয় কোনো অনিষ্ট হয় নাই; অনিষ্ট হইয়াছে গোলামী প্রথার কলে। এই গোলামী প্রথাই “স্বাধীন” জনগণকে ইচ্ছান্তের সহিত খাটিয়া খাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। স্বাধীন ভাবে খাটিয়া মজুরি করিতে সমর্থ হইলে আধেনিয়ের দরিদ্র সমাজ বাচিয়া যাইত। কিন্তু এই সামাজিক স্বাধীনতা “স্বাধীন” আধেনিয়দের কপালে জুটে নাই।

আধেনিয় সমাজে রাষ্ট্রের জন্মকথা আলোচনা করিলে একটা পূরাপূরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ছাঁচ হাতে-হাতে ধরিতে পারি। বাহিরের কোনো আক্রমণ অথবা ভিতরকার কোনো বিদ্রোহ আধেনিয়দিগকে সহিতে হয় নাই। এই কারণেই রাষ্ট্রীয় কাঠামটা অনেকটা ষোলআনার পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মাঝে একবার পিসিষ্টাটুসের দৌরাওয়া বা একচ্ছত্র শাসনভোগ আধেনি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা বেশি দিন টিকে নাই। কাজেই রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহার প্রভাবও স্থায়ী হয় নাই।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া মানব-সমাজ একটা সর্বোপরিপূর্ণ রাষ্ট্র-কল্পে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার বিবরণ আধেনিয় ইতিহাসে পূরাপূরি পাই। অধিকন্তু এই রাষ্ট্র আবার জনগণের স্বরাজ-মূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান। তাহা ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় অঙ্গের জন্মই এই প্রকৃতপক্ষে পরিষ্করণে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমান-সমাজে গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

নগর-প্রতিষ্ঠার কাহিনী

রোম নগরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার মোটা কথা এই। একশত ল্যাটিন গোষ্ঠী একত্রে ছিল, নগর স্থাপনের প্রথম প্রবর্তক। ইহারা সকলে মিলিয়া এক ট্রাইব বা জাতির অন্তর্গত। পরে আর এক-শ' গোষ্ঠী আসিয়া উপনিবেশ বসায়। ইহারা সাবেসিয়ান ট্রাইবের অন্তর্গত। তাহার পরেও নাকি আবার এক-শ' গোষ্ঠী তৃতীয় উপনিবেশ কায়েম করে। এই তৃতীয় দলের গোষ্ঠীগুলোকেও কোনো একজাতির সম্বৃত্ত বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

কাহিনীটা শুনিলেই মনে হইবে যে গোষ্ঠী বিষয়ক তথ্যটুকু ছাড়া আর সবই আজগুবি কথা। তাহা ছাড়া এই গোষ্ঠীগুলো অনেক ক্ষেত্রে কোনো আদি-গোষ্ঠীর বাচ্চা মাত্র।

অধিকন্তু এই যে বারবার তিনবার তিনটা তথাকথিত “জাতির” উল্লেখ করা হইয়া থাকে এইগুলো বোধ হয় অনেকটা “ভূয়ো”। তবে প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরস্পর রক্তের সম্বন্ধ কিছু না কিছু ছিল এইরূপ অনুমান করিলে হইবে না। এই হিসাবে কোনো দূরস্থিত আদি-জাতির কাছে রোম-স্থায়িতাদের জাতিগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া

লওয়া হইয়াছিল এইরূপও বিশ্বাস করা চলিতে পারে। তাহা ছাড়া হয়ত বা জাতি তিনটা প্রত্যেকেই গোণ বা মুখ্যভাবে কোনো মাতৃস্থানীয় আদি-জাতির বংশধর।

দশ দশটা গোষ্ঠীকে এক এক ক্রাজী-কেব্রোঁ বাধিয়া রাখা হইত। ক্রাজীকে বলা হইত “কুরিয়া”। অতএব রোমের প্রতিষ্ঠাতারা সর্বসমেত ত্রিশ “কুরিয়া”য় বিভক্ত ছিল।

গোষ্ঠী-শাসন

রোমের গোষ্ঠী গ্রীক গোষ্ঠীরই অল্পরূপ। আবার গ্রীক গোষ্ঠীর সাবেক রূপ দেখিতে পাই আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে। এই সকল গোষ্ঠীর স্বধর্ম মোটের উপর এক প্রকার।

প্রথমতঃ, রোমের গোষ্ঠী প্রথায় নরনারীরা পরস্পর ধনদৌলতের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। সম্পত্তি গোষ্ঠীর বাহিরে হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারিত না। গ্রীক গোষ্ঠীর মতন রোমাণ প্রতিষ্ঠানেও পুরুষ-বিধিই ছিল বংশাধিকারের কাহুন। কাজেই নারীর সম্বন্ধে বংশ রক্ষার ভার পাইত না। রোমের প্রাচীনতম লিখিত আইনগুলা “দ্বাদশ বিধান” নামে পরিচিত। এই বিধান মতে নিজ সম্বন্ধে সর্ব প্রথম উত্তরাধিকারী। তাহার অভাবে পুরুষের তরফের “আজ্ঞাতি” অর্থাৎ আত্মীয়েরা এবং তদভাবে গোষ্ঠী মৃত ব্যক্তির ধনদৌলত ভোগ করিত।* গোষ্ঠীর ভিতরই সম্পত্তির চলাচল আবদ্ধ থাকিত।

এইখানে প্রাচীনতম গোষ্ঠী-ধর্মের ক্রমবিকাশ ধরা পড়িতেছে। ধনসম্পদ বৃদ্ধির এবং একপত্নী-পতি-ধর্মের প্রভাবে

রোমাণ-সমাজে গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র ১২৩

এই সকল পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী হইয়াছিল। মাকাতার আমলে নিয়ম ছিল যে, গোষ্ঠীর যে-কোনো লোকই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগে সমান অধিকারী। পরে নিয়ম হয় যে, এই অধিকার একমাত্র “আজ্জাতি”র। ক্রমশঃ অধিকারের ক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত করা হয়। তাহার ফলে সর্বপ্রথম অধিকারী স্বীকৃত হয় নিজ পুত্রকন্যারা এবং তাহাদের পুরুষ বংশধরেরা।

দ্বিতীয়তঃ, রোমের গোষ্ঠীতে একটা সার্বজনিক গোরস্থান থাকিত। ক্লাওদিয়া নামক “পাব্লিসিয়ান” (ধনী বা সম্ভ্রান্ত) গোষ্ঠী রেজিলি হইতে রোমে আসিয়া বসতি করে। ইহাদিগকে শহরের এক নির্দিষ্ট স্থানে কবরের জন্য জমি দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি সম্রাট আওগুস্তাসের আমলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। হ্রাবসের নায়ক টয়টোবুর্গের বনে নিহত হয়। তাহার শব রোমে আনা হইয়াছিল এবং কিংফতিলিয়া নামক স্বগোষ্ঠীর গোরস্থানে গাড়া হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, রোমাণ গোষ্ঠীদের কতকগুলো সার্বজনিক ধর্মকর্ম অহুষ্ঠিত হইত। এইগুলোকে “সাক্রা জেন্তিলিসিয়া” বলা হইত।

চতুর্থতঃ, গোষ্ঠীর ভিতর রোমাণরা পরস্পর বিবাহ করিতে পারিত না। এই সম্বন্ধে কোনো পাকাপাকি লেখা কাহুন ছিল না। কিন্তু দস্তুর ছিল এইরূপই। সেকালের পারিবারিক নামগুলো আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কোনো ক্ষেত্রেই স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই নাম এক গোষ্ঠীগত নয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক কাহুনও এই কথা প্রমাণিত হয়। বিবাহ হইবামাত্র নারী তাহার “আজ্জাতি” বা কুটুম্ব বিষয়ক অধিকার বর্জন করিতে বাধ্য। তাহার

গোষ্ঠীর সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাহার পুত্র-কন্যারাও তাহার জনক কিম্বা ভাইয়ের সম্পত্তিতে কোনো দাবী চালাইতে অধিকারী নয়। কারণ তাহা হইলে তাহার জনক-গোষ্ঠী নিজ সম্পত্তি বেহাত করিতে বাধ্য হইবে।

এই সকল আইনের মতলবই এই যে, নারী তাহার নিজ গোষ্ঠীর ভিতর স্বামী পাইবে না।

পঞ্চমতঃ, রোমের গোষ্ঠীরা প্রত্যেকে একটা করিয়া সার্বজনিক ভূমিখণ্ড রাখিত। মাস্কাতার আমলে “জাতি”গত যৌথ জমি ভাগাভাগি করিবার সময় প্রত্যেক গোষ্ঠীকে একএক টুকরা স্বতন্ত্র যৌথ জমি দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীনতম ল্যাটিন জাতিদের ব্যবস্থায় কিছু জমি জাতির তাঁবে, কিছু গোষ্ঠীর অধিকারে এবং কিছু পারিবার-সভ্যেব যৌথ দখলে দেখিতে পাই। রোমুলস নাকি সর্বপ্রথম ব্যক্তি হিসাবে জমির ভাগবাটোআরা সাধন করে। তাহার ব্যবস্থায় জন প্রতি পড়ে ৭১০ বিঘা (২ যুগের)। কিন্তু পরবর্তী কালেও গোষ্ঠীর দখলে খানিকটা জমি ছিল দেখা যায়। অধিকন্তু রাষ্ট্রের জমি বা খাশ মহালও অনেক দিন পর্যন্ত রোমাণ গণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, রোমাণ গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিত। লিখিত ইতিহাসের নজিরে এই রীতির উদাহরণ মাত্র দেখিতে পাই। রোমে যখন “রাষ্ট্র” গড়িয়া উঠে তখন এই প্রতিষ্ঠানই জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নরেন্দ্রেরূপ হয়। কাজেই গোষ্ঠীর দায়িত্ব বা কর্তব্য এই ব্যবহার

এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। তবে কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। আপিয়ুস ক্লার্ডিয়ুসকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাহার গোষ্ঠীর সকল লোক এমন কি ব্যক্তিগত শত্রুগণও- “অশোচ” বা দুঃখের পোষাক পরিয়াছিল। দ্বিতীয় পুনিক লড়াইয়ের সময় গোষ্ঠীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোকদিগকে শত্রুদের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পরস্পর খরচ করিবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বন্দীদিগকে এইরূপে গোষ্ঠীগত ভাবে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার বিরুদ্ধে তখনকার রোমাণ সেনেট বাধা দিয়াছিল।

সপ্তমতঃ, গোষ্ঠীর লোকেরা প্রত্যেক গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করিতে অধিকারী ছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার দুগু পর্য্যন্ত রোমাণদের এই দস্তুর দেখা গিয়াছে। গোলামেরা স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাহাদের সাবেক মনিবের গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু তাহার ফলে গোষ্ঠীগত অধিকারগুলা তাহাদের ভোগে আসিত না।

অষ্টমতঃ, রোমাণ গোষ্ঠীরা বাহিরের লোককে নিজ কেন্দ্রের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারিত। কোনো পরিবারের “দোষ্য” হইবামাত্র বিদেশী বা বাহিরের লোক গোষ্ঠীর একজনরূপে পরিগণিত হইত। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজেও এই রীতি প্রচলিত ছিল।

নবমতঃ, গোষ্ঠীর নায়কগণকে বাছাই ও বরখাস্ত করিবার অধিকার সম্বন্ধে কোনো কথা জানা যায় না। কিন্তু এই দস্তুর অনুমান করিয়া লওয়া চলিতে পারে। কেন না রোমের সর্ব প্রাচীন যুগে প্রত্যেক সরকারী পদের জন্যই কর্মচারী নির্বাচন

করা হইত। রাজপদও জনগণের বাছাইয়ের ফলে অধিকৃত হইত। “কুরী” কেন্দ্রেরও অধিকার ছিল নিজ নিজ পুরোহিত নির্বাচন করিয়া লইতে। গোষ্ঠীর সর্দার “প্রিন্সিপে”ও জনগণের নির্বাচনের অধীন ছিল এইরূপ বিশ্বাস করা অন্তায় নয়। তবে হয়ত “প্রিন্সিপ্”রা বংশগত রূপে সর্বদা একই পরিবার হইতে নির্বাচিত হইত।

রোমাণ গোষ্ঠীর স্বধর্মগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই এই সবেৰ ভিতর ইরোকোআ-নীতিই বিদ্যমান। তফাৎ এই যে, ইরোকোআ-সমাজে জননী-বিধিই চলিতেছিল। রোমে পুরুষ বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

মম্মসেনের ভুল

ইয়োরোপে সর্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ রোমের প্রত্নতত্ত্বে অনেক কথা অপরিষ্কার এবং গোঁজামিলে ভরিয়া রাখিয়াছেন। জার্মান-পণ্ডিত মম্মসেন প্রণীত “রোমিশি কোস্তডেন” (রোম-বিষয়ক অহুসন্ধান) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে বাহির হইয়াছিল। গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যের আমলের রোমাণদের পারিবারিক নাম সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিকপ্রবর লিখিয়াছেন :—“গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করিত গোষ্ঠীর প্রত্যেক পুরুষ। পোস্ত্র এবং নাবালকেরাও এই অধিকার ভোগ করিত। গোলামদের এই অধিকার ছিল না। গোষ্ঠীর নারীরাও গোষ্ঠীগত নামই ব্যবহার করিত। * * * টাইব বা “জাতি” (মম্মসেন গোষ্ঠীকেই সম্বন্ধে “জাতি” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন) কোনো আদি পূর্বপুরুষের বংশ সঙ্ঘত নরনারীদের সমাজ-কেন্দ্র। এই

শূর্যপুরুষ সত্যকার কোনো লোক হইতেও পারে না হইতেও পারে। কাল্পনিক অথবা একটা মনগড়া আদি পুরুষের সন্তানেরাও এই কেন্দ্রেরই অন্তর্গত। কতকগুলো রীতিনীতি, গৌরবস্থান, এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদির নিয়মে জাতির নরনারী ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিই—নারীরাও—জাতির লোক।”

নারীর নাম এবং বিবাহের নিয়ম সম্বন্ধে মম্মেন কিছু গোলে পড়িয়াছিলেন। ইনি বলেন :—“বিবাহিত নারীদের নামকরণ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। অবশ্য প্রথম প্রথম এই গুণ্ডগোল ছিল না। কেননা তখন নারীরা নিজ গোষ্ঠীর বাহিরের কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারিত না। কতকাল ধরিয়া নিজ গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করা নারীদের পক্ষে যারপরনাই কঠিন ছিল। ‘গোষ্ঠীর’ ভিতরই পরস্পর বিবাহ করা ছিল সনাতন ধর্মের বিধান। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে একমাত্র বিশেষ কোনো বাহাদুরির পুরস্কার অথবা ব্যক্তিগত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ দু’একজন লোককে স্বগোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার ক্ষমতা মঞ্জুর করা হইত। * * * কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ ঘটিত সেই সকল ক্ষেত্রে নারী তাহার স্বামীর জাতির (গোষ্ঠীর) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত। ধর্মকর্ম এবং সামাজিক রীতিনীতি সকল তরফ হইতে নারী তাহার নিজ কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া অপর এক কেন্দ্রের সামিল হইয়া পড়িত। ধনদৌলত বিষয়ক উত্তরাধিকারের ক্ষমতাও নিজ গোষ্ঠীর হাতে ফেলিয়া রাখিয়া বিবাহিত নারী স্বামীর সন্তানসম্ভতির এবং তাহাদের গোষ্ঠীর প্রচলিত কাহুন

ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইত। বস্তুতঃ নারী তাহার স্বামী কর্তৃক পোস্তরূপে নিজ পরিবারে গৃহীত হইলে পর কি তাহাকে এই নবীন গোষ্ঠী হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পারে ? ”

মমসেনের কথায় বুঝা যায় যে, রোমে কোনো কালে নারীরা নিজ গোষ্ঠীর ভিতর বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিত। অর্থাৎ রোমান গোষ্ঠী ছিল “আন্তর্বিবাহী”। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক লিখির গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আছে (৩২ পরিচ্ছেদ, ১৯ অধ্যায়)। সেই প্রমাণ লইয়া পণ্ডিতগণের ভিতর মতভেদও কম নয়।

লিখির লেখা অনুসারে রোম প্রতিষ্ঠার ৫৬৮ সালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব, ১৮৬ অব্দে সেনেট এক অহুশাসন জারি করে। তাহার দ্বারা ফেসেনিয়া হিম্পালা নাম্নী এক বিধবাকে নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর বাহিরে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে, দরকার হইলে একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে পারিবে এইরূপও সেই অহুশাসনের মর্ম্ম,—তাহার স্বামী মৃত্যুকালে উইল করিয়াই যেন তাহাকে এই ক্ষমতা দিয়া গিয়াছে। এক জন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার ক্ষমতাও তাহার থাকিবে। যে ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিবে তাহার পক্ষে এই বিবাহের দরুণ কোনো লজ্জা বা নিন্দার কারণ থাকিবে না।

বহির্বিবাহ না আন্তর্বিবাহ ?

সেনেটের এই অহুশাসন হইতে বুঝা গেল যে, ফেসেনিয়া ছিল এক স্বাধীনতা পাওয়া দাসী। এইরূপ গোলাম-নারীকে

গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আরও বুঝা গেল যে, স্বামী মৃত্যুকালে উইল করিয়া তাহার পত্নীকে গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার অধিকার দিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল বা হইত ?

(১)

মম্সেনের কথা অনুসারে নারীকে যদি স্বগোষ্ঠীর ভিতরেই বিবাহ করিতে হইত তাহা হইলে বিবাহের পরও নারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তই থাকিত। কিন্তু এই “আন্তর্বিবাহ” সপ্রমাণ করা চাই। আর এক কথা, নারী নিজ গোষ্ঠীর ভিতরেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলে পুরুষকেও তাহাই করিতে হইত বলাই বাহুল্য ; তাহা না হইলে বিবাহ ঘটিল কি করিয়া ? তবে দেখা যাইতেছে মজার কথা,—পুরুষ মরিবার সময় তাহার পত্নীকে এমন এক অধিকার দিয়া যাইতেছে যাহা ভোগ করা স্বয়ং তাহার নিজের পক্ষেই অসাধ্য ! আইন হিসাবে এ এক অসম্ভব তথ্য।

মম্সেন এই “অসাধ্য সাধনে”র কাঠিন্য বেশ বুঝিয়াছিলেন। এই কারণে তাহার কেতাবের এক পাদটীকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য রহিয়াছে :—“গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ অবশ্য একমাত্র উইলকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত না। গোষ্ঠীর সকল লোকের মত দরকার হইত।”

এইখানে মম্সেন এক অসমসাহসিক মত ব্যক্তিগতভাবে লিখিয়াছেন। লিখিত অনুশাসনটার বাক্যে এইরূপ আশঙ্কা করা কোনো মতেই চলে না। সেনেট বিধবাকে তাহার স্বামীর প্রতিনিধি

স্বল্পপই কমতা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার স্বামী তাহাকে যা কিছু দিতে পারিত তাহার চেয়ে বেশি বা কম সেনেট দেয় নাই। অধিকন্তু সেনেটের এই অধিকার দেওয়া বোল কলায় পরিপূর্ণ ছিল। অল্প কোনো আইন বা লোকমতের উপর এই অধিকারের মূল্য নির্ভর করে না। বিধবার নতুন স্বামী কাজেই কোনো হিসাবে নিন্দাজনন হইত না এই কথা সেনেট স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছিল। এ অশুশাসনের ভোগ সম্বন্ধে বিধবার বা তাহার নতুন স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো গণ্ডগোল যেন সৃষ্টি না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য এমন কি কন্সালগ্রিটার ইত্যাদি সরকারী কর্মচারীদিগকেও সেনেট আদেশ দিয়াছিল। সকল দিক হইতেই মমসেনের ব্যাখ্যা আগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(২)

এখন ধরা যাউক যেন নারী বাহিরের কোনো লোককেই বিবাহ করিত কিন্তু বিবাহের পর নিজ গোষ্ঠীতেই থাকিত। লিঙ্গের বাক্য মার্কি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার স্বামী মরিবার সময় পত্নীকে গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার অধিকার দিতে পারিত। অর্থাৎ সে অপর এক গোষ্ঠীর লোক কি করিবে না করিবে সে সম্বন্ধে উইল করিয়া যাইতে অধিকারী ছিল। এইরূপ ত বুদ্ধিসঙ্গত আলোচনায় সময় কাটানো বাকমারি।

আসল কথা প্রথম হইতেই বুঝিয়া রাখা উচিত যে, নারীর প্রথম স্বামীই ছিল বাহিরের গোষ্ঠীর লোক। কাজে কাজেই প্রথম হইতেই বিবাহিতা নারী তাহার স্বামীর গোষ্ঠীরই একজন। তাহা হইলে সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

বিবাহের পর নারী নিজ গোষ্ঠী হইতে ছাড়া হইয়া পড়ে। রক্তের টানে সে স্বামীর গোষ্ঠীর লোক যদিও নয় কিন্তু পোষ্য রূপে সে এই গোষ্ঠীরই লোক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও তাহার এই গোষ্ঠী-ধর্ম অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ বিধবার হাতে আসে। এই অবস্থায় বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে স্বামীর গোষ্ঠী হইতেই নতুন স্বামী গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা তাহা না হইলে বিধবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামী-দত্ত সম্পত্তি অন্য গোষ্ঠীতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সম্পত্তিকে গোষ্ঠীর হাত-ছাড়া হইতে দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যদি একটা ব্যতিরেক করিতেই হয় তাহা হইলে এই ব্যতিরেকের অধিকারী কে? স্বামী। সে তাহার নিজ সম্পত্তির কিয়দংশ তাহার পত্নীকে দান করিয়াছে। সে যদি চায় যে তাহার পত্নী অপর কোনো গোষ্ঠীর লোককে বিবাহ করুক তাহা হইলে এই সঙ্গে তাহার দেওয়া সম্পত্তিও অন্য গোষ্ঠীতে চলিয়া যাইবে না কি? সে বিবাহ করিবার নারীকে তাহার গোষ্ঠীর ভিতর আনিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন নিজের জিনিস, তাহার স্ত্রীও সেইরূপ নিজস্ব। এই দুই নিজস্বই সে উইল করিয়া অপর এক গোষ্ঠীর হাতে দিয়া যাইতেছে লিহির গ্রন্থে এইরূপ বুঝাই যুক্তিসঙ্গত। শেষ পর্য্যন্ত মমসেন প্রচারিত “আন্তর্কিবাহ” পরিত্যাগ করিয়া মর্গ্যান-বিবৃত “বর্হিকিবাহ” প্রথাই রোম সম্রাজ্ঞী স্বীকার করিতে।

চলিতেছে। লাক্সে প্রণীত “ব্যোমিশে আন্টারটিয়ার” (রোমের প্রত্নতত্ত্ব) গ্রন্থে (১৮৭৬) বলা হইয়াছে যে,—“স্বাধীনতা পাওয়া গোলাম-নারীরা বিশেষ অসুখমতি ছাড়া গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিতে অধিকারী ছিল না। তাহা ছাড়া যে সকল কাজ করিলে “পরিবারগত অধিকার” লুপ্ত হইয়া যায় এবং গোলাম-নারী অল্প এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে সেই সকল কাজ করিতে হইলেও তাহাদিগকে প্রথম হইতে বিশিষ্ট সরকারী ছকুম লইতে হইত।” এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে “স্বাধীন” রোমাণ নারী সম্বন্ধে লিহ্লির বাক্যে কোনো ব্যবস্থা নাই বুঝিতে হইবে। কাজেই তাহারা যে গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিত একথাও কোনো মতেই বলা চলে না।

“এলুপসিও জেন্টিস্” (অর্থাৎ গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ) শব্দ এই স্থান ছাড়া গোটা রোমাণ সাহিত্যের আর কোথাও পাওয়া যায় না। “এলুবেরে” (অর্থাৎ বহির্বিবাহ) শব্দটাও লিহ্লির গ্রন্থে মাত্র তিন ঠাইয়ে দেখিতে পাই। কিন্তু গোষ্ঠীর সম্পর্কে এই তিন ঠাইয়ের কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। অথচ রোমাণ মেয়েরা যে গোষ্ঠীর ভিতরেই বিবাহ করিতে বাধ্য ছিল এই অভ্যুত ধারণাটা এই একমাত্র বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এই ধারণা ঠেকসই নয়। কারণ হয় এই বাক্যের দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া গোলাম-নারীদের বিশেষ বিধিনিষেধের কথা বুঝিতে হইবে। অতএব সাধারণ স্বাধীন নারীদের সম্বন্ধে এই বাক্যে কোনো কথাই বলা হয় নাই। অথবা এইখানে যদি স্বাধীন নারীদের কথা থাকে তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝাই

বাইতেছে যে, তাহারা সাধারণতঃ গোষ্ঠীর বাহিরেই বিবাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। বিবাহের দ্বারা তাহারা পিতৃ গোষ্ঠীর আওতা হইতে স্বামীর গোষ্ঠীতে বদলি হইত। অতএব যম্‌সেনের বিরুদ্ধে এইখানে মর্গ্যানেরই বাজি জিৎ।

“কুরিয়া” বা রোমান “ফ্রাত্রী”

রোম প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন শ' বৎসর পরেও গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানকে খুব প্রবল দেখিতে পাই। এই সময় ফেরিয়ান নামক এক “পাত্রিসিয়ান” (কুলীন বা সম্ভ্রান্ত ও ধনী) গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী স্বেস্ট্র নগরের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করিবার জন্য সেনেটের অনুমতি পাইয়াছিল। এই গোষ্ঠীর ৩০৬ জন পুরুষ লড়িতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। বংশরক্ষা করিবার জন্য মাত্র একজন বালক নাকি জীবিত ছিল।

রোমের গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে “কুরিয়া”র মর্যাদা ছিল ঢের। দশ দশটা গোষ্ঠীতে যে “ফ্রাত্রী”-কেন্দ্র গঠিত হইত তাহার নাম ছিল “কুরিয়া”। গ্রীক “ফ্রাত্রী”র চেয়ে রোমান “ফ্রাত্রী”র অধিকার বেশি থাকিত। প্রত্যেক “কুরিয়া” ধর্মকর্ম বিষয়ে ছিল স্বরাট। নিজ নিজ রীতিনীতি, পুরোহিত, দেবোত্তর সম্পত্তি ইত্যাদি দস্তুর মতনই ছিল। প্রত্যেক “কুরিয়া”র পুরোহিতেরা একত্রে এক একটা “কলেজিয়ুম” বা পুরোহিত-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিত।

দশটা “কুরিয়া”য় হইত এক একটা ট্রাইব বা জাতি। জাতি-নায়ক, লড়াই-নায়ক এবং পুরোহিত সমগ্র জাতি কর্তৃক নির্বাচিত হইত। তিনটা জাতি সমবেত ভাবে “পোপুলুস রোমানুস” অর্থাৎ রোমান-সমাজ নামে পরিচিত ছিল।

কাজেই গোষ্ঠীর ব্যক্তি না হইলে অর্থাৎ “কুরিয়া” এবং ট্রাইবের সভ্য না হইলে কেহই “রোমান-সমাজের” একজন রূপে পরিগণিত হইতে পারিত না। রোমানদের সর্ব প্রথম শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে জাৰ্মান ঐতিহাসিক নীবুরের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

“সেনেট” ও “কুরিয়া”-সভা

সেনেট ছিল সার্বজনিক কাজকর্মের শাসক। তিন শ’ গোষ্ঠীর গোষ্ঠী-নায়ক হইত সেনেটের সভ্য। গোষ্ঠী “বৃদ্ধ” বলিয়া তাহাদিগকে লোকে “পাত্রে” পিতা বা জনকস্থানীয় বিবেচনা করিত। সেনেটকে এই কারণ বৃদ্ধ-সভা বা পিতৃপরিষৎ বলা হইত। “সেনেক্স” শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। এই শব্দ হইতেই সেনেট শব্দের উৎপত্তি।

গোষ্ঠী-নায়ক বা গোষ্ঠী-বৃদ্ধেরা মোটের উপর বংশগত রূপেই বাছাই হইত। কাজেই জন্মের অধিকারেই সেনেট পুরুষাত্মকরূপে রাজত্ব করিত। কৌলীন্য, অভিজাত্য ইত্যাদি সবই পুত্র-পৌত্রাদি ধারায় চলিয়া আসিত। এই সকল পরিবারই “পাত্রিসিয়ান” নামে অভিহিত হইত। ইহারা একমাত্র সেনেটেরই সভ্য জোগাইত এমন নয়; রোমের সকল সরকারী চাকরীই এই সকল অভিজাত বংশের একচেটিয়া ছিল।

কাহিনী শুনা যায় যে, “রোমুলস” নাকি “পাত্রিসিয়ান” উপাধি এবং এই উপাধিসম্বলিত একচেটিয়া দাবীদাওয়া প্রথম সেনেটের সভ্যগণকে দান করিয়াছিল। কাহিনীর মর্ম্ম এই যে, রোমান জনসাধারণ এই সকল জন্মগত অধিকারভোগী কুলীন

বংশগুলার আধিপত্য নিক্সিবাদে স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

সেনেট ছিল আথেমের, “বুলে”-পরিষদের অনুরূপ। অনেক বিষয়ে সেনেটের রায়ই ছিল শেষ কথা। অত্যাণ্ড বিষয়ে,— বিশেষতঃ নতুন কাশুন জারি সম্বন্ধে সেনেট প্রাথমিক আলোচনা করিত মাত্র। এইগুলি জারি হইত সার্বজনিক-সভায়। সেই সভার নাম ছিল “কোমিশিয়া কুরিয়াতা” অর্থাৎ “কুরিয়া”-সভা। ত্রিশ “কুরিয়া”র প্রত্যেকেরই একটা করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিত। “কুরিয়া”য় হাজির থাকিত রোমের সকল লোকই। গোষ্ঠী হিসাবেই বোধ হয় ইহারা “পংক্তিতে” বসিত।

“কুরিয়া”-সভা আইনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য অথবা মঞ্জুর করিতে অধিকারী ছিল। বড় বড় সকল কর্মচারীই এই সভায় বাছাই হইত। “রেক্স” অর্থাৎ “তথাকথিত” রাজাও এই সভায়ই নিৰ্ব্বাচিত হইত। লড়াই ঘোষণা করিবার ক্ষমতা ছিল এই সভার। কিন্তু সন্ধি স্থাপন করিবার ভার ছিল সেনেটের হাতে। মৃত্যু-দণ্ড বিষয়ক সকল বিচারেরই “আপীল” শুনিবার এক্তিয়ার ভোগও “কুরিয়া”-সভার অন্ততম নিজস্ব।

“রেক্স” কি “রাজা” ?

সেনেট এবং “কুরিয়া”-সভা এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে “রেক্সের” পদ ছিল প্রাচীন রোমের তৃতীয় প্রতিষ্ঠান। গ্রীসের “বাসিলিউস্” আর রোমান “রেক্স” প্রায় একই। কিন্তু মম্মেন “রেক্স” শব্দে যেরূপ রাজা বুঝিয়াছেন সেরূপ কিছু সম্বন্ধিবার কারণ নাই।

কেন্টিক-আইরিশ “রিগ” এবং গথিক “রাইক্স” বা ল্যাটিন “রেক্স”ও তাই। জার্মান “ফ্যিষ্ট,” ইংরেজি “ফাষ্ট” এবং ভেনিস “ফোষ্টে” প্রথমে গোষ্ঠী বা জাতির “মুখ্য” সর্দার, নায়ক, বা প্রথম বুঝাইত। “রেক্স” ইত্যাদি অন্যান্য ভাষার শব্দগুলোও এই অর্থেরই বিজ্ঞাপক। নৃপতি বা রাজা বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার জন্ত এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইত না।

পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যখন রাজপদ গড়িয়া উঠে তখন গথেরা এই জন্ত এক নতুন শব্দ কায়েম করিয়াছিল। সে “থিউদান্স” বা সমগ্র জাতির সমর-নায়ক। গথিক সাহিত্যে বাইবেলের অমুবাদ প্রচার করিয়া উল্ফিলা প্রসিদ্ধ। এই অমুবাদে অর্ন্তজার্কসেস্ এবং হেরোডকে “রাইক্স” বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে “থিউদান্স”। রোমান নরপতি তাইবেরিয়ুসের সাম্রাজ্যকে “রাইকি” না বলিয়া “থিউদিনাস্” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ল্যাটিন “রেক্স” শব্দকে “থিউদান্সে”র প্রতিশব্দ বিবেচনা করা চলিতে পারে না।

“রেক্সে”র কর্তব্য ছিল নানাবিধ। রোমান-সমাজের সেনা-নায়কত্ব ছিল তাহার হাতে। পুরোহিতদের সর্দার হিসাবেও এই পদের দায়িত্ব থাকিত অনেক। কতকগুলো বিচারকার্যেও “রেক্সে”র কর্তৃত্ব চলিত। জনগণের জীবন, ধনদৌলত ইত্যাদির উপর তাহার কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। পণ্টনের নেতা অথবা বিচারপতি হিসাবে এই সম্বন্ধে তাহার যে সব অধিকার ছিল তাহার বেশি কিছু “রেক্স” ভোগ করিতে পারিত না।

“রেক্সে”র পদে লোক বহাল হইত বাছাইয়ের কলে।

জন্মগত অধিকারের প্রভাবে কেহ “রেক্স” হইতে পারিত না। বোধ হয় পূর্ববর্তী “রেক্স” তাহার উত্তরাধিকারী সহস্রে মত প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু নির্বাচনের একতিয়ার ছিল “কুরিয়া”-সভার হাতে। গদিতে বসাইবার ভার থাকিত আর এক সভার তাঁবে। “রেক্স”কে খেদাইয়া দেওয়াও জনগণের ক্ষমতার অধীন ছিল। তাকুইন সুপাবুসের ভাগ্য কথা অবিস্মৃত নয়।

বীর-যুগের গ্রীকদের মতন তথাকথিত রাজ-যুগের রোমাণরাও “সামরিক গণতন্ত্রের” লোক ছিল। গোষ্ঠী, “ফ্রাত্রী” এবং জাতি এই তিন কেন্দ্রে সেই শাসন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইত। “কুরিয়া” এবং টাইব-অর্থাৎ “ফ্রাত্রী” এবং জাতি—এই দুই কেন্দ্র অবশ্য অনেকটা কৃত্রিম, কাল্পনিক বা মনগড়া সন্দেহ নাই। কিন্তু খাঁটি নৈসর্গিক হইলে এই সকল কেন্দ্রের যে ইচ্ছা থাকিত রোমাণ-সমাজে এই কৃত্রিম প্রতিষ্ঠানগুলার ইচ্ছা ততটাই দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ স্বাভাবিক সমরকুজ কেন্দ্রের ছাঁচেই এই কেন্দ্রগুলোকে চালানো হইত।

“পাত্রিসিয়ান” ও “অনধিকারী” “প্লেব”

“পাত্রিসিয়ান” বংশগুলি দিন দিন আভিজাত্যের বিশিষ্ট অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া চলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে “রেক্স”রও ক্রমশঃ সমাজের সকল বিভাগে হাত পা ছড়াইয়া প্রবল হইতেছিল। এই দুই তথ্য স্বীকার করিলেও গোষ্ঠীধর্মের গোড়ার কথা রোমাণ-সমাজে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাই।

রোমের লোকসংখ্যা : উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিল।



দেশজয়ের ফলে রোমের চৌহদ্দিও বিস্তৃত হইতে থাকে। বিদেশী লোকেরা আসিয়া রোমে এবং রোমের অধিকৃত জনপদে বস্তুি গাড়িতেছিল। এই সকল বিদেশীরা মোটের উপর প্রধানতঃ ল্যাটিন জাতীয় নরনারী।

কিন্তু রোমাণ-সমাজে এই সকল নবাগতের কোনো ঠাঁই ছিল না। ইহারা রোমীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক লেনদেন চালাইতে অধিকারী ছিল না। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহারা স্বাধীন নরনারী সন্দেহ নাই। জমিজমার স্বত্বে তাহাদের অধিকার ছিল। খাঁটি স্বদেশীদের মতনই ইহারাও খাজানা দিত এবং সাময়িক কাজে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু কোনো সরকারী কাজে তাহারা চাকুরী পাইত না। “কুরিয়া”সভায় যোগ দেওয়া তাহাদের অধিকারের বহির্ভূত থাকিত। নতুন নতুন বিজিত-ভূখণ্ডেও তাহারা অধিকার পাইত না।

এই সকল “অনধিকারী” নবাগত স্বাধীন নরনারীই “প্লেব্‌স্” বা জনসাধারণ নামে পরিচিত হইতে থাকে। গুণ্‌তিতে ইহাদের সংখ্যা প্রতি দিনই বাড়িতেছিল। অধিকন্তু লড়াইয়ের কুচাকাওয়াজেও ইহাদের হাত পাকাই ছিল।

কাজেই ইহাদের সামাজিক প্রভাব ক্রমেই প্রবলতর হইতেছিল। এই নব শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রোমের সাবেক “পোপুলুস্” বা “খাঁটি স্বদেশী সমাজ” অশেষ প্রকার বিধিনিষেধ জারি করিতে বাধ্য হয়।

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। জমিজমা বোণ হয় “পোপুলুস্” আর “প্লেব্‌স্” অর্থাৎ স্বদেশী আর বিদেশী এই দুই সমাজে সমানভাবে বিভক্ত ছিল। কিন্তু “নবীন

ধনদৌলত” ছিল প্রধানতঃ “প্লেব্‌স্‌”, নবাগত নরনারী বা জন-সাধারণের হাতে। শিল্প এবং বাণিজ্য এই দুই পথে নয়া ধনসম্পদ সৃষ্টি হইতেছিল। এই ধনের বিকাশ হইতে অবশ্য অনেক দিন লাগিয়াছে।

সাম্রাজ্য-সংহিতার শ্রেণী-বিভাগ

রোমের এই গোষ্ঠীধর্ম কবে কি উপায়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়া বিশেষ কঠিন। প্রাচীনতম কাহিনীগুলি একে ত কাহিনী মাত্র ; তাহার উপর অস্পষ্ট ও আধারে ভরা। এই আধারকে আরও আধারময় করিয়া তুলিয়াছেন আক্ষকালকার ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববাসীগণেরা। ইহারা আইনের শিক্ষা পাইয়া সেকালের সব কিছুকেই নবান্বয়ের বিধান মার্কিক আইনের চোখে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই রোমান-সমাজে যুগান্তরটা কেন পথে কেন সাধিত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। এইটুকু মাত্র জানি যে সেকালের “ধর্ম”-বিপ্লবে বা নীতি-পুনর্গঠনে “প্লেব্‌স্‌-পোপুল্‌স্‌”র অর্থাৎ নবীন-প্রবীনের লড়াই একটা বড় কথা। সেই সংগ্রাম এবং বিপ্লবের ফল দেখিতে পাই এক নয়া সংহিতায় বা স্মৃতিশাস্ত্রে।

রোমুল্‌স্‌-স্মৃতিকে গ্রীসের (আথেলের) থিসির্ডস্‌-স্মৃতির জড়িদার বিবেচনা করা যাইতে পারে। সেই হিসাবে রোমুল্‌স্‌-স্মৃতির যুগধর্ম ভাঙিয়া সাম্রাজ্য তুলিয়ুস নামক “রেক্‌স্‌” যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত করে তাহাকে আথেনিয়া সমাজের সোলোন-যুগের অঙ্কুর ধরিয়া লওয়া চলে। সাম্রাজ্য-নীতি সোলোন-

নীতির মতনই একটা নতুন সার্বজনিক-সভা কায়েম করিয়াছিল। “পোপুলুস” এবং “প্লেব্‌স” হিসাবে এই সভার সভ্য নিৰ্বাচন হইত না। সাময়িক জীবনে যে সকল লোক যোগ দিতে অধিকারী ছিল—তাহারা “স্বদেশী”ই হউক বা “বিদেশী”ই হউক—এই সভার সভ্য হইতে পারিবে এই বিধান জারি করিয়া সাহিবুস এক যুগ প্রবর্তন করে।

ধনদৌলতের পরিমাণ অমুসারে রোমের “সকল” নরনারীকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা সাহিবুস-নীতির প্রথম কাজ। প্রথম শ্রেণীর লোকের কিম্বৎ ছিল কম্‌সেকম্ ১০০,০০০ “আস্”। একলাখ “আস্”কে ৩,১৫৫ মার্কিং ডলার বা প্রায় ১০,০০০ আজকালকার ভারতীয় মুদ্রার সমান বিবেচনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর সম্পত্তির দাম যথাক্রমে ৭৫,০০০, ৫০,০০০, ২৫০০০ এবং ১১,০০০ “আস্”। অন্ততঃ পক্ষে এই এই পরিমাণ সম্পত্তির মালিক না হইলে কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইত নৈনা। ষষ্ঠ শ্রেণীর লোককে বলা যাইতে পারে “প্রোলেটারিয়ান”। ইহাদের সম্পত্তি ১১,০০০ “আস্” (৩৮৮ ডলার) বা প্রায় ১১,০০০ টাকার কম। ইহারা পন্টনের কাজে অনধিকারী। ইহাদের নিকট হইতে কোনো প্রকার শাজনা আদায়ও করা হইত না।

“সেঞ্চুরিয়াতা”র বিধানে ধনতন্ত্র

সাহিবুস-প্রবর্তিত, নয়া সার্বজনিক-সভার নাম ছিল কোমিশিয়া-সেঞ্চুরিয়াতা (বা শত-দল সভা)। কি “সেঞ্চুরিয়া”

বা শত-দল হিসাবে জনগণকে পণ্টনের রীতিতে সজ্জবদ্ধ হইতে হইত। প্রত্যেক “সেকুরিয়া”র একটা করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল। লড়াইয়ের কার্য উপলক্ষে “সেকুরি” গুলি যেমন চলিত সভার কাজেও তাহাদের দস্তর এবং রীতিনীতি সেই রূপই নিয়ন্ত্রিত হইত।

রণক্ষেত্রে আসিত ৮০০০ কোঙ্জ অর্থাৎ ৮০ “সেকুরি” প্রথম শ্রেণী হইতে কাজেই “কোমিশিয়া সেকুরিয়াতা”রও প্রথম শ্রেণী ছিল ৮০ শত-দল অতএব ৮০ ভোট। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত যথাক্রমে ২০, ২২ এবং ৩০ “সেকুরি” অর্থাৎ তদনুরূপ ভোটক্ষমতা ও শত-দল-সভায় কার্য্যকরী হইত। ষষ্ঠ শ্রেণী অর্থাৎ “নিধন” এবং “অনধিকারী”দিগকে—বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে!—একটা “সেকুরি” অর্থাৎ এক ভোটের কিস্ময় দেওয়া হইত। এই সকলের অতিরিক্ত ছিল আর এক শ্রেণী। তাহারা ধনবানদের ধনবান অর্থাৎ অতিমাত্রায় ধনী লোক। এই শ্রেণী জোগাইত ঘোড়সওয়ার। ইহারা ১৮০০ অশ্বারোহী খাড়া করিত। অর্থাৎ ইহারা ১৮ শত-দলে সজ্জবদ্ধ, কাজেই “সেকুরিয়াতা”র সভায় ১৮ ভোটের অধিকারী।

অতএব দেখা যাইতেছে যুগাবতার ধর্মবিপ্লব সাধ সাহস্রিযুস তুলিযুসের নবীন সভায় মোটের উপর ১২৩ শত-দলের শাসন চলিত। ইহাদের ভোট সংখ্যাও ১২৩। এই সভার দ্বারা কোনো মত গ্রহণ করাইতে হইলে তাহার স্বপক্ষে অন্ততঃ পক্ষে ২৭ ভোট দেওয়া দেওয়া চাই। এই সংখ্যা সর্বদাই ধনীদের “হাতের পাঁচ”। কেননা প্রথম শ্রেণীর ৮০ এবং ঘোড়সওয়ারদের ১৮ এই দুইয়ে মিলিয়া হয় ৯৮! অর্থাৎ ধনবান

এবং ধনবানদের সেরা এই দুই শ্রেণীর লোক একত্রে অশান্ত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়াও রোমের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত।

“সেফুরিয়াতা”র সভা সাবেক কালের “কুরিয়া”-সভাকে কানা করিয়াছিল। বড় বড় যা কিছু রাষ্ট্রকাজ সবই এই নতুন সভায় নির্ধারিত হইত। “কুরিয়া”-সভা এবং গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান-গুলি সার্ব্বিয়ুসের যুগে মামুলি সামাজিক এবং ধর্মকর্ম বিষয়ক অস্থানের ভার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। এই অবস্থায়ই আথেন্সের গোষ্ঠী-কেন্দ্রগুলার মতন রোমের সাবেক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছু কাল ধরিয়া “ভেরাণ্ডা ভাজিতে” থাকে। দেখিতে দেখিতে “কুরিয়া”-সভা লোপ পাইল। পরে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের দিন কেন্দ্র তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহার ঠাইয়ে কায়েম করা হয় চার জাতি। শহরের চার অঞ্চলে এই চার জাতিকে জনপদ হিসাবে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। রক্তের টান রোমাণরা অনেক দিনই তুলিয়া গিয়াছে।

রোমাণ গণতন্ত্রের আর্থিক ইতিহাস

তথাকথিত রাজতন্ত্র বা “রেক্স”-পদ উঠিয়া যাইবার পূর্বেই গোষ্ঠী-ধর্মের রক্তকেন্দ্র লুপ্ত হইয়াছিল। স্থান-গত জনবিভাগ এবং সম্পত্তি-গত শ্রেণীভেদ এই দুই দিকায় প্রতিষ্ঠিত এক সমাজবন্ধন প্রণালী দেখা দেয়। তাহারই নাম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দণ্ড দিবার সার্বজনিক ক্ষমতা আসে সমর কার্যে অধিকারী শ্রেণীদের হাতে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইত গোলামদের বিক্রেতা আর “নিধন” এবং রণকর্মে অনধিকারী “প্রোলিটারিয়ান”দের বিক্রেতা।

শেষ রেক্স-তর্কুইনিয়স্ সুপার্বুস্ সত্যসত্যই “রাজা” হইয়া বসে। ইহাকে তাড়াইয়া দিয়া রোমাণরা তাহার ঠাইয়ে দুই সমর-সর্দার কায়েম করে। ইহারা “কোনস্থল” নামে পরিচিত। প্রত্যেকের ক্ষমতা ছিল সমান। আমেরিকার ইরোকোআদের দস্তরটা স্মরণ করিতে হইবে। রোমের শাসন পদ্ধতি এইখানে বোলকলায় পূর্ণ হইল। গণতন্ত্র দেখা দিল।

তাহার পর রোমে ঘটিয়াছে পাট্রিসিয়ান-প্লেবদের লড়াই। প্লেবরা সরকারী-চাকরী এবং খাসমহালে অধিকার দাবী করিতে থাকে। ইহাদের ধাক্কায় আত্মরক্ষার জন্ত পাট্রিসিয়নেরা শিল্প ব্যবসায়ে সম্পত্তিশীল “নবীন ধনী”দের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ছোটখাট জমির মালিকেরা লড়াইয়ে যোগ দিতে দিতে দরিদ্র হইয়া পড়ে। তাহাদের জমিজমা বিক্রী হইয়া যায়। কাঁচা টাকাওয়ালা “নবীন ধনী”দের হাতে।

মস্ত মস্ত ভূমি সম্পত্তির অধিকারী “জমিদার” শ্রেণীর লোক রোমে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইতে থাকে। ইহাদের জমি চাষের জন্ত গোলাম বহাল করা আবশ্যক হয়। গোলাম-প্রথায় সমাজে যত দুর্গতি ঘটে তাহার ভিতর লোকসংখ্যার হ্রাস অন্ততম। নেতায় নেতায় ঝগড়াও শুরু হয়। শেষ পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের গলা টিপিয়া জননায়ক হন রোমাণ সাম্রাজ্যের বাদশাহ্। এই বাদশাহী যুগের আর্থিক ও সামাজিক কলঙ্কই শেষ পর্য্যন্ত রোমে জার্মাণ “বার্কার”দিগকে রাজ্য বিস্তারের সুযোগ দিয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

কেন্টিক ও জার্মান জাতির গোষ্ঠী-প্রথা

জগতের প্রায় সকল অল্পমত বা আদিম জাতির ভিতরই গোষ্ঠী-প্রথা দেখা যায়। প্রাচীন ইয়োরোপের মতন প্রাচীন এশিয়ারও সকল "সভ্য"সমাজেই কোনো না কোনো যুগে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে।

গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান অল্প দিন হইল পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত হইয়াছে। পূর্বে স্কটল্যান্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাকলেনান এই প্রথার বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠানট বৃষ্টিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক তাঁহার গবেষণা সমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কালমুক, সিক্সসিয়ান, সামোয়েদ এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী-ধর্মের নিয়মে পরিচালিত হয়। রুশ পণ্ডিত কোহ্বালেঙ্স্কি পশাহু, শেহুসুর, স্বানেৎ এবং অন্যান্য ককেসাস পাহাড়ের জনসমাজে এই প্রতিষ্ঠান আবিষ্কার করিয়াছেন। কেন্টিক এবং জার্মান জাতির অন্তর্গত বহু সমাজেও গোষ্ঠী-প্রথা অতি সাধারণ কথা।

কেন্টিক ও আয়ার্ল্যান্ড জাতির গোষ্ঠী-প্রথা ২১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়ারল্যান্ড, স্কেলস ও স্কটল্যান্ড

প্রাচীনতম কেন্টিক কাহুন আজও আয়ারল্যান্ডের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এমন কি ইংরেজের আইনের পাল্লায় পড়িয়াও গোষ্ঠী-প্রথা আইরিশ-সমাজ হইতে একদম উপিয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত স্কটল্যান্ডেও গোষ্ঠী-নীতি চলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের আইন এবং আদালতের প্রভাবে এই প্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। “আইন-আদালত”ই গোষ্ঠীর যম।

স্কেলস-প্রদেশেও ইংরেজ আক্রমণের পূর্বে,—অর্থাৎ একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যৌথ চাষআবাদ প্রচলিত ছিল। অবশ্য তখন এই প্রথা সাবেক কালের এক জের মাত্র বিবেচিত হইত। পনর ঘোল বিঘা জমি থাকিত প্রত্যেক পরিবারের স্ববশে। অত্যাগ্জ জমি চষা হইত পরিবারে পরিবারে সম্মিলিত রূপে। সম্মিলিত চাষের ফসল পরে ভাগাভাগি করাও হইত।

“জোড়-পরিবার”

আয়ারল্যান্ডের এবং স্কটল্যান্ডের নজির হইতে বিশ্বাস করা চলে যে, স্কেলসের পঞ্চায়ৎ-প্রথা গোষ্ঠী-ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠান। তবে স্কেলসের কাহুনগুলা গভীরতর ভাবে আলোচনা করিলে হয়ত নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আয়ারল্যান্ডের এবং স্কেলসের স্থিতি-শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেন্টিক সমাজে এক-পত্নী-(পতি)-স্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনও “জোড়-পরিবার” চলিতেছিল।

হেলসে বিবাহকে পাকাপাকি রদ করিতে হইলে জানান-
নানির পর অন্ততঃ পক্ষে সাত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত।
অর্থাৎ ততকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ যৌন-সংসর্গ চালাইতে
অধিকারী ছিল। “ডাইভোর্স” বা বিবাহ-ভঙ্গের সময় স্ত্রীই
সম্পত্তি বিভাগে কর্তৃত্ব করিত। স্বামী এই ভাগবাটোআরায়
সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের হিস্তা লইত।

পারিবারিক জিনিষপত্রের ভাগবাটোআরায় এক বিচিত্র
নিয়ম ছিল। পুরুষের ইচ্ছায় বিবাহ রদ করিতে হইলে সে
স্ত্রীকে বিবাহের যৌতুক ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিত এবং
অগ্রাণু দ্রব্যও কিছু কিছু দিত। স্ত্রীর ইচ্ছায় “ডাইভোর্স”
ঘটিলে তাহার ভাগ্যে জুটিত অল্পমাত্র সামগ্রী। সন্তানসম্পত্তিরও
ভাগাভাগি হইত। তিন সন্তান ভাগ করিতে হইলে পুরুষ
পাইত প্রথম ও তৃতীয়, নারীর হিস্যায় আসিত দ্বিতীয়।

স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করিবার পর প্রথম স্বামী তাহাকে চাহিলে
সে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে বাধ্য ছিল। এমন কি
দ্বিতীয় স্বামীর বিছানায় পদার্পন করা হইয়া থাকিলেও এই
নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু যদি সাত বৎসর ধরিয়া
কোনো দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গে এই নারী বসবাস করিত তাহা
হইলে আকুষ্ঠানিক বিবাহ না ঘটিলেও তাহার বিবাহিত বলিয়া
গৃহীত হইত।

বিবাহের পূর্বে নারীর সতীত্ব এষ্টটা বিশেষ কিছু বিবেচিত
হইত না। কিন্তু বিবাহের পরে স্ত্রীকে পরপুরুষের ভোগে
দেখিলে স্বামী তাহাকে প্রহার করিতে অধিকারী ছিল। কিন্তু
প্রহারের পর স্ত্রীকে আর কোনো সাজা দেওয়া চলিত না।

কেন্টিক ও জার্মান জাতির গোষ্ঠী-প্রথা ২১৭

স্বামীর নিঃশ্বাস দুর্গন্ধময় এই ওজুহাতে স্ত্রী বিবাহ-ভঙ্গের অধিকার পাইত। এই ধরনের আরও অনেক রীতি দেখা যায়।

সেকালে জমিদার, রাজা বা মালিকেরা যে-কোনো বিবাহিতা নারীর প্রথম রাত্রি ভোগ করিতে অধিকারী ছিল। ক্রমে প্রজারা “সেলামি” দিয়া এই দাবী হইতে অব্যাহতি পায়। হেল্‌সের কাহুনে প্রথম রাত্রির অধিকার কিনিবার সেলামি সম্বন্ধে অনেক বিধান আছে। এই সংহিতার “গোবর্ মের্থ,” মধ্যযুগের “মার্কেতা” এবং ফরাসী “মার্কেৎ” একই রীতির বিজ্ঞাপক।

নারীরা সার্বজনিক-সভায় যোগদান করিয়া ভোট দিতে পারিত। আয়রল্যান্ডের স্বাতি-শাস্ত্রেও এই সবই দেখিতে পাই। হেল্‌সের মতন সেদেশেও “সাময়িক” বিবাহই দস্তুর ছিল। নারীদের সামাজিক এবং “রাষ্ট্রীয়” অধিকার বেশ বড় রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহ-ভঙ্গ বিষয়ে মেয়েদের এক্টিয়ার ছিল উচু। গৃহস্থালীর কাজকর্মের জন্তও মেয়েরা একটা বিশেষ “পারিশ্রমিক” পাইত। আইরিশ-সমাজে অগ্রান্ত পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে “প্রথমা পত্নীর” রেওয়াজও সুপ্রচলিত ছিল। জারজ ও অগ্রান্ত সন্তান উভয়েই পৈতৃক সম্পত্তি ভোগের অধিকারী বিবেচিত হইত।

“জোড়-পরিবার” বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায় কেন্টিক-সমাজে তাহার সকল লক্ষণই বর্তমান। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজে বিবাহের কাহুনগুলা কেন্টিক আইনের তুলনায় কিছু কড়া বোধ হইবে। ইহাতে আশ্রয়ের কিছুই নাই। কেননা সীজারের সময়েও কেন্ট্রা “দলগত” বিবাহ বা অবাধ-যোনি-সংসর্গের স্বপ্নই চালাইতেছিল।

“সেপ্ট” ও “কন্ডাল”

আয়র্ল্যান্ডের গোষ্ঠীকে বলে “সেপ্ট”। “ট্রাইব” বা “জাতির” প্রতিশব্দ “ক্লাইন” বা “ক্ল্যান”। প্রাচীন আইরিশ স্মৃতি-শাস্ত্রে এই প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ত আছেই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ “স্মার্টে”দের রচনায়ও সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল ইংরেজ নৈয়ায়িক আইরিশ গোষ্ঠী-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই সেদেশে মোতায়েন ছিলেন। ক্ল্যান-গত জমিজমা রাজ-সম্পত্তিতে অর্থাৎ খাশ মহালে পরিণত করা ছিল তাঁহাদের কাজ।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আয়র্ল্যান্ডে জমি ছিল “ক্লানে”র অর্থাৎ গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি। কোথাও কোথাও সর্দাররা কিছু কিছু জমি নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেও পরিণত করিয়াছিল। গোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে গোষ্ঠী-সর্দার,—ইংরেজ স্বতীকারগণের ল্যাটিন পরিভাষায় “কাপুট কোগ্নাসিওনিস,”—মৃতের সম্পত্তি গোষ্ঠীর হাতে সঁপিয়া দিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও আয়র্ল্যান্ডে জমিজমার ভাগাভাগি অনেকটা প্রাচীন জার্মানদের প্রথাই ঘটিত; আইরিশ পল্লীগত সমবায়,—জার্মান “মার্ক্,”—“কন্ডাল” নামে পরিচিত ছিল। এই সাবেক যৌথ প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন আজও কিছু কিছু চলিতেছে।

“কন্ডালে”র চাঘোরা আজকাল জমিজমায় “নিজস্ব” ভোগ করে এবং খাজানাও দেয় স্বতন্ত্র ভাবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই “নিজস্ব” বা ব্যক্তিগত হিস্তা ঠিক করা হয় কি করিয়া?

কেন্টিক ও জার্মান জাতির গোষ্ঠী-প্রথা ২১৯

জমিগুলি প্রথমে একত্রে রাখিয়া বিচার করা হয় কোন্ কোন্ অংশ উৎকৃষ্ট, কোন্ কোন্ অংশ মধ্যম, কোন্ কোন্ অংশ নিকৃষ্ট ইত্যাদি। উত্তম মধ্যম অঙ্গুসারে বিভক্ত অংশ-গুলিকে জার্মানির মোজেল দরিয়ার লোকেরা “গেহ্বানে” বলে। আয়ল্যাণ্ডে এই “গেহ্বানে”-গুলি পরিবারসমূহ কর্তৃক একত্রে চষা হয়। ফসল ভাগাভাগি করা হয় পরে। প’ড়ো জমি, মাঠ, ময়দান ইত্যাদি সবই যৌথ রূপে ভোগ করা হইয়া থাকে।

আইরিশ “ক্লন্দাল” পল্লীর জমি ভাগাভাগির মানচিত্র দেখিলে জার্মানির “গেহেকার শাফ্ট” বা কিশাণ-সমবায়ের দৃশ্যই চোখে পড়িবে। মোজেল জনপদে এবং হোখল্যাণ্ড অঞ্চলে এইরূপ কিশাণ-সমবায় প্রচলিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এই দস্তুর আয়ল্যাণ্ডের ভূমি-প্রতিষ্ঠানে দেখা গিয়াছে।

আইরিশ গোষ্ঠীগুলি আজকাল “ক্যাকশন” প্রতিষ্ঠানে কথঞ্চিৎ জীবিত আছে। সাধারণ ইংরেজ স্মৃতি-শাস্ত্রের নজিরে এই প্রতিষ্ঠান বুঝা সম্ভব নয়। পাড়ার্গেয়ে খেলাধুলার সময় আইরিশরা এক প্রকার “জোট” বা দল বাঁধে। এই দল বাঁধাবাদির ভিতর সাবেক কালের গোষ্ঠী-ধর্মই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বাহির হইতে তাহা আন্দাজ করা কঠিন।

কোনো কোনো অঞ্চলে পুরাণো গোষ্ঠীগুলি আজও সাবেক জমিরই উপরই বসবাস করিতেছে। মোনাগান জেলায় নর-নারীদের নাম দেখিতে পাই প্রধানতঃ মাত্র চার প্রকার। সাবেক কালের চার গোষ্ঠী বা “ক্লানে”র বংশধর রূপে এই সকল লোক প্রাচীন সংহিতারই জীবন্ত সাক্ষী বিশেষ।

আমূল্য্যাত্তে পর্যটনের কালে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বড় বড় জমিদারেরা এখনও সাবেক কালের গোষ্ঠী-নায়েক বা “ক্ল্যান”-সদস্যের স্বার্থই রক্ষা করিয়া চলিতেছে। প্রত্যেক চাষীর মঙ্গল তদ্বির করা তাহার এক কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। চাষীর নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় না। চাষীর আপদবিপদে সাহায্য করাও তাহার নিত্যকর্মের অঙ্গ।

স্বচ্ছল লোকেরাও আইরিশ পল্লী-জীবনে দরিদ্রদের মা বাপ। এইরূপ বিশ্বাস পরিবার কারণও পাওয়া গিয়াছে। পর্যটক মাত্রের লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এইরূপ সাহায্যকে “ভিক্ষাদান” বলা চলে না। গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য,—এই জ্ঞানই সমাজের আবহাওয়ায় ছড়াইয়া আছে।

এই কারণেই আইরিশ-সমাজে বর্তমান-জগৎ-মূল্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা নিজস্ব বিষয়ক ধারণা বদ্ধমূল করিতে ঘাইয়া ধন-বিস্তার বিস্তার পণ্ডিত রাষ্ট্রিকেরা হয়রাণ ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দায়িত্বহীন সম্পত্তির অধিকার আইরিশ মজ্জায় বসে না। এই জন্তই ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বড় বড় শহরে যে সকল আইরিশ নরনারী বসবাস করিতেছে তাহারা নব্যনীতিকে দুর্নীতি এবং মানব চরিত্রের কলঙ্ক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ক্রমশঃ তাহারা নিজেই “খেই হারাইয়া” “স্বার্থ”-ভ্রষ্ট হইয়া নীতিহীন জীবনধীন রূপে চলাকেরা করিতে বাধ্য হইতেছে।

স্বাণ্টার স্কটের “ক্ল্যান”-সাহিত্য

স্কটিশ জাতির বিজ্ঞোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে কইল্যাণ্ডে গোষ্ঠী-প্রথা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

কেণ্টিক ও জার্মান জাতির গোষ্ঠী-প্রথা ২২১

স্কটল্যান্ডের “ক্ল্যান”গুলা গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত মরু-কেন্দ্র। এই সকল “ক্লানে”র বৃত্তান্ত আমরা স্কট নামক প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের রচনায় বহুসংখ্যক পাই।

স্কট-বিবৃত “ক্ল্যান”গুলা সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিৎ মর্গ্যান বলেন :—
 “গোষ্ঠী-প্রথার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপই এই সামাজিক জীবন নৃতত্ত্বের আলোচনায় গ্রহণীয়। ব্যক্তির উপর সমষ্টির প্রভাব এই ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রকটিত। * * * “ক্লানে” “ক্লানে” বগড়া ও দাঙ্গাহাঙ্গামা, যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা, ক্ল্যান-সদস্যের প্রতি “ক্লানে”র নরনারীর বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং নরনারীর ভিতর পরস্পর হৃদয়তা এই সকল তথ্যে গোষ্ঠী-জীবনের সকল কথাই ফুটিয়া উঠে। * * * পুরুষের ধারায় বংশাহুজ্রম চলিত। মেয়েদের সন্তানেরা তাহাদের জনকের “ক্লানের” অন্তর্গত বিবেচিত হইত।”

স্কটল্যান্ডে এক সময়ে নারীর আমল প্রচলিত ছিল। তখন “জননী-বিধি” বা মেয়ের সন্তান হিসাবে বংশরক্ষা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হইত। “পিক্ট” জাতির রাজবংশে এই নিয়ম দেখিতে পাই। স্কেন্সের মতন স্কটল্যান্ডেও “পুনালুয়া”-প্রথার বিবাহ অর্থাৎ ভাইবোন ছাড়া অন্যান্য নিকট-আত্মীয়দের ভিতর পরস্পর যৌনি-সংসর্গের বিধান অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। কেননা মধ্যযুগ পর্য্যন্ত “ক্লানে”র সদস্য প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর প্রথম রাজি দাবী করিত। “সেলামি” দিয়া অবশ্য এই দাবী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াও সম্ভব হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জার্মান-সমাজ

জার্মানদের “জেনেওলোজিয়া” এবং “কুনি”

দেশভাগ এবং “বিচরণের” যুগ পর্যন্ত জার্মানরাও যে গোষ্ঠী-কেন্দ্রেই শাসিত হইত এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ডানিউব, রাইন ও হ্রিস্টুলা নদী এবং উত্তর সাগর এই চতুঃসীমার ভিতরকার জনপদ খৃষ্টজন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে তাহাদের দখলে আসে। সিম্ভ্রি এবং টিউটন জাতি তখনও “বিচরণ” করিতেছিল। সুয়েবি জাতি সীজারের আমলে প্রথম স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

সীজার স্পষ্টই বলিয়াছেন:—“সুয়েবিরা জেস্টিবুস্ কোগ-নাতিবুস্ অর্থাৎ গোষ্ঠী ও জাতি হিসাবে বস্তু বসাইতেছিল।” ল্যাটিনদের জুলিয়া গোষ্ঠীর বংশধর সীজার। কাজেই ইনি যখন “জেস্টিবুস্” বা গোষ্ঠী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তখনই বুঝিতেই হইবে যে, ল্যাটিন-সমাজে প্রচলিত সামাজিক প্রথাই জার্মান-সমাজেও প্রচলিত ছিল। সকল জার্মান জাতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

রোমানদের নিকট হইতে জার্মানরা যে সকল জনপদ দখল করে সেই সকল অঞ্চলেও গোষ্ঠী হিসাবেই বস্তু গাড়া হইতেছিল। ডানিউব দরিয়ার দক্ষিণ জনপদে আলেমানিয়ান সংহিতার কাহুন চলিত। সেই কাহুনে দেখি যে, “জেনেওলোজিয়া” অর্থাৎ গোষ্ঠী ক্রমে লোকেরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তী কালে “মার্ক” বা “ডর্ক-গোনোম্মেনশাফ্ট” অর্থাৎ

কেন্টিক ও জার্মান জাতির গোষ্ঠী-প্রথা ২২৩

পল্লী-সমবায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইত তখনকার দিনে “জেনে-ওলোজিয়া” শব্দে তাহাই বুঝা হইত।

সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিৎ কোহ্সালেহ্সস্কি প্রচার করিয়াছেন যে, —“জেনেওলোজিয়া” বাস্তবিক পক্ষে পল্লী-সমবায়ের আগেকার ধাপ। জমিজমা পরিবার-সমবায়ের বিভক্ত করা হইত। যৌথ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হইতে পরে পল্লী-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।”

আলেমানিয়ানরা যে প্রতিষ্ঠানকে “জেনেওলোজিয়া” বলিত বার্গাণ্ডিয়ান এবং লাক্সোবার্ডদের সমাজে সেই প্রতিষ্ঠানকে “ফারা” বলা হইত। কিন্তু এই কেন্দ্রকে গোষ্ঠী বলা হইবে কি পরিবার-সমবায় বলা হইবে কি পল্লী-সমবায় বলা হইবে বিচার সাপেক্ষ।

প্রাচীন জার্মানদের ভাষা বা উপভাষাগুলায় গোষ্ঠীবাচক শব্দের ঐক্য দেখিতে পাইনা। গথিক “কুনি” ও মিড্‌ল্‌-হাই-জার্মান “ক্যিলে” ব্যুৎপত্তি হিসাবে গ্রীক “গেনোস” এবং ল্যাটিন “জেন্স” হইতে অভিন্ন। নারী-বাচক শব্দগুলো একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। গ্রীক “গিনে,” স্লাভ “জেনা” গথিক “কিনো,” নর্স “কোনা,” বা “কুনা” একই শব্দের রূপান্তর। বোধ হয় এই সকল শব্দ সাবেক কালের জননী-বিধির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

লাক্সোবার্ড এবং বার্গাণ্ডিয়ানদের “ফারা” শব্দ ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিমের মতে “ফিজান” ধাতু হইতে উৎপন্ন। “ফিজান” অর্থে জন্ম দেওয়া। কিন্তু বোধ হয় অত দূর না যাইয়া সাধারণ জার্মান ধাতু “ফারেণ” (চলাফেরা করা, হাঁটিয়া যাওয়া বা

ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া) হইতে “ফারা” উৎপত্তি বিশ্বাস করা চলে। তাহা হইলে সেকালে যে সকল লোক একত্রে দল বাধিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিত,—অতএব জাতিকুটুম্ব সমরকুজ নরনারী সকলেই,—“ফারা” নামে অভিহিত হইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং পূর্বে হইতে পশ্চিমে “বিচরণ” করার প্রভাবে “ফারা” শব্দ “গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানে”র ঘোনি বা রক্ত-কেন্দ্র বুঝাইতে থাকে।

গথিক “সিবিয়া” অ্যাংলো-সাক্সন “সিব্,” ওল্ড-হাই-জার্মান “সিল্লিয়া” বা “সিল্লা,” হাই-জার্মান “সিল্পে,”—এই শব্দগুলোও এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক। ওল্ড নর্স ভাষায় এই শব্দেরই বহুবচন “সিল্ফার” অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ প্রচলিত আছে। একবচনে,—“সিফ”রূপে—এই শব্দে সেই নামের কোনো দেবীকে বুঝায়।

হিন্ডেব্রাও-গাথায় একটা শব্দ পাওয়া যায়। হিন্ডেব্রাও হাড্রাব্রাওকে জিজ্ঞাসা করিতেছে:—“জাতির” (“সমাজের”) পুরুষগণের মধ্যে তোমার জনক কে? * * * অর্থাৎ তোমার জাতি কি?” এইখানে “কুয়োন্স্লেস্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

গোটা জার্মান জাতির ভিতর গোষ্ঠী-বাচক কোনো এক শব্দ চুড়িতে হইলে হয়ত গথিক “কুনি”ই সেই অন্ত্যাত্ম ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলার সঙ্গে “কুনি”র যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু ইংরেজি “কিং,” জার্মান “ক্যোনিগ্,” ইত্যাদি শব্দ “কুনি” হইতেই উৎপন্ন। এই সকল শব্দে গোষ্ঠী বা জাতির সর্দার (রাজা) বুঝাইত।

“সিবিয়া,” “সিল্পে” ইত্যাদি শব্দের রেওয়াজ বড় বেশি নয়।

তাহা ছাড়া ওল্ড্‌ নস্‌ "সিক্‌য়ার" বলিলে একমাত্র সমরসত্ত্ব আত্মীয় বুঝাইত এমন নয়। বিবাহের সম্পর্কের কুটুম্বও ইহার অন্তর্গত। কাজেই "সিক্‌" শব্দে সাধারণ হিসাবে দুই গোষ্ঠীর "নরনারী" বুঝিতে হইবে। গোষ্ঠীর প্রতিশব্দ স্বরূপ "সিক্‌" কোনো মতেই চলে না।

মেক্সিকান এবং গ্রীকদের মতন জার্মাণরা মাতে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক সাজাইবার সময় গোষ্ঠী-কেন্দ্র হিসাবে দল গঠন করিত। ল্যাটিন ঐতিহাসিক তাসিতুস্‌ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—“পরিবার এবং আত্মীয় হিসাবে জার্মাণরা ফোজ আনিতে অভ্যস্ত ছিল।” তাসিতুসের আমলে রোমাণ-সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। এই কারণে তাহার বৃত্তান্তে “পরিবার এবং আত্মীয়” ইত্যাদি বিশেষত্ব বর্জিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মামা-ভাগ্নে

তাসিতুসের আর একটা কথা বিশেষ কাজের। ইনি বলিয়াছেন :—“জননীর ভাই তাহার তাহার ভাগ্নেকে নিজ সন্ধান বিবেচনা করে। অনেকের বিবেচনায় মামা-ভাগ্নের সম্বন্ধ বাপ-বেটার সম্বন্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিকে জামিন হইতে হইলে ভাগ্নের ডাক পড়ে আগে। লোকেরা ছেলেকে জামিন ভাবে না লইয়া ভাগ্নেকেই জামিন লইতে লালায়িত।

এইখানে জননী-বিধি-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ স্বাভাবিক গোষ্ঠী-

প্রথাই দেখিতেছি। • এই প্রথাই ল্যাটিন ঐতিহাসিকের মতে
জার্মান-সমাজের বিশেষ লক্ষণ ছিল।

এই ধরনের জামিনের ফলে যদি ছেলের উপর কোনো প্রকার
অত্যাচার ঘটে তাহা হইলে ইহাতে মাত্র তাহার জনকের
পক্ষে একটা ব্যক্তিগত অনিষ্ট সাধিত হইল এইরূপ বিবেচিত
হইত। কিন্তু যদি ভাগ্নের গায়ে হাত পড়ে তাহা হইলে
গোটা গোষ্ঠী-ধর্ম্মে ঘা লাগিত। এই ধরনে ভাগ্নের মৃত্যু
ঘটিলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত যে নিকট-আত্মীয় দায়ী
তাহাকে লইয়া টানাটানি পড়িত। হয় তাহার পক্ষে এই
ভাগ্নেকে জামিন স্বরূপ যাইতে দেওয়া উচিত হয় নাই, না হয়
জামিনের কড়ার যাহাতে রক্ষা পায় সেই অহুসারে সে কাজ
করিতে বাধ্য ছিল। জার্মান-সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা সম্বন্ধে অন্য
কোন প্রমাণ না পাইলেও একমাত্র এই বিধানই তাহার স্থান
পূরণ করিতে সমর্থ।

মামা-ভাগ্নের সম্বন্ধ বিষয়ে গ্রীক দেবদেবীর-তথ্যে অনেক
পরিচয় পাই। আল্‌থায়্যা নাম্নী নারীর ভাইয়ের ছেলেদিগকে
তাহার নিজ ছেলে হত্যা করে। নারীর চিন্তায় তাহার সম্ভানের
কাজ অতি গর্হিত। সে শাপ দিল যেন হত্যাকারীর মৃত্যু হয়।
দেবতাদের অহুগ্রহে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিলও এবং তাহাতে
জননী সুখী হইয়াছিল।

কিনেউন্স তাহার দ্বিতীয় পত্নীকে সুখী করিবার জন্ত
প্রথম পত্নীর সম্ভানদিগকে বেইজ্ঞ করে। প্রথম পত্নীর ভাইয়ের
ভাগ্নেদের উদ্ধারে লাগিয়া যায়। এবং কিনেউন্সের বরকন্দাজ-
দিগকে খুন করিয়া সন্তুষ্ট হয়।

“দেবতাদের উবা” এবং “জুনিয়ার খতম” এইভাবে প্রকাশের অল্পরূপ একটা স্বপ্ন-গাথা ওক্ নন্ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। তাহার নাম “ফেলুগ্গা,” এইটা তাসিতুলের ৮০০ বৎসর পরের রচনা। গানটা এক নারী-ঋষির বা যোগিণীর “ঋক্” রূপেই বিবৃত হয়। বাড্ এবং বুগ্গে নামক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি এই “ঋকে” খৃষ্টীয় প্রভাব দেখিয়াছেন। জগতের মহাপ্রলয় ঘটিবার সম সম কালে “ধর্মন্তু গ্রানি” এবং “অভ্যুত্থানম্ ধর্মন্তু” নাকি চরম মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। সেই সকল কথা এই গাথার “মুকা”।

একটা পংক্তি নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে :—

“ব্রোড্র মুহ্ বেরয়াক্ ওক্ আট্ বোরুম্ ফের্ডাক্ মুহসিস্জ্জার সিক্ যুম্ স্পিল্লা।”

অর্থাৎ “ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করিয়া মরিবে এবং পরস্পর পরস্পরকে খুন করিয়া ছাড়িবে আর বোনের সন্তানসন্ততির রক্তের বন্ধন ভাঙিয়া ফেলিবে।”

“সিস্জ্জার” শব্দের অর্থ “মায়ের বোনের ছেলে” অর্থাৎ মাসভূত ভাই। কবির বিচারে ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনির চেয়ে মাসভূত ভাইয়ের পক্ষে রক্তের টান ছিঁড়িয়া ফেলা বেশি মাত্রার দোষের বা নিন্দার কথা।

এই গাথায় “সিস্জ্জার” শব্দের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কবি এই শব্দের দ্বারা ঘোরতর পাতকের আবির্ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। “মায়ের বোনের” ছেলে এইরূপ পাপ কর্ম করিতেছে—এই দৃষ্ট গাথায় অতি ভয়ঙ্কর বিবেচিত হইয়াছে। এই শব্দের ঠাইয়ে যদি “সিস্জ্জিনা-বোর্ণ” (অর্থাৎ ভাই-বোনের ছেলে) কিবা, “পুসিস্জ্জিনা-গিনির”

(অর্থাৎ ভাই বোনের পুত্র) ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে কবির বক্তব্যে জোর কিছু কমিয়া যাইত। এই কারণে মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধওয়ালা শব্দের দ্বারা আত্মীয়দের খুনাখুনি বিবৃত হইয়াছে। মোটের উপর বুঝিতে হইবে যে, “স্বিকিণ্ড”দের যুগে জননী-বিধির শ্রুতি বেশ আগ্রতই ছিল।

তাসিতুস্ যে সকল জার্মাণদের সঙ্গে সুপরিচিত তাহাদের সমাজে জননী-বিধির ঠাইয়ে পুরুষ-বিধি দেখা দিয়াছিল। বাপের পর ছেলেপুলেরা উত্তরাধিকারী। ছেলেপুলে না থাকিলে ভাই এবং খুড়া জ্যাঠারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করিত। কিন্তু তাহাদের ভিতরও দেখা যায় যে, মায়ের ভাই উত্তরাধিকার হইতে একদম বঞ্চিত নয়। বুঝিতে হইবে যে, জননী-বিধি অল্পকাল হইল মাত্র উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রভাব পূরাপূরি লুপ্ত হয় নাই।

জার্মাণ-সমাজে “জননী-বিধি”

মধ্যযুগের বহুদিন পর্য্যন্ত জননী-বিধির প্রভাব দেখিতে পাই। জনক সম্বন্ধে সন্দেহ করা সে যুগের জার্মাণ জাতির মজ্জা হইতে উঠিয়া যায় নাই। বিশেষ করিয়া “সাক্” ভূমি গোলাম বা দাস-কিষাণ সমাজে এইরূপ সন্দেহ বেশ প্রবল ছিল। মাওয়ার প্রণীত “ষ্ট্যেট্টে কার্কাহুন্ড্” (অর্থাৎ নগর-শাসন প্রণালী) গ্রন্থে আউগ্‌স্বর্গ্, বাজেন এবং কাইজার লাউটার্ণ শহরের দস্তুর বিবৃত আছে।

কোনো “সাক্” বা দাস-কিষাণ তাহার মনিব জমিদারের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শহরে পলাইয়া গেলে

জমিদার তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে অধিকারী ছিল। কিন্তু শহরের শাসনকর্তারা এই কিসাণকে চিনিয়া লইবার জন্য জমিদারকে কতকগুলি নিয়ম মানিতে বাধ্য করিত। প্রধান কথা এই যে, কিসাণের ছয় জন নিকট আত্মীয়কে শপথ করিয়া বলিতে হইত যে, এই ব্যক্তি বাস্তবিকই জমিদারবাবুর গোলাম। এই নিকট আত্মীয় কাহারা? সেকালের নগর-নীতি অহুসায়ে ইহারা সকলেই পলাতক কিসাণের মায়ের তরফের লোক। বাপের দিককার আত্মীয়দের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত না।

জননী-বিধির আর একটা সাক্ষ্য জার্মানী সমাজে অতিমাত্রার নারী-ভক্তি। রোমাণরা জার্মানদের এই স্বভাব একদম বুঝিয়া উঠিতেই পারিত না। জার্মানদের সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি করিলে রোমাণরা সেই চুক্তির সর্বাপেক্ষা বড় জামিন পাইত “ভদ্র” বা “বড়” ঘরের জার্মান মহিলাদিগকে। মেয়েরা শত্রুর হাতে ধরা পড়িবে অথবা দুস্মনের বাদীগিরি করিতে বাধ্য হইবে এই ভয় ও লজ্জাই জার্মান পুরুষদের হৃদয়ে লড়াইয়ের সময় সাহস জাগাইয়া তুলিত। নারীর বাণী ছিল তাহাদের চিন্তায় একপ্রকার ধর্মোপদেশ বা নীতির ডাক বিশেষ। গুরুতর কাজের সময় মেয়েদের কথা শুনা জার্মানদের স্বধর্মের মধ্যে পরিগণিত।

গল (সেকালের ফ্রান্স) দেশে রোমাণ শাসন ধ্বংস করিবার আন্দোলনে জার্মান এবং বেলজিয়াম জাতি মাথা তুলিয়াছিল। সিঙ্ঘিলিস ছিল সেই বিদ্রোহের নায়ক। কিন্তু বিদ্রোহীরা সকলেই এক নারীর নিকট দীক্ষা পায়। লিগ্নে দরিয়ার উপর-কার এক পল্লী-মন্দিরে নারী ছিল পুরোহিতা—নাম ফেলেনা।

ঘরকন্মায় জার্মান নারী ছিল রাণী বিশেষ। তাসিতুসের

বিবরণে জানা যায় যে, পুরুষেরা হয় শিকার করিয়া ফিলিক্স অথবা বাহিরে বাহিরে আড্ডা মারিয়া টো টো করিয়া বেড়াইত। কিন্তু মেয়েরা থাকিত ঘরের কাছে ব্যস্ত। বৃদ্ধা পুরুষ এবং ছেলেপুলেরা মেয়েদের কাছে সাহায্য করিত।

তাসিতুসের “জার্শাণিয়া”

যদি চবিত কাহারো একথা তাসিতুসের গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না। দাসেরা “টাইদ” নামক কর দিত কিন্তু তাহাদের দ্বারা জোর জবরদস্তি করিয়া কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই অহুমান করা চলে, পুরুষেরা যে, একদম আড্ডা মারিয়াই সময় কাটাইত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। চাষআবাদের কাজ সামলানো ছিল তাহাদেরই কাজ।

“জোড়-পরিবার” প্রথায় বিবাহ চলিত। এক-পত্নী (পতি)ও তখনও পরিষ্কাররূপে দেখা দেয় নাই। পয়সাওয়ালারা বহু-পত্নীও চালাইত। কুমারীদের সতীত্ব রক্ষা করার দিকে জার্শাণ-সমাজে নজর ছিল তীক্ষ্ণ। এই হিসাবে কোন্টক নীতি ছিল উন্ট। তাসিতুস জার্শাণ-সমাজে বিবাহিত জীবনের ভক্তিব্যোগ সম্বন্ধে খুব তারিফ করিয়াছেন।

পূর-পুরুষ-গমন সম্বন্ধে তাসিতুস মাত্র এই বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্ত্রী-বর্জন ঘটত। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তাসিতুসের বৃত্তান্তে অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। আসল কথা, তাসিতুস এখানে তখনকার দিনের উচ্ছৃঙ্খল রোমাণ নরনারী মহলে নীতিশিক্ষা বা হিঁকোশদেশ প্রচার করিয়াছেন এইরূপই বুঝিতে

হইবে। জার্মান জাতিকে সংযত-যোনি রূপে বিবৃত করা তাহার পক্ষে “ঝিকে ঘেরে বৌকে শেখানো” বিশেষ।

যদি একথা সত্যই হয় যে, জার্মানরা “বনবাসের যুগে” অর্থাৎ “বিচরণে”র কালে নানা সদৃশ্যের অবতার বিশেষ ছিল, আসল কথা এই যে, যেই তাহারা দুনিয়ার সংস্পর্শে আসিল তৎক্ষণাৎ তাহাদের সতীত্ব, দাম্পত্যধর্ম, যোনি-সংযম ইত্যাদি সবই উড়িয়া গেল। অস্ফাট ইয়োরোপীয়েরা এই সকল বিষয়ে ধেরূপ জীব সেইরূপ জীবে পরিণত হইতে জার্মানদিগকে বেশি সময় দিতে হয় নাই।

রোমান “সভ্যতার” আওতায় পড়িয়া জার্মানরা নিজ নিজ ভাষাগুলি হারাইয়া বসিয়াছে। একথা সকলেই জানে। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই তথাকথিত সংযম ইত্যাদির সদৃশ্যগুলো হারাইয়াছে আরও শীঘ্র, এই তথ্যটাও জানিয়া রাখা দরকার। তুর শহরের থ্রেগ্রোরিয়ুসের রচনা এই নৈতিক অধোগতির সাক্ষী।

আদিম বনজঙ্গলের প্রাকৃতিক জীবনে জার্মানরা সভ্যতাব্য নাগরিক রোমানদের চেয়ে বেশি সংযত এবং ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ ছিল এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন নয়। কিন্তু তাসিতুস্ যে জার্মান জাতিকে নরনারীর যোনিসংশ্রব বিষয়ে নেহাৎ আদর্শহানীয়রূপে বর্ণনা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তিই তাহার সঙ্গে একমত হইতে পারে না।

গোষ্ঠী-প্রথার এক স্বধর্মই এই যে,—প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বাপদাদাদের শত্রুগুলোকে নিজের শত্রু বিবেচনা করিতে বাধ্য। অধিকন্তু সাবেক কালে ছিল “ধনের বললে ঘুন” নীতি প্রচলিত।

এই নীতি ভাঙিয়া “হের-গেড” বা অর্থ-দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। হত্যা বা অন্য কোনো শারীরিক নির্যাতনের সাজা স্বরূপ দোষী ব্যক্তিকে টাকা দিতে বাধ্য করা হইত। জার্মান-সমাজে এই ছিল দণ্ডর।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও পণ্ডিতেরা “হের-গেড”কে খাটি স্বদেশী জার্মান বিশেষত্ব বিবেচনা করিতেন। নৃতত্ত্বের অমূল্যজ্ঞানকারীরা আজকাল জানেন যে, এই প্রতিষ্ঠান জার্মানদের একচেটিয়া মাল নয়। জগতের অসংখ্য সমাজে এই প্রথা দেখা গিয়াছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিরাও “অর্থদণ্ড” নীতি কায়ম করিয়াছিল।

অতিথি-সংস্কারের রেওয়াজও জার্মান জাতির নিজস্ব কিছু নয়। ইণ্ডিয়ানরা এই বিষয়ে জার্মানদেরই “মাসতুত ভাই”। তাসিভুসের “জার্মানিয়া” গ্রন্থে এই বিষয়ে যে সকল বিবরণ আছে সেগুলি মর্য্যানের ইরোকোয়া-সমাজ সম্বন্ধে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

পরিবার ? না “পল্লী” ?

জার্মান-সমাজে জমি ভাগাভাগি এবং চষা হইত কি প্রশালীতে এই সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে লাঠালাঠি চলিতেছিল। সে সব তর্ক আজকাল এক প্রকার চুকিয়া গিয়াছে। এখন সকলেই স্বীকার করে যে,—হুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন সমাজেই প্রথম প্রথম গোটা গোষ্ঠী সমবেত ভাবে জমি চষিত। পরে পরিবারেরা যৌথভাবে চাষস্বাবাদ স্বীকৃতি করে। এইরূপ পারিবারিক যৌথ চাষ সীজারের আমলে হুয়েবি নামক জার্মান

সমাজে দেখা গিয়াছে। কাজেই কয়েক বৎসর পরপর সেধুগে জমিগুলার ভাগবাটোআরা করা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জাৰ্মানিতে পুনঃপুনঃ জমি ভাগাভাগির রীতি প্রচলিত ছিল।

সীজার ষ্টেপ্লুৰ্গ প্রথম শতাব্দীর ল্যাটিন সেনাপতি। আর তাসিতুস্ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক। দু'য়ে তফাৎ প্রায় দু'শ' বৎসর, সীজার দেখিয়াছিলেন স্বয়েবির। "পারিবারিক সমবায়" হিসাবে জমি চষিতেছে। তাসিতুসের সময়ে জাৰ্মানরা ব্যক্তিগতভাবে "নিজ নিজ" জমি চষিতেছিল। সেই সময় প্রতি বৎসর জমি ভাগাভাগি করা হইত। অর্থাৎ পূরাপূরি নিজস্ব সম্পত্তির প্রথা দু'শ' বৎসরের ভিতর গজিয়া উঠে নাই। তখনও প্রচুর জমি যৌথ ব্যবহারের জন্য পড়িয়া থাকিত।

এখন একটা নতুন প্রশ্ন উঠিয়াছে। কোহ্‌স্‌লেহ্‌স্‌কি বলেন:—"মাজ্জাতার আমলের জননী-বিধি-নিয়ন্ত্রিত যৌথ সম্পত্তিশীল সমাজ আর বৰ্ত্তমান যুগের পরম্পর-স্বাধীন-পারিবারিক-কেন্দ্র এই দু'য়ের মধ্যে দুনিয়ার প্রায় সৰ্ব্বত্রই আর এক প্রকার সামাজিক জীবন দেখা যায়। সে পুরুষ-বিধি-নিয়ন্ত্রিত যৌথসম্পত্তিশীল পারিবারিক সমবায়।"

এতদিন মাওয়ার এবং হ্ৰাইট্‌স্ এই দুই পণ্ডিতের ভিতর ঝগড়া চলিতেছিল। প্রশ্নটা এই:—"সেকালে ধনদৌলত যৌথ ছিল না ব্যক্তিগত ছিল?" কোহ্‌স্‌লেহ্‌স্‌কির গবেষণার ফলে আজকাল প্রশ্নটা এত সরল নয়। সমস্তা এখন নিম্নরূপ:—"ধনদৌলতের যৌথ রূপটাই কোন্ নিয়মে চলিত?"

সীজারের আমলে স্বয়েবির। জমির অধিকারী ছিল যৌথ

ভাবে, জমি চষিতও যৌথ ভাবে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য নাই। কিন্তু এই যৌথ-কেন্দ্রটা কি? গোষ্ঠী, না পরিবার-সমবায়, না এই দু'য়ের মাঝামাঝি একটা অল্পকোনো প্রকার সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমাজ-কেন্দ্র? এই তিন কেন্দ্রই বা কি সেকালে একসঙ্গে জাৰ্জিয়ার বিভিন্ন জনপদে প্রচলিত ছিল?

কোহলালেক্সনস্কি বলেন :—“তাসিতুসের সাক্ষ্য অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, তখনও পল্লী-সমবায় বা মার্ক গড়িয়া উঠে নাই। তখন পারিবারিক সমবায়ই আর্থিক জীবনের প্রতিষ্ঠান ছিল। পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠান হইতে পল্লী-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে।”

কাজেই দেখিতেছি যে,—রোমাণ আমলের জাৰ্জিয়ার “পল্লী” নামক প্রতিষ্ঠান চিনিত না। তাহাদের জীবন-কেন্দ্র ছিল সমবায়-নিয়ন্ত্রিত পরিবার-সমাজ। এই পারিবারিক সমষ্টিগুলা পুরুষাঙ্কমে যৌথ ভাবে চাষের জমি ভোগ করিত। অপরাপর জমিগুলার ভোগ সম্বন্ধে তাহাদের প্রতিবেশীদেরও অধিকার থাকিত।

এই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে তাসিতুসের বৃত্তান্তে জমি ভাগাভাগি সম্বন্ধে কি বুঝিতে হইবে? বুঝা যায় এই যে, পারিবারিক সমষ্টিগুলা প্রতি বৎসরই একটা করিয়া নতুন জমির টুকরা চষিত। পূর্ববৎসরের চষা জমি পরবর্তী বৎসর কেলিয়া রাখা হইত। অর্থাৎ দেখিতেছি যে, তাসিতুস-বিবৃত্ত বিধান স্বয়ং বা ভোগের অধিকার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে না। ইহাতে চাষআবাদের একটা দৃষ্টর বিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। ইহা কৃষিবিচার কথা,—স্বয়ং নীতির কথা নয়।

তখনকার দিনে লোক সংখ্যা বেশি ছিল না কাজেই প’ড়ো

জমি অনধিকৃত থাকিত অনেক। সুতরাং জমিজমা লইয়া বগড়া-ঝাঁটি বাধিতও কম। পরে যখন পরিবার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌথ চাষ-অধিবিকাশনক হইয়া পড়ে তখন পারিবারিক সমষ্টিগুলি ভাঙিয়া যায়। এই অবস্থা ঘটিতে অল্প অনেক শতাব্দী লাগিয়াছে।

পারিবারিক সমবায়গুলার ঠাইয়ে উৎপন্ন হয় স্ব স্ব প্রধান পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরিবার। সাবেক কালের যৌথ ময়দান, পশুচারণের মাঠ ইত্যাদি জমি এই সকল পরিবারের নিজস্ব পরিণত হয়। চাষজীবাদের জমিগুলি প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর পরপর ভাগাভাগি করা হইত। অবশেষে এই সকল জমিও পরিবারের স্থায়ী স্থাবর সম্পত্তি দাঁড়াইয়া যায়।

জার্মানদের সমাজে জমিজমার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সকল কথা ঠারেঠোরে বলা হইতেছে সে সব কথা কৃষি সম্বন্ধে নিরেট ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে সপ্রমাণ করা সম্ভব। কোল্লা-লেহ্‌স্‌কি-বিবৃত এই ব্যাখ্যা-প্রণালী অবলম্বন করিলে জার্মানির নরনারীর এবং জার্মান জাতীয় অন্যান্য সমাজের আর্থিক সংঘটনগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে যতটা মিলে তাসিতুস্-বিবৃত পল্লী-সমবায় স্বীকার করিয়া লইলে ততটা মিলে না।

প্রাচীনতম জার্মান স্থতিশাস্ত্রের ভিতর “কোদেক্‌স্‌ লাওরেশা-মেন্‌সিস্” অন্ততম। এই স্থতির বিধান পারিবারিক সমবায়ের সঙ্গেই খাপ খায়। পল্লী-সমবায়ের সমাজ এই স্থতির বিধিনিষেধের সঙ্গে মিলে না। তবে গোষ্ঠী আর পল্লীর মাঝামাঝি এই পারিবারিক যৌথ-কেন্দ্র জার্মান জীবনের ক্রমবিকাশে সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে হইবে এইরূপ মত প্রচার করা অতি লক্ষ্যের কাজ।

জার্মানদের কৃষিশিল্পে বাণিজ্য

সীজারের সময়ও জার্মানরা ‘ভবঘুরের দল’। তখন তাহারা ঘর পায় পায় অবস্থায় আসিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহাদের “বিচরণের যুগ” চলিয়া গিয়াছিল। কোনো কোনো সমাজ স্থির-প্রতিষ্ঠ-“গৃহস্থ”ও হইতে পারিয়াছে। কিন্তু তমিস্তুসের আমলে জার্মানরা সর্বত্রই প্রায় এক শ’ বৎসর ধরিয়া পাকাপাকি “গৃহস্থ”। তখন ইহারা বাস্তবিকতার মালিক। দরকার তখন তাহাদের অনেক বাড়িয়াছে। কাজেই দরকার অসুখান্নী মাল তৈয়ারি করিবার পথেও তাহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

তামিস্তুসের আমলের জার্মানরা লম্বা লম্বা ব্যারাক-সদৃশ ভবনে বাস করিত। পোষাক ছিল তাহাদের বনজঙ্গলের মাফিকই আদিম। পশমের ঢাকনা এবং জানোআরের খোল ছিল মামুলি বসন। নারী এবং ধনীদের রেওয়াজ ছিল লিনেন বা মিহিনুতার (স্লাক্স) জামায় অঙ্গ আবৃত করা। দুধ, মাংস, বস্ত্রফল ইত্যাদি ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য।

প্লিনি বলেন :—“ওটশস্তের খিচুড়ি জার্মানদের সমাজে খাদ্যতালিকায় বড় ঠাই পাইত।” আজও আয়র্ল্যান্ডের এবং স্কটল্যান্ডের কেন্টিক সমাজে “ওটমিল পরিজ্ঞ” প্রিয়খাদ্য।

পশু-সম্পদই ছিল জার্মানদের বড় সম্পত্তি। কিন্তু জানোআর-গুলা নিকট শ্রেণীর জীব। গাভীগুলা দেখিতে বিল্লী। তাহাদের শিঙ ছিল না। ঘোড়াগুলা বেঁটে এবং জোরের সহিত দৌড়িতে পারিত না। মুদ্রা ব্যবহৃত হইত নেহাৎ কম।

তাহাও রোমান টাকা। সোনা রূপার গহনা তাহারা আদরও করিত না, তৈয়ারিও করিত না। লোহা ছিল বিরল। রাইন এবং ডানিউব দরিয়ার অঞ্চলে যে সকল লোহার জিনিষ ব্যবহৃত হইত সেইগুলি সবই আমদানি করা মাল। লোহার খনিতে কাজ করা জার্মানরা জানিত না।

গ্রীক এবং ল্যাটিন হরফের নকলে এক প্রকার লিপি জার্মান সমাজে চলিত। তাহার নাম “রুনেন”। কিন্তু ভাষার অক্ষর হিসাবে এইগুলির ব্যবহার হইত না। সঙ্কেত চিহ্ন মাত্র রূপে এইগুলির চল ছিল। এই চলও আবার একমাত্র ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিত।

নরবলি তখনও জার্মান-সমাজে চলিতেছিল। এক কথায় “বার্কার” যুগের “মধ্যস্তর” হইতে “উচ্চতর” উঠ’ উঠ’ এই অবস্থায় তাসিতুস্ জার্মানদিগকে দেখিয়াছেন। যে সকল জাতি রোমানদের সংস্পর্শে বেশি আসিত তাহারা রোমান মাল কিনিত। কাজেই ধাতুজ পদার্থ অথবা বয়ন-শিল্প এই সকল সমাজে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু উত্তর পূর্বে,— বাল্টিক অঞ্চলে জার্মানরা স্বাধীনভাবে এই সকল শিল্প গড়িয়া তুলিতেছিল।

স্লেজ্‌স্বিক প্রদেশে প্রাচীন জার্মানদের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলার ভিতর একটা লম্বা লোহার তলোয়ার, একটা লোহার পোষাক, একটা রূপার শিরজ্ঞান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া জার্মানরা পশ্চিম এবং দক্ষিণ ইয়োৰোপে ছড়াইয়া পড়িবার পর এই সকল দেশে জার্মান ধাতুজ দ্রব্যও চলিতে থাকে। এই সকল ধাতুর কাজে জার্মানদের রশি

যে রোমান শিল্প হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এমন কি কোনো কোনো বিষয়ে খাৎশিল্প জার্মানদের হাতের সাফাইয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে যে ক্ষেত্রে জার্মান মিস্ত্রীরা রোমান ছাঁচের নকলে যত্নপাতি তৈয়ারী করিত সেই সকল ক্ষেত্রেও জার্মানরা রোমানদের চেয়ে ভাল মালই গড়িত এইরূপ বিশ্বাস করা চলে।

*তখনকার দিনে ইংল্যাণ্ড ইত্যাতি ইন্ডোরোপের সকল দেশই রোমান সাম্রাজ্যের এবং সভ্যতার অধীনে ছিল। জার্মানরা এই আওতায় প্রবেশ করিবারাত্র তাহাদের স্বদেশী খাৎশিল্প প্রায় সর্বত্রই নষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র ইংল্যাণ্ডে জার্মান জাতীয় শিল্প বজায় থাকে। তবে পেতলের গহনার টুকরা বার্গান্ডি, কমেণিয়া এবং দক্ষিণ রুশিয়ার আজহ-সাগর জনপদ ইত্যাতি ভিন্ন ভিন্ন বহুদূরস্থিত অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি দেখিলেই মনে হইবে যেন ইংল্যাণ্ড এবং সুইডেন ইত্যাতি দেশের স্রাকরারাই এই সব প্রস্তুত করিয়াছে। অর্থাৎ এইগুলি জার্মান শিল্পীদেরই হাতের কাজ।

সার্বজনিক সভা

“বার্কার” যুগের “উচ্চতর” স্তরের অঙ্গরূপই ছিল জার্মানদের সমাজ-শাসন-প্রণালী। তাসিত্বের বৃত্তান্তে জানিতে পাই যে, জার্মান-সমাজে দুইটা সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রথমটা “থ্রিন্সিপে” অর্থাৎ সর্দারদের পরিষৎ। দ্বিতীয়টা সার্বজনিক সভা। সর্দার-পরিষৎ ছোটখাটো বিষয়ে আলোচনা করিয়া ইতিকর্তব্য স্থির করিতে অধিকারী ছিল। বড় বড় বিষয়ে

তার অধিকার ছিল মাত্র সমীক্ষা করা এবং সার্বজনিক সভার নিকট সেগুলি পেশ করা।

এই সার্বজনিক সভাটা কিরূপ? “বার্কার” যুগের “নিম্নতম” স্তরের সাক্ষ্যরূপ আমেরিকার ইতিহাস-সমাজে দেখা গিয়াছে যে, সার্বজনিক সভায় হাজার ধাকিত “গোষ্ঠী”র লোক। “ট্রাইব” (“জাতি”) অথবা লীগ জাতি-সমূহ এই সভার ধার ধারিত না। জার্মান-সমাজেও এইরূপ বিশ্বাস করা চলে।

জার্মান-সমাজে সর্দার ছিল দুই প্রকার। শাস্তির কাজের সর্দারের নাম “প্রিন্সিপে”। লড়াইয়ের সর্দারকে তাসিতুস বলিয়াছেন “হুসে”। ইরোকোআ-সমাজেও এই দ্বিবিধ নায়কের ক্রথা অবগত হওয়া যায়।

শাস্তির সর্দারেরা পশু, শস্ত ইত্যাদি বস্তু গোষ্ঠীর নিকট হইতে “সিধা” পাইত। এই সিধার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। ইরোকোআদের মতন জার্মান-সমাজেও কোনো এক পরিবার হইতে এই সকল নায়ক বাছাই করা হইত। “পুরুষ-বিধি” প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালে বাছাই প্রথা উঠিয়া যায়। তখন জন্মের অধিকারে বংশগত সর্দার দেখা দেয়। গ্রীস এবং রোমের সমাজেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে জার্মান গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এক একটা করিয়া কুলীন, অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত বংশ গড়িয়া উঠে। বিচরণের কালে এবং পরে এই সকল বংশ অনেকটা খর্ব হইতে বাধ্য হয়। *

“হুসে” বা রণ-নায়কেরা একমাত্র গুণ অহুসারে নির্বাচিত হইত। তাহাদের ক্ষমতা এমন কিছু বেশি ছিল না। তাসিতুস

“লাওস্‌ক্রেখ্ট” বা “ভাঙ্কাটিয়া কোজ” জার্মান-সমাজের এক কলঙ্কময় প্রতিষ্ঠান। এই সকল বেতনভোগী আদর্শহীন লড়াই-ব্যবসায়ী কলঙ্কমাজ বা পণ্টনের আবির্ভাব সেই প্রাচীন রণ-সর্দারদের সাময়িক দলবলের ভিতরই লক্ষ্য করিতে হইবে। রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জার্মানদের হাতে আসিবার পর এই সব রাজ-পেটোয়া গুণ্ডারাই অভিজাত বংশের অর্দ্ধেক অংশ গড়িয়া তোলে। রোমান দরবারের মোসাহেবরাও এই ধরনের অভিজাত্যে দল পুরু করিয়াছে।

সমাজের উপর দেখা গেল যে, জার্মান জাতিগুণীর শাসন প্রণালী গ্রীকদের “বীর যুগ” এবং রোমানদের তথাকথিত “রাজ যুগ” এই দুই স্তরের অনুরূপ। সার্বজনিক-সভা, সর্দার-পরিষৎ এবং লড়াইকায়ক বা রাজা,—এই তিন অঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ছিল। গোষ্ঠী-প্রথায় ইহাই শাসন-পদ্ধতির চরম বিকাশ। “বার্কার” যুগের “উচ্চতম” স্তরে এই পদ্ধতি ছাড়াইয়া উঠা কোনো সমাজেই সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু যেই মানব-সমাজ এই শাসন-কাঠাম ছাড়াইয়া উঠিবার দরকার বোধ করিতেছিল তখনই গোষ্ঠী-নীতির আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছিল। সমাজ এক নবযুগোপযোগী নবীন স্বধর্মের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই স্বধর্ম “রাষ্ট্র”-নীতির কথা।



শ্রেণীর লোককে সমাজে বড় কলিয়া তুলিতেছিল। মামুলি শ্রুতি-শাস্ত্রের বিধানে স্বাধীনতা-পাওয়া-গোলামেরা গোষ্ঠীর একজন রূপে গৃহীত হইত না কাজেই সমাজে ইহাদের ঠাই ছিল নেহাৎ নগণ্য। কিন্তু রাজারা ইহাদিগকে ধন, খেতাব ইত্যাদি দিয়া সমাজে মাথা তুলিবার সুযোগ দিয়াছিল।

রোমান সাম্রাজ্য ভাঙিবার জন্ত যে সকল জার্মান রণ-নায়ক দায়ী তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে “রাজা” হইয়া বসে। ইহাদের প্রিয়পাত্র যে সকল গোলাম বা স্বাধীনতা-পাওয়া-গোলাম তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে সম্রাস্ত কুলীন বংশের জনক হয়। ফ্রাঙ্ক-সমাজে এই ধরনের গোলামেরাই প্রথমে রাজ-দরবারে, পরে রাষ্ট্রে মন্ত মন্ত লোক হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী, সম্রাস্ত বা কুলীন বংশের অনেকগুলার পূর্ব-পুরুষই এই সব গোলাম।

রাজপদ গড়িয়া উঠিবার ব্যবস্থায় প্রধান সাহায্য আসে সামরিক দলবলের গঠন হইতে। আমেরিকার “রেডস্কিন” ইণ্ডিয়ান-সমাজে গোষ্ঠী-কেন্দ্রের ভিতর ভিতর স্বাধীন ভাবে লড়াইয়ের কেন্দ্র বা পন্টনের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল দলই জার্মান-সমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

“লড়াই-সর্দার” ও “কত্রিয়-শ্রেণী”

রণ-নায়ক নামজাদা হইবামাত্র এই ধরনের বহুসংখ্যক পালোআন-শ্রেণীর যুবকে নিজ পেটোআর অন্তর্গত কলিয়া লইত। নায়কে আর যুবায় পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধরূপে ভক্তি-স্বাক্ষর বিনিময় হইত। রণপ্রিয় যুবদিগের ভরণপোষণের ভার

থাকিত নায়কের হাতে। তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে সজ্জবদ্ধ করাও ছিল তাহার রক্ষণনীতির অন্তর্গত। একদল হইত তাহার ব্যক্তিগত শরীর-রক্ষী। দ্বিতীয় দলকে তৈয়ারি করা হইত ছোট খাটো অভিযান এবং লুটপাটের জন্ত। বড় বড় কাণ্ডকারখানার জন্ত উচ্চপদের সেনা-নায়কের দল তৈয়ারি করিয়া রাখিবার দিকেও তাহার দৃষ্টি থাকিত।

এই সকল পালোআন লুটপাট প্রিয় পোটোআর দল সমাজে বড় বেশি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ ইতালীতে ওডোআকারের আমলে এই ধরনের সামরিক দলবল বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ইহাদের ছায়ায় মলিন হইতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোষ্ঠী-জীবনের বিশেষত্ব যে স্বাধীনতা তাহা ইহাদের উৎপাতে অনেকটা খর্ব হইতে থাকে।

রাজপদকে শক্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে এই সকল “ক্ষত্রিয় শ্রেণী” “সামরিক গুণ্ডার দল”ই ছিল মস্ত সহায়। তাসিভুস বলেন :—“এই সকল দলকে ‘খোরাক’ দিবার জন্ত রণ-নায়কেরা সর্বদাই লড়াই, লুটপাট বা দাঙ্গাহাঙ্গামায় মত্ত থাকিতে বাধ্য হইত।” পালোআনের দলকে তোআজ করা লড়াই ছাড়া অল্প কোন উপায়ে সম্ভব নয়। সমাজে ডাকাইতি একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাণ্ডে পরিণত হয়। যখন ডাকাইতি জুটিল না তখন যে কোনো অছিলায় পার্শ্ববর্তী মুল্লুকে চড়াই করা ছিল যুব-বীরদের স্বার্থ। এই ধরনের লড়াই-ব্যবসায়ী লুটপাটপ্রিয় গুণ্ডার দল হইতেই রোমান সম্রাটেরা অনেক সময় কোজ সংগ্রহ করিত। এই কারণেই বহুক্ষেত্রে জার্মানদের বিরুদ্ধে জার্মানরা লড়িয়াছে।

“লাওস্‌ক্রেখ্ট” বা “ভাড়াটিয়া ফৌজ” জার্মান-সমাজের এক কলঙ্কময় প্রতিষ্ঠান। এই সকল বেতনভোগী আদর্শহীন লড়াই-ব্যবসায়ী বরকন্দাজ বা পল্টনের আবির্ভাব সেই প্রাচীন রণ-সদ্বীরদের সামরিক দলবলের ভিতরই লক্ষ্য করিতে হইবে। রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জার্মানদের হাতে আসিবার পর এই সব রাজ-পেটোয়া গুণ্ডারাই অভিজাত বংশের অর্ধেক অংশ গড়িয়া তোলে। রোমান দরবারের মোসাহেবরাও এই ধরনের অভিজাত্যে দল পুরু করিয়াছে।

মোটের উপর দেখা গেল যে, জার্মান জাতিগুলার শাসন প্রণালী গ্রীকদের “বীর যুগ” এবং রোমানদের তথাকথিত “রাজ যুগ” এই দুই স্তরের অনুরূপ। সার্বজনিক-সভা, সদ্বীর-পরিষৎ এবং লড়াই-নায়ক বা রাজা,—এই তিন অঙ্গে, সেই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ছিল। গোষ্ঠী-প্রথায় ইহাই শাসন-পদ্ধতির চরম বিকাশ। “বার্কার” যুগের “উচ্চতম” স্তরে এই পদ্ধতি ছাড়াইয়া উঠা কোনো সমাজেই সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু যেই মানব-সমাজ এই শাসন-কাঠাম ছাড়াইয়া উঠিবার দরকার বোধ করিতেছিল তখনই গোষ্ঠী-নীতির আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছিল। সমাজ এক নব্যগোপযোগী নবীন স্বধর্মের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই স্বধর্ম “রাষ্ট্র”-নীতির কথা।

অষ্টম অধ্যায়

জার্মান রাষ্ট্রের উৎপত্তি

“জার্মানিয়া মাগ্না”র নরনারী

রোমান ঐতিহাসিক তাসিতুসের বিবেচনায় জার্মানরা ছিল
জন্মতিতে এক পুরু জাত। সেনাপতি সীজার কোনো কোনো
জার্মান জাতির লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে এক একটা আনুমানিক অঙ্ক
দিয়াছেন। উসিপেতান এবং তের্ভেরাণ নামক দুই জাতি
রাইন দরিয়ার বাম কিনারা পর্যন্ত তাঁহার আমলে আসিয়া
ঠেকিয়াছিল। নারী শিশু সমেত এই দুই জাতির লোক সংখ্যা
সীজারের মতে ১৮০,০০০।

গল (সেকালের ফ্রান্স) দেশে যে সকল কেন্ট বাস করিত
তাহাদের সংখ্যা সিসিলির ঐতিহাসিক দিয়োদোরুস্ প্রণীত
গ্রীক গ্রন্থে পাওয়া যায়। দিয়োদোরুস্ বলেন—“এখানে ছোট
বড় মাঝারি অনেক প্রকার জাতি বসবাস করে। সর্ব-বৃহত্তর
সংখ্যা ২০০,০০০ এবং সর্ব-সুদ্র বোণহয় ৫০,০০০ এর কম নয়।”

তাহা হইলে গলে গড়-পড়তা এক একটা জাতিকে ১২৫,০০০
নর-নারীর সমাজ-কেন্দ্র বিবেচনা করা চলে। এদেশের
লোকেরা জার্মানদের চেয়ে তখনকার দিনে বেশি উৎকর্ষশীল
ছিল। কাজেই জার্মান জাতিগুলার প্রত্যেকের সংখ্যা গড়-
পড়তা কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক।

জার্মানি সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিকে ১০০,০০০ সংখ্যক ধরিয়া লওয়া যাউক। তাহা হইলে আমেরিকার ইরোকোআ-সমাজের তুলনায় জার্মান সমাজগুলি খুব বড়ই ছিল সন্দেহ নাই। ইরোকোআরা তাহাদের চরম বিকাশের কালে মহাহ্রদ সমূহ হইতে দক্ষিণে ওহায়ো এবং পটোমাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইহাদের লোক-সংখ্যা তখন মাত্র ২০,০০০। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইরোকোআরা আমেরিকায় এক বিপুল আতঙ্ক-স্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাইন জনপদে যে সব জার্মান জাতি বাস্তুভিটা গাড়িয়াছিল তাহাদের প্রধান প্রধান গুলাকে মানচিত্রের সাহায্যে “দেশস্থ” করিলে দেখিতে পাই যে আজকালকার (১৮৮০—২০) প্রশিয়ায় এক একটা জেলার যতখানি চৌহদ্দি সেই চৌহদ্দিই ইহাদের এক একটার স্বভূমির আয়তন ছিল। অর্থাৎ ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ৩৮৬১ বর্গ মাইল বিস্তৃত জনপদে সেকালের প্রধান প্রধান জার্মান জাতি বসবাস করিত।

রোমানরা জার্মানদের মূলুকগুলোকে সমবেত ভাবে “জার্মানিয়া মাগ্না” বলিত। এই ভূখণ্ডের পূর্ব সীমানা ছিল হিঙ্গটুলা দরিয়ার কিনারা। সমগ্র “জার্মানিয়া মাগ্নার” আয়তন ৫০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৯৩,০৫০ বর্গ মাইল। অতএব যদি প্রত্যেক ৩৮৬১ বর্গমাইলে এক লাখ লোকের বাস ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে গোটা জার্মান মূলুকে লোক ছিল ৫,০০০০০০। “বার্কার” জন-সমাজ সম্বন্ধে এ এক অতি বিপুল সংখ্যা। অবশ্য বর্তমান জগতের হিসাবে প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে ১০ জন অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গ মাইলে ২৫ জন এমন বিশেষ কিছু নয়।

কিন্তু পঞ্চাশ লাখ লোকই জার্মান সমাজগুলার চরম সংখ্যা নয়। তখনকার দিনে বহুসংখ্যক জার্মান নর-নারী কার্পেথিয়ান পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডানিউব দরিয়ার মোহনা পর্যন্ত বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা “গথিক” শ্রেণীর জার্মান। বাষ্টারিয়ান, পয়কিনিয়ান ইত্যাদি নামে তাহারা পরিচিত। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির মতে এই সকল লোক সমগ্র জার্মান জনসংখ্যার পঞ্চম অংশ।

১৮০ খৃষ্টাব্দেও এই সব জার্মান জাতীয় লোককে লড়াই-ব্যবসায়ী পালোয়ান বা বরকন্দাজরূপে মাসিদোনিয়রাজ পার্শ্বসৈন্যের বেতন ভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম অব্দে প্রথম রোমান-সম্রাট আওগুস্তাসের আমলে ইহারা আফ্রিয়ানোপল পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

প্লিনির কথার উপর নির্ভর করিলে ইহাদের সংখ্যা দশ লাখ। কাজেই খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ কালে “জার্মানিয়া মায়ার” এবং অন্ত্যস্ত জনপদের (দক্ষিণ-পূর্বে ইয়োরোপের) জার্মান নর-নারীরা সংখ্যায় ছিল ৬,০০০,০০০।

“বিচরণের যুগ” শেষ হইয়া গেলে জার্মানরা যখন গৃহস্বরূপে আড্ডা গাড়িতে থাকে তখন তাহাদের লোক-বৃদ্ধি দ্রুত বেগেই সাধিত হইতেছিল। তাহাদের শিল্পকর্মের বিকাশ হইতে এইরূপই মনে হইবে। শিল্পকর্ম দেশের খানা-ডোবার ভিতর লোহার এবং রূপার যে সকল দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সঙ্গে কতকগুলো রোমান মুদ্রাও দেখিতে পাই। এইগুলো খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর টাকা। কাজেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে খাত্ত-শিল্প এবং বয়ন-কার্য জার্মান

সমাজে বেশ পাকা ব্যবসা ছিল। বার্টিক অঞ্চলের জার্মানরা রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে কেনা-বেচা করিত। পয়সাওয়ালা লোকেরা তখন খানিকটা বিলাস সামগ্রী ভোগও করিতেছিল।

এই যুগেই আবার জার্মানরা সকল দিক হইতেই রোমান সাম্রাজ্যের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। রাইন দরিয়ার তরফ হইতে পশ্চিমে এবং রোমান প্রাচীর ও ডানিউব দরিয়ার তরফ হইতে দক্ষিণে অভিযান চলিতেছিল। উত্তর সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের সকল কোনই জার্মান-প্লাবনের ধাক্কা সামলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে হইবে যে, জার্মানরা এত বিপুল হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বভূমি ছাড়িয়া দিখিজয়ে বাহির হওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

তিন শত বৎসর ধরিয়া রোমানদের উপর জার্মানদের চাপ পড়িতে থাকে। “গথিক” শ্রেণীর জার্মানরা—স্বাণ্ডিনাভিয়ান এবং বার্গাণ্ডিয়ানরা বাদে—ইয়োরোপের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ধাবিত হইয়াছিল। মহাদেশব্যাপী জাতিসংঘর্ষের লড়াইয়ে গথরা ছিল জার্মান সেনার বাম অঙ্গ।

মধ্যভাগে রোমান সাম্রাজ্য গুঁড়া করিবার ভার ছিল “হাই” জার্মানদের হাতে। ইহারা হারমিনোনিয়ান্ নামে অভিহিত। ডানিউব দরিয়ার মাথার অংশে ইহারা রোমানদের উপর চাপ বসাইতেছিল। জার্মান সেনাবাহিনীর দক্ষিণ অঙ্গ সামলাইয়াছিল ইস্কেস্কোনিয়ান জাতি। রাইন দরিয়ার সীমানা ছাড়িয়া রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীদেশগুলি তাঁবে আঁনা ছিল ইহাদের কাজ। এই সময়ে এই জাতীয় জার্মানদিগকে ফ্রাঙ্ক বলিত।

ফ্রান্সের ব্রিটানি অঞ্চলে ভাসিয়া আসে ইনুগেছোনিয়ানরা। ইহাদের দলে ছিল ক্রিজিয়ান, শ্রাক্সন, জুট, এবং অ্যাংগল। উত্তর সাগরের কূলে জুইডার জে হইতে ডেনমার্ক পর্য্যন্ত ইহাদের বসবাস ছিল। জার্মানদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া হযরাণ হইতে হইতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে রোমাণ সাম্রাজ্য চিৎ হইয়া পড়ে।

“রোমাণ” সমাজে জন্মিদার ও গোলাম

এইবার গ্রীক এবং রোমাণ সভ্যতার জীবন-লীলার শেষ দেখিতেছি। রোমাণ বিশ্ব-শক্তি সমগ্র ভূমধ্যসাগর জনপদে বৈচিত্র্য ভাঙ্গিয়া ঐক্য এবং সমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। গ্রীকভাষা যেখানে যেখানে নেহাৎ প্রবল আকারে দেখা দেয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার উচ্ছেদ সাধন করিয়া ল্যাটিন ভাষা,—কম্ সে কম্ ল্যাটিন প্রভাবান্বিত কোনো দোআঁসুলা উপভাষা ঘর করিয়া বসিয়াছিল।

গল, ইরেরিয়ান, লিগুরিয়ান, লোরিকান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির নাম আর সে আমলে কেহ মুখে আনিতে না। সকল জাতিই এক নামে রোমাণ মাত্র রূপে পরিচিত হইত। রোমাণ আইনকাহ্নন আর শাসনের আওতায় সাবেক কালের স্থানীয় স্ব স্ব প্রধান গোষ্ঠীধর্ম্মগুলো লোপ পাইয়াছিল। জনপদগত বা জাতিগত স্বাধীনতা “মাক্কাতার আমলের” সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছিল।

ইয়োৰোপের সর্বত্র এই যে এক নূতন ধরণের

“রোমান” নর-নারী গড়িয়া উঠিতেছিল ইহারা জগৎকে নূতন কিছু দিতে পারে নাই। ইহারা ছিল বিশেষত্ব-বর্জিত, জাতীয়-স্বাতন্ত্র্যহীন, জন-সমাজ। স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয়তার অভাবই ছিল তাহাদের বিশেষত্ব। নূতন নূতন জাতি গড়িয়া তুলিবার উপাদান অবশ্য এই সকল সমাজে কম ছিল না।

ভিন্ন ভিন্ন জনপদের ল্যাটিন উপভাষাগুলি ক্রমেই বৈচিত্র্য ও অনৈক্যের পথে বাড়িয়া চলিতেছিল। ইতালী, গল, স্পেন, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের প্রাকৃতিক সীমানা গুলিও ‘যথা পূর্বে তথা পরম্’ই ছিল। কাজেই জনপদে জনপদে ভৌগোলিক স্বতন্ত্রতা বজায় ছিল পুরামাত্রাতেই। কিন্তু এই সকল উপকরণকে ব্যবহার করিয়া খাটি জন-পদগত বা জাতিগত স্বরাজ কায়েম করিবার মতন ক্ষমতা কোনো কেন্দ্রেই বিকশিত হয় নাই। সৃষ্টি-শক্তির অভাব সেই যুগের এক বিশেষ লক্ষণ।

এই বিপুল জন-সম্মিলনকে একত্ব করি হইতেছিল রোমের নামে। অথচ রোম সে যুগে আর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নগরী রূপে পূজা পাইতেছিল না। মফঃস্বলের হিংসায় এবং প্রতিযোগিতায় রাজধানীটা সাধারণ শহরে পরিণত হইয়াছিল। কন্সটান্টিনোপল, মিলান, ক্রেভুস ইত্যাদি শহরেই বাদশাহ, রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদি শ্রেণীর শাসনকর্তারা বসবাস করিত।

এদিকে রোমান শাসন প্রজাগণের ধন-শোষণ মাত্রের কলঙ্করূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। খাজনায় নানারূপ নর-

নারীকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর অবস্থায় লইয়া গিয়া ঠেকাইতেছিল। তাহার উপর তহশিলদার এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীর ঘৃণা খাওয়া এবং জুলুম ত ছিলই। রোমান সাম্রাজ্য যথেষ্টশাসন, অত্যাচার এবং শৃঙ্খলাহীনতার নামাস্তর বিবেচিত হইত। অপর পক্ষে বিদেশীর আক্রমণ হইতে জন-গণকে রক্ষা করার ক্ষমতা আর তাহার ছিল না। জন-গণই বিদেশীদিগকে “যেচে এসে ডেকে নিয়ে” স্বদেশী অত্যাচারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। দুস্মনদিগকেই স্বদেশের উদ্ধারকর্তা এবং যুগাবতার বিবেচনা করা সেকালের রোমান নর-নারীর স্বধর্ম বিবেচিত হইত।

এই গেল রোমান সাম্রাজ্যের চরম অবস্থার আইনকানুন এবং রাষ্ট্র-শাসনের কথা। জন-গণের সামাজিক রীতিনীতিও এই যুগে যারপরনাই শোচনীয় ও লজ্জাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। রোমানদের সামাজিক অধোগতি গণ-তন্ত্রের আমলেই সূত্র হয়। মকঃস্বল এবং বিজিত দেশগুলোকে শুযিয়া টাকা আদায় করা ছিল গণ-নাযকদের নীতিশাস্ত্র।

সাম্রাজ্যের আমলেও এই নীতিশাস্ত্রেরই জের চলিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের বিকাশে রোমানজাতির নজর কোন দিনই ছিল না। সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারে ব্যবসা মাথা তুলিতেই পারিত না। প্রধানতঃ টাকা ধার দিয়া সুদ খাওয়া এবং সুদখোর “কষাই” শ্রেণীর লোককে পুষ্ট করা রোমান সমাজের এক প্রধান কথা। আসল ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু সবই গ্রীক অঞ্চলের “রোমান”দের অর্থাৎ গ্রীক জাতীয় লোকের হাতে ছিল। মোটের উপর আর্থিক জীবনের সকল

বিভাগেই, রোমান সাম্রাজ্য আনিয়াছিল অবসাদ, নগরের অবনতি এবং শিল্প-লোপ। কৃষিকার্য্যও অধঃপতন দেখা দিয়াছিল।

গোটা দুনিয়ায় কৃষিকার্য্যই ছিল ধন-দৌলতের প্রধান জন্মদাতা। এই যুগেও কৃষিকার্য্যের দাম কম ছিল না। ইতালীতে গণ-তন্ত্রের অবসান কাল হতেই বড় বড় জমিদারী প্রথা সুরু হইয়াছিল। এইগুলাকে ‘লাতিফুন্দি’ বলিত। সাম্রাজ্যের আমলে ‘লাতিফুন্দি’ বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

‘লাতিফুন্দি’গুলার দুরবস্থা শীঘ্রই দেখা দেয়। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ চলিত না, লোকসংখ্যা কমে গিয়া গিয়াছিল। ভেড়া-বলদের চরিবার মাঠরূপে জমিগুলি ব্যবহৃত হইত। কয়েকটা গোলাম রাখিলেই জমিদারেরা সহজে কাজ চালাইতে সমর্থ হইত। চাষবাষও চলিত কিছু কিছু সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ছিল ‘লাতিফুন্দি’ অধিপতিদের বিলাসভোগের উপযোগী “বাগানবাড়ী”র রসদ জোগানো মাত্র। কিছু কিছু বিলাস-ভোগের ফল-মূল শহরে বাজারেও বিক্রীর জন্য পাঠানো হইত।

কিন্তু জমিদারীগুলিও উচ্ছন্ন হইতেছিল। কেন না একে জমিদারবাবুর্সাই গরীব হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শহরের অবনতি হওয়ায় লোক-জনেরা বিলাসজীবনের উপযোগী বাগানবাড়ীর ক্ষেত্রের ফল-মূল কিনিতে অসমর্থ ছিল। গোলাম-খাটাইয়া ভেড়া-চরাণো অথবা বিলাসের চাষ-চালানো আর সম্ভবপর হইল না।

বড় বড় জমিদারীগুলি টুকরা টুকরা টুকরা করিয়া বেচা হইতেছিল। এই সকল ছোটোখাটো জমিজমার মালিক

হইল কৃষাণেরা। ইহারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিয়া রেহাই পাইত। এই স্বত্রে “পার্টিয়ারি” নামক একশ্রেণীর লোকও ছোটখাটো জমির মালিকে পরিণত হয়। ইহাদিগকে মালিক না বলিয়া তদারককারী কন্সচারী বলাই ভাল। কেন না ইহারা নিজে কৃষাণ ছিল না, কৃষাণের কাজ তদ্বির করা ছিল ইহাদের কর্তব্য। এই জন্ত উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ বা নবমাংশ থাকিত তাহাদের প্রাপ্য।

মোটের উপর কিন্তু ‘লাতিফুন্দি’ জমিদারিগুলা কৃষাণদের ভিতরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় ভাগাভাগি হইয়া যায়। এই সকল কৃষাণকে “কলোনিষ্ট” বা উপনিবেশ-স্থাপয়িতারূপে বিবৃত করা হইত। বার্ষিক খাজনা দিলেই ইহাদের কর্তব্য ফুরাইত। কিন্তু জমিগুলা বেচার সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও বিক্রী হইয়া যাইত। গোলাম বলিলে যাহা বুঝায় এই সকল ‘কলোনিষ্ট’ কৃষাণ ঠিক তাহা নয় বটে, কিন্তু স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভাব তাহাদের জীবনে ঘটিত। স্বাধীন নাগরিকদের সঙ্গে ইহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল অধিকন্তু নিজ সমাজের ভিতরও যে বিবাহ চলিত তাহাকে আইনের চোখে বিবাহ রূপে গণ্য করা হইত না। গোলামদের পত্নীরা যেমন আইনতঃ উপপত্নী মাত্র, এই সকল কৃষাণদের পত্নীও ঠিক সেইরূপ বিবেচিত হইত। মধ্যযুগের ইয়োৰোপে “সার্ক” বা ভূমি-গোলাম নামক এক শ্রেণীর কৃষাণ দেখা দেয়। সেই প্রতিষ্ঠানের পূৰ্বপুরুষই রোমান সাম্রাজ্যের পতনকালের এই সকল “কলোনিষ্ট” চাষী।

সাবেক কালের দাসত্ব প্রথায় এ যুগে আর কোনো আর্থিক লাভ ঘটিত না। কি চাষআবাদে কি শহরের কারবারে

কোথায়ও গোলাম খাটাইয়া জমিদার বা ব্যবসাদারেরা ছ'পয়সা করিতে পারিত না। কেন না গোলামের শ্রমের বাজারই উঠিয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যের গৌরব যুগে বড় বড় শিল্প-কৃষিক্ষেত্রে অবশ্য গোলামের শ্রম খাটাইয়া লাভবান হওয়া সম্ভবপর ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন ছিল কেবল ছোটখাটো কারবার, ছোটখাটো ক্ষেত। গোলাম-খাটানো এই সকল ক্ষেত্রে অসম্ভব। ধনীলোকেরা ছ'-চার জন গোলাম রাখিত ঘরের কাজের জন্য, অথবা বিলাসের বা ধন-দৌলতের মাত্রা দেখাইবার জন্য তাহারা গোলাম রাখা দস্তুর বিবেচনা করিত।

তাহা সত্ত্বেও গোলামী-প্রথার কুফল সমাজে বেশ ছড়াইয়াই পড়িয়াছিল। মেহনৎ করিয়া, গায়ে খাটিয়া অন্ন-সংস্থান করা স্বাধীন রোমানরা একটা অপমানের চিহ্ন বিবেচনা করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে রোমে যখন প্রায় সকলে স্বাধীন জীব তখন রোমান-সমাজের সকলেই শারীরিক পরিশ্রমকে নেহাৎ গর্হিত সম্বন্ধিতেই অভ্যস্ত ছিল।

মনিবেরা খাটি গোলাম পুষ্টিতে অসমর্থ। কাজেই গোলামের দলকে বরখাস্ত করা সে যুগের এক লক্ষণ। কিন্তু সন্ধে সন্ধে 'কলোনিষ্ট'-চাষীদের দল বাড়িতেছিল। আর বাড়িতেছিল "হা ভাতে" "হা ঘরে" অন্ন-বস্ত্রহীন "স্বাধীন" নর-নারীর সংখ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোলামশীল প্রদেশগুলার দরিদ্র স্বাধীন খেতাদারদের অবস্থা দেখিলেই রোমান-সমাজের এই যুগ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে গোলামী-প্রথা জগৎ হইতে উঠিয়া গিয়াছে—এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্ট ধর্ম গোলাম প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। পরবর্তী কালে খৃষ্টীয়ানদের গোলাম কেনাবেচা ব্যবসায় বাধা দিবার জন্য খৃষ্টধর্ম হাত তুলে নাই। উক্তরে জার্মানরা, ভূমধ্যসাগরে হেনিসের বণিকস্বাতি এবং পরে নিগ্রো-মণ্ডলের খেতাব খৃষ্টীয়ানরা যুগে যুগে দাস-ব্যবসা চালাইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম কোনোদিনই তাহার বিরুদ্ধে কথা বলে নাই।

ফ্রান্সের হ্যাদা নগর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তথাকথিত জার্মান ধর্ম-সাম্রাজ্যের একবড় খুঁটা ছিল। এই নগরের সর্ব-প্রসিদ্ধ শিল্প বা ব্যবসায় ছিল পুরুষের যোনি কাটিয়া খোজা বা হিজ্রা প্রস্তুত করা। হ্যাদার ফ্যাক্টরির তৈয়ার করা হিজ্রা-দিগকে স্পেনে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এইখানে “মুর” জাতীয় মুসলমানেরা খৃষ্টীয়ান-শিল্পে নিজ অভাব মোচন করিত।

খৃষ্ট ধর্ম গোলামী তুলিয়া দেয় নাই। গোলামী উঠিয়া গিয়াছে আর্থিক কারণে। গোলামদিগকে খাটাইয়া মনিবেরা যখন হইতে লাভবান হইতে পারিল না তখন হইতেই গোলামীর শিকড় শুকাইতে শুরু করিল।

কিন্তু রোমান-সমাজে এক সমস্তা উপস্থিত হইল। গোলাম আর নাই কিন্তু শারীরিক কাজ করা স্বাধীনদের চিন্তায় গহিত। শ্রমজীবী নামক এক শ্রেণীর স্বাধীন লোক তখনও দেখা দেয় নাই। কাজেই রোমে একটা আর্থিক বিপ্লবের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্ দেশের কয়েকটা জেলা হইতে শোচনীয় চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ‘কলোনিট’ ছাড়া স্বাধীন কৃষাণও সে দেশে চাষবাস করিত। কিন্তু সরকারী কন্সটারী আর স্বেচ্ছায় মহাজনদের

অত্যাচার সহিতে করিতে না পারিয়া অনেক সময় কৃষাণেরা দল
বাঁধিয়া কোনো ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় লইত। চতুর্থ
শতাব্দীতে সম্রাটেরা এই ধরনের আশ্রয়-লওয়া আইন দিয়া বন্ধ
করিয়া দেয়।

কিন্তু এই আশ্রয়দাতাদের কড়ারও ছিল জবর। কৃষাণরা নিজ
নিজ জমির স্বত্বাধিকার আশ্রয়দাতাকে দিয়া দিতে বাধ্য থাকিত। এই
অবস্থা আজীবন ভোগের অধিকার কৃষাণদেরই থাকিত। এই
কন্দী পরবর্তী কালে গির্জার মোহাস্তেরা খুব বেশি মাত্রাতেই
চালাইয়াছে। গরীব কৃষাণদের জমি বেহাত করিয়া ভগবানের
আদেশ পালন করিবার পথে নবম এবং দশম শতাব্দীর খৃষ্টীয়ান-
ধর্ম-কেন্দ্র-সমূহ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

আশ্রয়দাতা সাধারণ লোকই হউক অথবা পুরোহিত-সঙ্ঘই
হউক, ইহার কড়ার যে জুয়াচুরি বা ডাকাইতির সমান নিন্দনীয়
একথা সে যুগের লোকেরাও বেশ বুঝিত। মার্সেইয়ের “বিশপ”
বা পুরোহিত-সঙ্ঘের সাল্‌ফ্রিয়াহুস এই সকল জুলুমের নিন্দা
করিয়াছেন। ‘রোমাণরা’ সরকারী আইন-কাহ্নন এবং কর্মচারী
ও আশ্রয়দাতাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া গিয়া “বার্কার”
জার্মানদের ভিতর বসবাস করিতে বাধ্য হইত। রোমাণ শাসনে
ফিরিয়া আসার মতন ভয়াবহ কাণ্ড তাহাদের চিন্তায় আর
ছিল না।

সে যুগে গরীব বাপ-মারা সম্মান-সম্মতিকে গোলাম রূপে
বেচিতে অভ্যস্ত ছিল। একটা আইনের দ্বারা প্রথাটা তুলিয়া
দেওয়া হয়। সম্মান-বেচার বিরুদ্ধে আইন আবশ্যক হইয়াছিল,
—এই তথ্য হইতেই সমাজের অবস্থা অসুস্থমান করা যায়।

জার্মানদের রাজতন্ত্র

জার্মানরা “রোমাণ”দিগকে স্বজাতীয়দের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ রোমাণরা তাহাদের জমি-জমার দুই তৃতীয় অংশ উদ্ধার-কর্তাদের হাতে সঁপিয়া দিতে বাধ্য হইল। জার্মানরা এই সকল সম্পত্তি নিজেদের ভিতর গোষ্ঠী-ধর্ম অহুসারে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইল।

জার্মান বিজেতার অবাঞ্ছিত গুণ্ণতিতে বেশি নয়। কাজেই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড অনেকগুলি অবিভক্ত যৌথভাবে গোটা গোষ্ঠী, বা ট্রাইব বা জাতির সমবেত সম্পত্তি রহিয়াছিল। গোষ্ঠীগুলো নিজ নিজ ভাগ-বাটোয়ারায় লটারির অহুসরণ করিত। প্রত্যেক পরিবারের কপালে যে যে টুকরা পড়িত সেটা তাহার নিজস্ব বিবেচিত হইত। এই সব টুকরা কেনা-বেচা সম্ভবপর ছিল। নাম ছিল “আলোদিয়ুম” বা স্বাধীন সম্পত্তি। বনভূমি এবং পশুচারণের মাঠ সমুদয় যৌথ থাকিত। চাষআবাদ চলিত গতানুগতিক গোষ্ঠীর নিয়মাহুসারে।

রোমাণদের সঙ্গে জার্মানরা মিশিয়া ডালেচালে খিচুড়িরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই সাবেক কালের গোষ্ঠী-ধর্মের “রক্ত”-সম্বন্ধের বাইরে “দেশগত” জনপদগত আত্মীয়তার সম্বন্ধ হ্রাস হইতেছিল। “মার্ক্-কমিউন” বা পল্লী-সমবায় গোষ্ঠী-কেন্দ্রকে ডুবাইয়া দিল। অবশ্য প্রথম প্রথম এই পল্লী-কেন্দ্রেও রক্তসম্বন্ধের প্রভাব দেখা যাইত। উত্তর ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্মানিতে এবং স্ক্যান্ডিনাভিয়ায় মার্ক্ এবং গোষ্ঠীতে কম-বেশি সময় বা সজ্জি কার্যে হইতেছিল।

মোটের উপর গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সাম্যনীতি এবং গণতান্ত্রিক স্বধর্ম নবীন “স্থানগত” জীবনকেন্দ্রে একদম লুপ্ত হইয়া যায় নাই। গোষ্ঠীনীতির যেটুকু জের এই যুগে বজায় থাকিতে পারিয়াছিল তাহার প্রভাবেই দারিদ্র্য নির্ধাতিত এবং ‘অনধিকারী’ শ্রেণীর নর-নারী সমাজে নিজ দাবীদাওয়া চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

রক্তকেন্দ্রের প্রভাব কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণো জার্মান প্রতিষ্ঠানগুলার বিভিন্ন অঙ্গও বদলাইয়া গিয়াছিল। রোমান প্রদেশগুলা দখল করিবার পর তাহাদের হাতে ভার পড়িল, এই গুলা স্বশাসনে শৃঙ্খলীকৃত করার। কিন্তু কোন্ শাসন প্রণালী তাহারা অবলম্বন করিবে? তাহারা জানিত মাত্র গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের নীতিশাস্ত্র। রোমানদিগকে নিজ গোষ্ঠী-কেন্দ্রে পুরিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অথচ গোষ্ঠীর নিয়ম জারি করিয়া তাহাদিগকে শাসন করাও চলিতে পারে না। এই সমস্যায় জার্মানরা নতুন অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইল।

রোমান প্রদেশে প্রদেশে যে সকল রোমান প্রতিষ্ঠান চলিতেছিল সেইগুলি বজায় রাখাই “বার্কারে”রা বুদ্ধিমানের কার্য বিবেচনা করিয়াছিল। নতুনের মধ্যে তাহারা নিজ এক্টিয়ারের প্রতিনিধি স্বরূপ কোনো কোনো কর্মচারীকে সেই সকল স্থানীয় শাসন-কেন্দ্রের মাথায় বসাইয়া দিল। বিজ্ঞতা জাতি নিজ প্রতিনিধি আর কাহাকেই বা পাঠাইবে? লড়াইয়ের সঙ্গী হইল রোমান শাসন-কেন্দ্রে জার্মান-গোষ্ঠীর স্তম্ভস্বরূপ।

রণ-নায়ককে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায় না। তখন চলিতেছিল একে আভ্যন্তরীণ অশান্তি তাহার উপর নিত্য নতুন বিদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষ। কাজেই জার্মানরা

রণ-নায়কের ক্ষমতা দিন দিন বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলতঃ রণ-নায়ক নরপতিত্বে পরিণত হইল। এইখানেই বিদেশ বিজয়ের প্রভাবে গোষ্ঠী-প্রথায় “রাজতন্ত্রের” আবির্ভাব।

ক্রাক্-জাতীয় জাৰ্মান বিজেতাদের মুহূর্ত্তে সালিয়ান শ্রেণীর রণ-নায়কেরা রোমানদের সকল সরকারী জমি দখল করিয়া বসিয়াছিল। পল্লীসমাজের অধীনে যে সকল জমি-জমা ছিল সেইগুলি ছাড়া অস্ত্রান্ত্র সকল সম্পত্তি ইহারা দখল করিতে ছাড়ে নাই। দখল করা হইত অবশ্য সবই গোটা জাতির নামে। কিন্তু প্রথমেই রণ-নায়কেরা সব সম্পত্তি রাজ-দৌলতে পরিণত করে। জন-সাধারণের তাঁবে কোনো জমিই থাকিল না। রাজারা “নিজ সম্পত্তি” হইতে নিজ নিজ পেটোয়াদিগকে কিছু কিছু উপহার দিয়াছিল মাত্র।

পেটোয়া ছিল কাহারো? রাজার বা রণ-নায়কের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ লাঠিয়াল, কুন্তীগীর, গুণ্ডা, লড়াই-প্রেমিক যুবা এবং অস্ত্রান্ত্র পৰ্জনীকাজে করিৎ-কৰ্ম্ম লোকজনই তাহার সৰ্ব্বপ্রিয় সন্দেহ নাই। এদিকে নতুন দেশে বসবাস করিতে আসিয়া জাৰ্মানেরা স্থানীয় অর্থাৎ “রোমান” বা রোমানীকৃত গলদিগকে লেখক, কেরানী, দোভাষী, আইনজ্ঞ, স্থতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ইত্যাদিরূপে নকরি দিতে বাধ্য হইত। ল্যাটিন ভাষা, সাহিত্য এবং রোমান আইনকাহনে অভিজ্ঞতাওয়ালা বহু লোক এই উপায়ে সালিয়ান ক্রাকদের রাজপ্রিয় হইয়াছিল। রাজ-সম্পত্তির কাঁধে টুকরা ইহাদের কপালে জুটিয়াছিল।

এই দুই ধরনের জাৰ্মান ও রোমান পেটোয়া ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোকও রাজাদের দল-বল পুষ্ট করিত। তাহারা ছিল

গোলাম,—সাক্ অথবা স্বাধীনতা-পাওয়া গোলাম। ইহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্যও বিজিত দেশের নবীন রাজারা জমি-জমা দিয়া খুশী রাখিত। এই সকল নানা উপায়ে একটা নতুন অভিজাত-সম্রাজ্য বা ধন-কুলীন জাতি গড়িয়া উঠিতেছিল। জনসাধারণ সকল দিক হতেই অধিকারহীন হইতেছিল।

দেশজয়ের ফলে রণ-নায়কের ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়ায় গোষ্ঠী-প্রথায় প্রথম ভাঙ্গন লাগে। অতিবৃদ্ধিশীল রণ-নায়ক বা রাজা নিজ পেটোয়ারিগকে কুলীন করিয়া তুলিয়া গোষ্ঠী-প্রথায় আর এক ঘা লাগাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-তন্ত্রের তরফ হইতে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নতুন এক অস্ত্র চলিয়াছিল। গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সর্দার-পরিষৎ উঠিয়া গেল। ইহার স্থান পূরণ করিল রাজ-সর্দারদের মজলিস। অধিকন্তু সাবেক কালের “সার্কজেনিক” সভাটা এখন নামে মাত্র টিকিয়া রহিল। এই সভায় আসিত রাজ-পেটোয়ারা অর্থাৎ কুলীন জমিদাররা বাদে সমর বিভাগের নিম্নতর সেনাপতিরা এবং নতুন নতুন অভিজাতবংশীয় কুলীনেরা।

জার্মান কিশাণদের দুর্গতি

জনসাধারণের ঠাই কোথায়? কোথায়ও না। রোমাণ গণতন্ত্রের আমলে কৃষাণদের যে দুর্গতি দেখা গিয়াছিল সেই দুর্গতিই ফ্রাঙ্ক নর-নারী জার্মান যুগে ভোগ করিতেছিল। ঘরোয়া লাঠালাঠি আর দেশজয়ের লড়াই এই ছিল তাহাদের জীবনের কষ্টভোগ। যে সকল লোক সাবেক কালে ফ্রাঙ্ক-বিজেতা পল্টনের অন্তর্গত ছিল তাহারাই ক্রমে ক্রমে এমনি অনধিকারী

সম্পত্তিহীন ও দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নবম শতাব্দীতে তাহাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগও স্বাধীনভাবে লড়াইয়ে যাইতে সমর্থ ছিল না।

কাজেই নতুন উপায়ে পণ্টন তৈয়ারি করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। কুলীন অভিজাতদের অহুচরেরা নবীন সৈন্তের ফৌজ হইতে থাকিল। রাজা স্বয়ং এখন আর সমগ্র দেশ হইতে লোক ডাকিয়া সেনা গঠন হইতে অসমর্থ। কিন্তু জমিদারদের অহুচর ছিল কাহারো? ইহারাই পূর্বকালে স্বাধীন কৃষাণরূপে রণ-নায়কের হুকুম তামিল করিত এবং আরও সাবেক কালে কোনো রাজার তোয়াক্কা রাখিত না।

শার্ল্যামেঞের বংশধরদের আমলে ঘরোয়া লড়াইয়ের দক্ষ কৃষাণদের দুর্গতি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। রাজার ক্ষমতা দিন দিন কমিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের প্রভুত্ব সমাজে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। শার্ল্যামেঞ প্রত্যেক 'গাও' বা জেলায় (গাও—মার্ক বা পল্লীর চেয়ে বিস্তৃত জনপদ) নতুন একপ্রকার কমিটারী বহালের ব্যবস্থা করেন। ইহার পদগুলো বংশগতরূপে একচেটিয়া করিয়া ফেলে। এই সকল গাও-শাসক অগ্ন্যাত্ত অভিজাতদের দলে ভিড়িয়া জনসাধারণের উপর জুলুমে যোগ দিতে ভুলিত না।

কৃষাণরা নন্দ্র্যাপদের আক্রমণে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শার্ল্যামেঞের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ক্রান্ত নন্দ্র্যাপ বিজ্ঞেতাদের চরণতলে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঠিক চার পাঁচ বৎসর পূর্বে এই ধরণেই গল প্রদেশের রোমান সাম্রাজ্য ক্রান্তদের নিকট কাবু হইয়া পড়ে।

ক্রাকদের অধোগতি অন্ত্যান্ত দিকে সেই রোমান সাম্রাজ্যের অধোগতিরই জুড়িদার। “কলোনিষ্ট” কৃষাণরা রোমান আমলে যেরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করিত সেই দুঃখ দারিদ্র্যই এই যুগে স্বাধীন ক্রাক কৃষাণদের ভাগ্যে জুটিতিছিল। রাজশক্তি তাহাদিগকে কোনো মতেই রক্ষা করিতে পারিত না। কাজেই আত্মরক্ষার জন্ত ইহারা হয় জমিদারের নাই হয় গির্জার শরণাপন্ন হইত। কিন্তু এই আশ্রয়ের কিস্মৎ ছিল ঢের।

রোমান আমলের সেই “কলোনিষ্ট”দের মতনই ক্রাক আমলে চাষীরা আশ্রয়দাতাদিগকে নিজ নিজ জমির মালিক করিতে বাধ্য হইত। তাহার পর এই সকল নতুন মালিক কৃষাণদিগকে রাইয়ত রূপে জমির ভোগস্বত্ব প্রত্যর্পণ করিত। অবশ্য এই ভোগস্বত্বের জন্তও আবার কৃষাণরা কর দান এবং গতর খাটার দায়িত্ব লইত।

এইরূপে পরাধীন হইবামাত্র কৃষাণরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েক পুরুষের ভিতর ক্রাক ভরিয়া সার্ক বা ভূমি-গোলাম দেখা দিয়াছিল।

“সাঁ জার্মানে প্রে” নামক গির্জা সে যুগে প্যারিসের নিকটবর্তী ঠাইয়ে অবস্থিত ছিল। আজকাল অবশ্য গির্জাটি প্যারিস শহরেরই এক ধর্মমন্দির। শার্ল্যামেঞের আমলে এই মন্দির বা মঠের তাঁবে বিপুল বিস্তৃত জমিদারী শাসিত হইত। ২৭৮৮ পরিবার—ইহাদের অধিকাংশই জার্মান নামধারী ক্রাক জাতীয় লোক—মঠের রাইয়ত ছিল। তাহাদের মধ্যে ২০৮০ ছিল “কলোনিষ্ট”। কথঞ্চিৎ স্বাধীনতাবিহীন কৃষাণ পরিবারের সংখ্যা ৩৫, এবং খাটি গোলাম ছিল ২২০। পুরাপুরি স্বাধীনতা-ওয়াল কৃষাণ পরিবার গুণ্টিতে মাত্র ৮।

পুরোহিত-সদ্বার সিঙ্ক্রানিয়ুস পঞ্চম শতাব্দীতে কৃষাণদের জমি বেহাত করিয়া লইবার জন্য গির্জা-প্রতিষ্ঠানকে যারপর-নাই নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু নবম শতাব্দীতে এই প্রথা খ্রীষ্টান মোহান্তদের আটপোরে জীবনের কথায় পরিণত হইয়াছিল।

অধিকন্তু কৃষাণদিগকে গতর খাটাইয়া কাজ করানো এ যুগের এক অতি সাধারণ নীতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। রোমাণ আমলে ‘আঙ্কারি’ প্রথার সাহায্যে জনগণকে সরকারী কাজে বাধ্য করা হইত। জার্মাণদের মার্কনীতি অনুসারেও লোকেরা পল্লীর সাঁকো, সড়ক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে বাধ্য থাকিত। সেই সকল সাবেক কালের নিয়মই ফ্রাঙ্ক আমলে জোরের সহিত চলিতেছিল। অর্থাৎ চার শ’ বৎসর কাল জার্মাণ বিজেতাদের শাসনে থাকিয়া গলের (ফ্রাঙ্কের) নরনারী যেকে সেই রহিয়া গিয়াছিল।

এমনটি কেন ঘটিল? রোমাণ সাম্রাজ্যের অবসানকালে কৃষি-শিল্পের যেরূপ অবস্থা ছিল সেই অবস্থার অনুরূপই তখন সম্পত্তির বিভাগ ঘটিল এবং জনগণের শ্রেণী-বিভাগও সাধিত হইত। ধন-সৃষ্টির উপায় মাফিকই সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। চার শ’ বৎসরের জার্মাণ শাসনে কৃষি-শিল্পে নতুন কোনো কৌশল উদ্ভাবিত হয় নাই অর্থাৎ ধনদৌলত উৎপন্ন করিবার প্রণালীতে নতুন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। কাজেই এই যুগেও সম্পত্তি-বিভাগ এবং শ্রেণী-ভেদের নিয়ম ‘যথাপূর্ব-তথাপূর্ব’ থাকিবে না কেন?

রোমাণ সাম্রাজ্যের অবসান কালে নগরগুলি মফঃস্বলের উপর আর কর্তৃত্ব করিত না। ফ্রাঙ্ক আমলেও নগরগুলি আর মাথা

তুলিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কৃষিকর্মে এবং শিল্পে একটা নিম্নস্তরের যুগ চলিতেছিল। এই অবস্থায় বড় বড় জমিদারের ক্ষমতা বাড়িতে পারে মাত্র আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় ছোট ছোট কৃষাণদের দুরবস্থা।

শার্ল্যোমেঞ নিজ রাজ-বাগিচায় রোমাণ “লাতিকুন্নি” জমিদারীর নকলে গোলাম খাটাইয়া চাষ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক সঙ্গে বহুসংখ্যক মজুরকে বাধ্য করিয়া কাজ করানো তাঁহার ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই সকল নতুন “পরীক্ষা”য় গোটা সমাজের উপর কোনো ফল ফলে নাই। শার্ল্যোমেঞের পর কোথাও এই সকল উপায় অবলম্বিত হইত না।

একমাত্র মঠের মোহান্তরা শার্ল্যোমেঞের পরীক্ষা অহুসারে কাজ চালাইতে থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের দল যাহা কিছু করিয়াছে তাহাকে সমাজের সাধারণ প্রথা বিবেচনা করা উচিত নয়। এসব ছিল ব্যতিরেক বিশেষ। সমাজের লোক এই গুলাকে বিশেষত্ব-পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বরূপে দূর হইতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল। বহু সংখ্যক গোলাম খাটাইয়া চাষের ব্যবস্থা করা জনগণের স্বভাবে পরিণত হইতে পারে নাই।

“বার্কার” রক্তের স্বধর্ম

চার শ’ বৎসরে কোনো পরিবর্তন হয় নাই একথা বলিলে ভুল বুঝা হইবে। কি রোমাণ আমলে কি ফ্রান্স আমলে শ্রেণীভেদের এক রূপই দেখিতে পাই সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল নর-নারী এই শ্রেণীগুলার অন্তর্গত তাহারা দুই যুগে ভিন্ন ভিন্ন।

সাবেক কালের গোলামী আর ছিল না। আর ছিল না

রোমাণ আমলের শারীরিক পরিশ্রমে অপমান-বোধ। সেকালের “কলোনিষ্ট” কৃষাণ আর একালের নয়া সার্ক বা ভূমি-গোলাম এই দুই শ্রেণীর দাসের মাঝমাঝি একশ্রেণীর কৃষাণ ক্রাকের আমলে দেখা গিয়াছিল—তাহারা স্বাধীন নয়-নারী।

অধিকন্তু রোমাণ আমলের “ইজ্জৎ লইয়া ঘরোয়া খাওয়া-খাওয়ি” আর এ যুগে দেখা যাইত না। একটা নয়া জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল! ইহাতে পুরাণো বাসি মালের স্মৃতি কাজ করিত কম। এ যুগের মনিব-ভৃত্যেরা সেকালের লোক-জনের তুলনায় মানুষ ছিল এ কথা বলা চলে। প্রাচীন জগৎ ভাঙিবার সময় সমাজে দেখা দেয় প্রবল-প্রতাপ জমিদার আর সেবকশ্রেণীর কৃষাণ। এই দুই শ্রেণীর লোক লইয়া ফ্রান্সেরা এক নবীন সমাজ কায়েম করিতে সুরু করে।

তাহা ছাড়া বর্তমান জগতে যে সকল “নেশন” নামধারী জাতি চলিতেছে সেই সকলের জন্ম এই চার শ’ বৎসরের ভিতরই ঘটিয়াছিল। ফলতঃ জার্মানরা ইয়োরোপে, বিশেষতঃ পশ্চিম ইয়োরোপে, একটা নয়া জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল—এইরূপই বিশ্বাস করিতে হয়।

জার্মান আমলের রাষ্ট্র ভাঙাভাঙিতে শেষ পর্য্যন্ত অতি মারাত্মক রকমের ধ্বংস বা পরাধীনতা ঘটে নাই। রাজসম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা, জমিদারির উৎপত্তি আর তদুপযোগী ‘ফিউড্যাল’ সমাজ এই যুগের নতুন কথা। লোক সংখ্যার উপর এই সকল পরিবর্তনের প্রভাব ভালই বলিতে হইবে। জমিদার-পালিত বহু কেন্দ্রী-কৃত ভূমি-গোলাম-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজে লোক-সংখ্যা যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছিল। এই কারণেই দুই শত বৎসর

পরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয়ানদের যে ধর্ম-যুদ্ধ শুরু হয় তাহাতে অল্পশ্র লোক মরা সত্ত্বেও পশ্চিম ইয়োরোপ লোকবলে দরিদ্র হইয়া পড়ে নাই।

কিসের জোরে জার্মানরা ইয়োরোপীয় সমাজে নব জীবন ঢালিতে পারিয়াছিল? জার্মানির “স্বদেশ-প্রেমিক” ঐতিহাসিক-গণ লম্বা গলা করিয়া প্রচার করিয়াছেন—“জার্মানদের অপূর্ব জার্মানামি ইহার কারণ।” যেন জার্মান জাতির একটা কোন বিশেষ বাত্মন ছিল! জার্মানরা যে ‘আর্য’ মানবের এক অতি উৎকর্ষশীল এবং ক্ষমতাবান জাত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর সেই সময়ে তাহারা উত্তরোত্তর বিকাশের পথে উঠিতেছিল একথাও বিশ্বাস করা চলে।

কিন্তু ক’ঘর স্বদেশী জার্মান পণ্ডিতদের গোঁড়ামি কোনো মতেই স্বীকার করা যায় না! জার্মানদের একমাত্র জোর ছিল এই যে, তখনকার দিনে তাহারা ছিল “বার্বার”। এই “বার্বার” জীবনের গুণেই তাহারা মরা ইয়োরোপকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল। সেইগুণ আর কিছুই নয়—এক কথায় উহার নাম গোষ্ঠী-ধর্ম।

সেকালের জার্মানদের ব্যক্তিগত কার্যদক্ষতা ও সংসাহস ছিল প্রচুর। স্বাধীনতা ছিল তাহাদের রুধির। সাম্যনীতি এবং জন-গণের আত্ম-কর্তৃত্ব ছিল তাহাদের সমাজ-নীতির প্রধান কথা। এই সব গুণই আবার সেকালের রোমানরা খোয়াইয়া বসিয়াছিল। অথচ নতুন দেশ গড়িয়া তুলিতে অথবা পুরাণে জন-কেন্দ্রে নবীন জীবনশ্রোত বহাইতে এই সকল গুণই আবশ্যক। এই সব গুণ জার্মান নামের মহিমা নয়।

উচ্চতম স্তরের যে কোনো “বার্কার” নর-নারীই এই সকল
ওণের অধিকারী। গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান এই সবার জন্মদাতা।

সেকালের রোমাণ ধরণের এক-পত্নী-পতিত্বকে মোলায়েম
ভাবে বদলাইয়া জার্মাণরা পরিবারে নারীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া
দিতেছিল কিসের জোরে? সে কি তাহাদের গতানুগতিক
“জননী-বিধি”-নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীধর্মের প্রভাবে নয়?

জার্মাণি, উত্তর ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড এই তিন দেশের
জমিদার-প্রধান ‘কিউদ-পল্লী’ সমাজে জার্মাণরা ‘মার্ক-কমিউন’
বা পল্লী-সমবায় প্রবর্তন করিয়াছিল কিসের জোরে? যে
প্রতিষ্ঠানে ভর করিয়া দরিদ্র কৃষাণরা মধ্যযুগের চরম “ভূমি-
গোলামী”র যুগেও কোন মতে নিজ অধিকার বজায় রাখিয়া
চলিতেছিল, যে প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না ছিল জার্মাণ গোলামদের,
না আছে বর্তমান যুগের শহরে মজুরদের, সেই পল্লী-সমবায়ের
যৌথজীবন জার্মাণরা রোমাণ মূল্যকে আমদানি করিল কোথা
হইতে? ইহাও কি তাহাদের “বার্কার” স্বাভাবিক দান নয়?

তারপর জার্মাণরা যে প্রাচীন জগতের ষোলকলার পূর্ণ
গোলামীর ঠাইয়ে খানিকটা নরম দাস্ত্র প্রবর্তন করিতে সমর্থ
হয় তাহাও কি “বার্কার”-মূলভ সাম্রাজ্য ও ঐক্যের ফল নয়?
মনে রাখিতে হইবে যে, গোষ্ঠী-প্রথায় কোনো দিনই পুরাপুরি
গোলাম নামক শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই।

ফরাসী সোশ্যালিষ্ট ফুরিয়ে বলেন যে, এই মোলায়েম দাস্ত্র
বা নিম্ন-গোলামী প্রথা নির্ধাতিত জনগণের পক্ষে স্বাধীনতার
স্বযোগ বিবেচিত হইত। চাষীরা দলে দলে সত্যবদ্ধ ভাবে এই
প্রথার সাহায্যে ধাপে ধাপে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছে।

পুরা গোলামীতে এই ধরনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন জগতে গোলামেরা বিজ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু মধ্য যুগের সাক্ষ্য বা ভূমি-গোলামের পক্ষে এইরূপে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল।

জার্মানরা রোমান সমাজে যাহা কিছু নতুন জিনিষ দিয়াছে সবই “বার্কার”-স্বলভ গোষ্ঠী-জীবনের ফল। একমাত্র “বার্কার” নর-নারীই একটা মরা জগৎকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে পারে। রোমান সাম্রাজ্য ভাঙিয়া তাহাকে দুরন্ত করিবার শিক্ষা জার্মানরা তাহাদের পূর্ববর্তী “বার্কার” মণ্ডলের আবহাওয়ায় লাভ করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়

“বার্কার” জীবন ও “উৎকর্ষ”

অথাত: সুখ-জিজ্ঞাসা

প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক, রোমান এবং জার্মান এই তিন জাতিই বহুকাল ধরিয়া গোষ্ঠীধর্ম অমুসারে জীবন ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক সমাজেই গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান আবার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য গোষ্ঠী-প্রথার জন্ম, ক্রমবিকাশ এবং পতন ভিন্ন ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঘটিয়াছে।

কিন্তু মোটের উপর যে স্তরের মানব জীবন গোষ্ঠী-প্রথার যুগে সর্বত্র দেখিতে পাই, তাহা “বার্কার” অবস্থার পরিচায়ক। গোষ্ঠীর লোপ “বার্কার” অবস্থার চরম বা উচ্চতম কোঠায় সাধিত হয়। তাহার পর মানব জাতি যে জীবনস্তরের বিকাশ সাধন করিয়াছে, তাহাকে “সিভিলিজেশন” বা “উৎকর্ষের” অবস্থা বলা হইয়া থাকে। “উৎকর্ষের” জন্ম এবং গোষ্ঠীর মৃত্যু সমসাময়িক।

“বার্কার” সভ্যতা মরিল কি উপায়ে? এক কথায় ধন-দৌলতের ব্যবস্থা, স্বত্বস্বচ্ছন্দতা সৃষ্টি করিবার কৌশল, এবং মানব সমাজের আর্থিক ক্রমবিকাশের ভিতর এই মৃত্যুর কারণ-গুলি চুঁড়িতে হইবে। “অথাত: সুখ-জিজ্ঞাসা” প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে নরনারী এমন এক স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছিল যে, তখন আর গোষ্ঠীর “স্বতিশাব্দে” কাজ চালানো অসম্ভব।

এই কার্যকারণ-পরম্পরা বৃষ্টিবার জন্ম কাল মার্কস প্রণীত “ক্যাপিটাল” (বা পুঁজি) নামক গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে। মর্গ্যান প্রণীত “এন্থ্রোপোসাইটি” (বা প্রাচীন সমাজ) নামক গ্রন্থের তথ্যরাশি এবং সভ্যতাবিকাশের ব্যাখ্যা-প্রণালীও সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

“স্কাহেজ” (বা “সহজ” অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ) যুগের মাঝামাঝি গোষ্ঠী-কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। “বার্কার” যুগের নিম্নতর স্তরে এই প্রথা একপ্রকার পাকিয়া উঠে। গোষ্ঠী-নীতির আর্থিক শিরদাঁড়াটা পাকড়াও করিতে হইলে সেই যুগের ধনদৌলতের নিম্নমই আলোচনা করা দরকার।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের আদিম রূপ

আমেরিকার “রেড্‌স্কিন” ইণ্ডিয়ান সমাজে কি দেখিতে পাই? প্রত্যেক “ট্রাইব” বা জাতি সাধারণতঃ দুইটা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠীগুলোও নতুন নতুন গোষ্ঠীতে ভাঙিয়া যাইত। সাবেক গোষ্ঠী তখন “ক্লাজী” নামে পরিচিত হইত। “ট্রাইব”ও নানা ট্রাইবে বিভক্ত হইয়া পড়িত। এই সকল কতুন “ট্রাইবে” পুরাণো গোষ্ঠীর আত্মীয়ও থাকিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রাইবগুলো “ফেডারেশন” সূত্রে “সংযুক্ত-ট্রাইবে” সম্মিলিত হইত।

এই গেল “ইণ্ডিয়ান”দের শাসন-পদ্ধতির কাঠাম। জনগণের ভিতর যে সকল প্রশ্ন উঠিত, সে সব মীমাংসা করিবার পক্ষে এই কাঠাম বেশ উপযোগীই বিবেচিত হইত। বাহিরের লোক-জনের সঙ্গে সমস্তা উঠিলে তাহার মীমাংসা হইত লড়াইয়ে

এই সকল লড়াইয়ের ফলে বিজিত জাতিগুলো লোপাট হইয়া যাইত। সে যুগে বিজেতারা বিজিত জাতিকে “পরাদীন” বা গোলাম করিয়া রাখিতে জানিত না। গোষ্ঠী-প্রথার মহত্ব এবং দুর্বলতাই এইখানে। মনিব-দাস সম্বন্ধ এই প্রতিষ্ঠানে সম্ভবপর নয়।

অধিকন্তু তখনকার দিনে দাবীদাওয়া, কর্তব্য অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে ছিল না। সার্বজনিক কাজে কোনো ব্যক্তির “অধিকার” আছে, অথবা গোষ্ঠীর কোনো লোককে বিদেশী কেহ খুন করিলে গোষ্ঠীর লোকদের পক্ষে তাহার প্রতিহিংসা লওয়া “কর্তব্য”,—এই ধরনের চিন্তা গোষ্ঠীধর্মে ঠাই পাইত না। খাওয়া, ঘুমানো, শিকার করা ইত্যাদি বিষয়ে নরনারীর কর্তব্য বা এক্টিয়ার আছে কিনা—এই সকল কথা যেমন “ইণ্ডিয়ান” মগজে বসিত না, সেইরূপ সামাজিক লেনদেন সম্বন্ধেও “অধিকার-সমস্তা” তাহাদের মাথার বহির্ভূতই ছিল। তাহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন “শ্রেণীতে” কোনো সমাজের লোক ভাগাভাগি থাকিতে পারে ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিত না।

এই ধরনের সমাজ সম্ভবপর হইল কি করিয়া? লোকসংখ্যা ছিল কম। “ট্রাইবে”র (জাতির) মধ্যে যেটুকু জনপদ, সেইটুকুর ভিতরেই তাহাদের বসবাস। এই জনপদের চারিদিকে থাকিত শিকারের মাঠ। তাহার পর ছিল এক সুবিস্তৃত বন। এই বনের সাহায্যে ছুই পরস্পর-স্বাধীন (এবং পরস্পর-শত্রু) জাতিকে তফাৎ করিয়া রাখা হইত। বনটা “উদাসীনীকৃত” ভূখণ্ড। কোন জাতিরই ইহাতে একচোঁটী অধিকার থাকিত না।

“বার্কার” জীবন ও “উৎকর্ষ” ২৭১

শ্রম-বিভাগ ছিল নেহাৎ আদিম ধরণের। স্ত্রীপুরুষ দুই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ সামলাইত। পুরুষেরা লড়াই করিত, শিকারে যাইত, খাচ্ছদ্ৰব্য লইয়া আসিত। ঘরকন্নার কাজে থাকিত মেয়েরা। পোষাক তৈয়ারি করাও ছিল মেয়েদেরই কাজ। নিজ নিজ এলাকায় পুরুষ নারী পরস্পর স্বাধীন। বাহিরের কর্তা পুরুষ, ঘরের কর্তা স্ত্রী। পুরুষেরাই আবার পুরুষোচিত কাজকর্মের উপযোগী যন্ত্রপাতির মালিক থাকিত। গৃহস্থালীর আসবাবপত্র ছিল মেয়েদের “স্বাধীন”। গৃহস্থালী চলিত “যৌথ” নিয়মে। বহুসংখ্যক পরিবারের সম্মুখে ঘরকন্না চলিত একসঙ্গে। কুইন শার্ট দ্বীপের কোনো গৃহস্থালীতে ৭০০ নরনারীর ব্যবস্থা হইত। ছুটকা জাতির ক্ষিধানে গোটা জাতিই এক গৃহস্থালীর অন্তর্গত থাকিত। যা কিছু যৌথরূপে উৎপন্ন হইত এবং ব্যবহৃত হইত সবই “যৌথ সম্পত্তি” বিবেচিত হইত। বাড়ী, বাগান, নৌকা সকল ধনই সাধারণ বা সার্বজনিক।

বর্তমান যুগের কানুনবিৎ নৈয়ায়িক এবং ধনবিজ্ঞান-বেত্তারা বলেন যে, “নিজের উপার্জন করা সম্পত্তি” নামক বস্তু “উৎকর্ষশীল” মানবেয়া আধুনিক কালে সৃষ্টি করিয়াছে। এই মত একদম ভিত্তিহীন। বাস্তবিক পক্ষে “নিজে উপার্জন করা” কথাটা একমাত্র সেই মাছাতার আমলের গোষ্ঠিনিয়ন্ত্রিত যৌথ সম্পত্তির যুগসম্বন্ধেই খাটে। বর্তমান জগতের জুরাচোরেরা একটা মিথ্যা রটাইয়া নব্য পুঁজিসম্পত্তিকে “নিজ উপার্জন করা” দৌলতের গৌরব প্রদান করিতেছেন।

“জানোআর-চাবে” আর্থিক বিপ্লব

কিন্তু মানবসমাজ সর্বত্র “ইণ্ডিয়ান”দের এই আদিম আর্থিক অবস্থায় বেশি দিন রহে নাই। এশিয়ায় পোষ্যমানা জানোআর পাওয়া গিয়াছিল। বুনো বলদ শিকার করা হইত। অগ্ন্যস্ত্র গাভীকে ঘরে রাখা হইত বাছুর বিয়াইবার জন্য আর দুধ দেওয়াইবার জন্য। “আর্য্য”, “সেমিট” এবং “তুরানিয়ান” জাতিও “জানোআর-চাবে” লাগিয়া গিয়াছিল।

মানব জাতির ভিতর এইখানে জগতের সর্বপ্রথম শ্রমবিভাগ বা সামাজিক শ্রেণীভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে। জানোআর পুষিয়া যে সকল নরনারী স্বস্থস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতেছিল তাহারা অগ্ন্যস্ত্র “বার্কার” সমাজ হইতে আর্থিক হিসাবে তফাৎ হইয়া পড়িতেছিল। ইহাদের পরিশ্রমের ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত। অধিকন্তু অনেক নতুন নতুন রকমের সামগ্রীও জানোআর-চাবীদের আর্থিক জীবনের ফল।

“ইণ্ডিয়ান” সমাজে আর এশিয়ার সমাজগুলায় প্রভেদ বাড়িয়া যাইতে থাকিল। দুধ, মাংস, জানোআরের খোল, চামড়া, ছাগলের লোম, পশমের দ্রব্য, বোনা কাপড়চোপড় ইত্যাদি বিচিত্র জিনিষ পত্র তৈয়ারি হইতেছিল। তাহার ফলে মালে মালে বিনিময় সম্ভবপর হইতেছিল। বিনিময় এই যুগের এক বিশিষ্ট আর্থিক তথ্য।

পূর্ব যুগেও বিনিময় চলিত সন্দেহ নাই। পাথরের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে যাহারা ওস্তাদ তাহারা এই গুলার বদলে অগ্ন্যস্ত্র আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। “নব্য-প্রস্তর” যুগের কারখানা

বা কামারশালা জগতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কারখানার তৈয়ারী মাল গোষ্ঠীর বাহিরে যাইত বিনিময় বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু জানোআর-নিষ্ঠ “বার্কার”দের সমাজে বিনিময় প্রথা গোষ্ঠী ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইবের (জাতির) ভিতর মালের আদান-প্রদান নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। প্রথম প্রথম ট্রাইব-নায়কেরা গোটা ট্রাইবের প্রতিনিধিরূপে মাল অদলবদল করিত। পরে যখন জানোআরগুলা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় তখন অবশ্য মাল-বিনিময় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাধীনভাবেই চলিত।

বিনিময়ের প্রধান জিনিষ ছিল জানোআর। কাজেই নর-নারীরা যে সকল জিনিষ তৈয়ারী করিত অথবা বিনিময়ের জন্য হাজির করিত সবই জানোআরের মাপকাঠিতে বিচার করা হইত। অর্থাৎ জানোআরই ছিল সার্বজনিক তুলনাম্ব্য বা মূল্যনিরূপণের উপায় অর্থাৎ “মুদ্রা”।

কৃষি ও শিল্পে আবিষ্কার

“জানোআর-চাষ” এশিয়ার “বার্কার”দের নিম্নতম স্তরের আর্থিক অহুষ্ঠান। ফলের চাষ বা গাছের চাষ এবং শস্যের চাষ কিছু পরবর্ত্তী কালে শুরু হয়। জানোআর পৃথিবীর জন্ত তুরাণ-মুন্স্কের লোকেরা শীতের খোরাক জোগাইতে বাধ্য হইত। সেখানে শীতকাল অনেকদিন থাকে এবং কড়া ভাবে দেখা দেয়। কাজেই পাহাড়ী ময়দানে এবং ক্ষেতে আবাদ চালানো দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

তুরাণী পাহাড়ের মতনই কুম্ভসাগরের উত্তরবর্তী “ষ্টেপ” মাঠে অবস্থা, এইখানেও জানোআর-সেবার জন্তই কৃষিকার্যের জন্ম হইয়াছিল। শস্তগুলা পশুর খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইবামাত্র এই সব মাছুষের সেবায়ও লাগিতে থাকে।

চম্বা জমি ছিল প্রথম প্রথম ট্রাইবের সম্পত্তি। ট্রাইবের নিকট হইতে এই জমি পায় গোষ্ঠীরা পরে। গোষ্ঠী এইগুলা ভাগাভাগি করিয়া দিয়াছিল পরিবারের ভিতর। শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির হাতে আসিয়া এইগুলা চৈকিত। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কেহ জমিগুলা “নিবন্ধে” পরিণত করিতে পারিত না। ভোগ-স্বৰ্গে মাত্র ছিল তাহাদের অধিকার।

এই যুগে শিল্পের আবিষ্কার সাধিত হয় দুই দিকে। প্রথমতঃ, তাঁতের সাহায্যে “বার্কারে”রা কাপড় বুনিতে শোখে। দ্বিতীয়তঃ, ধাতু গলাইয়া ধাতুর মাল তৈয়ারী করায়ও তাহাদের মাথা খেলিতে থাকে। তামা, টিন এবং এই দুইয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত পিতল ছিল তাহাদের প্রধান ধাতু। পিতল দিয়া অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী হইত কিন্তু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তখনও উঠিয়া যায় নাই। একমাত্র লোহার যন্ত্রপাতির পক্ষেই পাথরের ঠাই অধিকার করা সম্ভব। কিন্তু লোহার ব্যবহার সে যুগে আবিস্কৃত হয় নাই। সোনা রূপার বেওয়াজ তখন ছিল গহনার জন্ত। তামা পিতল ইত্যাদির চেয়ে এই দুই ধাতুর কদরও বেশি ছিল।

“জানোআর-চাবে”, কৃষিকর্মে, গৃহশিল্পে—সকল পথেই ধনদৌলত বাড়িয়া যাইতেছিল। জীবন ধারণের জন্ত যা কিছু দরকার মাছুষেরা পরিবারের দ্বারা তাহার চেয়ে বেশি সৃষ্টি করিতেছিল। প্রত্যেক লোকের হস্তায় দৈনিক খাটুনির পরিমাণও বাড়িয়া

গিয়াছিল। নতুন নতুন শ্রমশক্তির আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। লড়াইয়ের বন্দীরা গেলানামভাবে এই নতুন শ্রম জোগাইত। এতদিনে সমাজে দুই শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইল। এক শ্রেণী মনিব, অপর শ্রেণী দাস। এক শ্রেণী অপরের পরিশ্রমের ফলের উপর বিনা মেহনতেই ভাগ বসায়। অপর শ্রেণী পরের জন্ত গতর খাটিয়া নিজের রক্ত জল করিয়াই মরে।

এই যুগেই জানোয়ারের পালঙলা গোষ্ঠী বা জাতির সমবেত আওতা হইতে পরিবার-নায়কদের হাতে আসে। কিন্তু কি উপায়ে স্বত্ব-নীতির পরিবর্তন ঘটয়াছিল তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। তবে এইখানে একটা নতুন আর্থিক তথ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। এইরূপ বুঝিয়া রাখা উচিত।

পুরুষ প্রাধাত্যের সূত্রপাত

খাওয়াপরাইর জিনিষ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ছিল পুরুষের কাজ। পুরুষেরাই আবার এই সব “পুরুষোচিত” জীবনের সকল কিছুই মালিক। কাজেই জানোয়ার এবং জানোয়াররূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈয়ারী সকল ধনদৌলতেরই মালিক হইত পুরুষেরা। স্ততরাং গোলাম এবং ভোগের পর যা কিছু সম্পত্তি বেশি থাকে সবই পুরুষের নিজস্ব পরিণত হইতে থাকিল।

মেয়েরা ছিল ঘরের কাজের কর্তা এবং ঘরোয়া “নারী-জনোচিত” আসবাবপত্রের মালিক। পুরুষোচিত ধনদৌলতে তাহাদের “ভোগ-স্বত্ব” থাকিত মাত্র। কাজেই “বার্কার” যুগে যখন “ধন-বৃদ্ধি” হইতে থাকিল আর গোলাম, “উৎকর্ষ” সম্পত্তি ইত্যাদি “নানারূপে” ঘোলত দেখা দিল তখন নারীর অবস্থা

ক্রমেই নামিতে শুরু করিল। “স্বাস্থ্যজ” বা সহজ যুগে যখন লড়াই আর শিকার করাই পুরুষের প্রধান কাজ ছিল তখন ধনদৌলতের মাত্রা ছিল কম। কাজেই তখন মেয়ে-পুরুষে ধনের ক্ষেত্রে উনিশ বিশ দেখা যাইত না। বস্তুতঃ তখন মেয়েরাই ছিল পুরুষদের চেয়ে বড়।

এখন মেয়ে-পুরুষের সম্বন্ধে “যুগান্তর” সৃষ্ট হইল। ঘরের রাণী স্ত্রী আর বাহিরের রাজা পুরুষ,—এই নীতিই চলিতে-ছিল সত্য। কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজে ধনদৌলতের বৃদ্ধি হওয়ায় আর সেই ধনদৌলতের অধিকাংশই “বাহিরের কাজ” হওয়ায় সমাজে পুরুষের ইচ্ছদই বড় বিবেচিত হইতে থাকিল। তাহার বলে পরিবারের ভিতরই স্ত্রীধন দাঁড়াইয়া গেল নগণ্য এবং পুরুষই হইল সর্বোচ্চ। বাস্তবিক পক্ষে ঘরোয়া কাজটা বিশেষ কিছু বিবেচিতই হইত না।

সেই যুগে পুরুষ-প্রাধান্য এবং নারী-দাসত্ব শুরু হইয়াছে। নারী যতকাল বাহিরের কাজে যোগ দিতে অসমর্থ ততকাল তাহার স্বাধীনতা সুদূর-পর্যন্তই রহিয়াছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া বাহির হইতে নারীকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। নারীকে ঘরের কাজে আটকাইয়া রাখিয়া পুরুষকে বাহিরের কাজে একচেটিয়া এক্তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের ফ্যাক্টরি-নিয়ন্ত্রিত শিল্পের আমলে মেয়েরা প্রথম সামাজিক অর্থাৎ বাহিরের কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে যোগ দিতে সমর্থ হইতেছে। এমন কি ঘরোয়া অর্থাৎ তথাকথিত নারীজনোচিত কাজগুলোও অনেকটা সামাজিক কাজে পরিণত হইতেছে। কাজেই স্ত্রী-স্বাধীনতার মামলা এতদিন পরে মাথা তুলিতে পারিয়াছে।

পুরুষ পরিবারে একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসিল। এই সূত্রে মনে রাখিতে হইত যে, “জননী-বিধি”র ঠাইয়ে “পুরুষ-বিধি” (অর্থাৎ পুরুষামুসারে বংশানুক্রম এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার) কায়েম হওয়ায় গোটা সমাজেই পুরুষের আধিপত্য এই যুগে চলিতেছিল। তাহার উপর “জোড় পরিবার” সুলভ “অবাধ যোনিসংশ্রবের” (অতএব স্ত্রী-স্বাধীনতার) দিন আর ছিল না। এক-পত্নী-পতিত্বের প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাহার ফলে যোনি-সংশ্রব বিষয়ে নারীর সংযম এবং পুরুষের যথেষ্টাচারই প্রকারান্তরে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুরাণে গোষ্ঠী-নীতির বিরুদ্ধে এই প্রথা এক প্রবল আঘাত দিয়াছে। সকল তরফ হইতেই জগৎ পুরুষ-প্রাধান্বে অভ্যস্ত হইতে থাকিল।

লোহার আর্থিক প্রভাব

পরে আসিল লোহা আবিষ্কারের যুগ। লোহার তলোআর, লোহার হাল এবং লোহার কুড়াল ইত্যাদি যন্ত্র মানুষের দাসে পরিণত হইল। যে সকল কুদ্রুতি বা কাঁচা মাল আর্থিক ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইয়াছে, তাহার ভিতর লোহা সর্বপ্রধান। আর আলু ছাড়া বোধ হয় লোহাই জগতের শেষ যুগান্তর-সাধক দ্রব্য।

লোহার প্রভাবে মানুষ কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার সাধন করিতে পারিয়াছে, বন কাটিয়া চাষ আবাদেয় ভূমি তৈয়ারী করিতে পারিয়াছে। লোহার প্রভাবে মানুষ পাথরের যন্ত্রপাতি ছাড়িয়া তীক্ষ্ণতর যন্ত্রপাতির সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু জগতে লোহার রেওয়াজ বড় শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। প্রথম প্রথম লোহার

অল্পলব্ধ পাথরের চেয়ে নরম হইত। “হিডেন্ড্রাও” গাথায় পাথরের যন্ত্রপাতিই চলিতেছে। এমন কি ১০৬৬ সালে হেষ্টিংসের যুদ্ধক্ষেত্রেও ইংরেজরা পাথরের কুড়াল লইয়াই লড়িতে গিয়াছিল।

যাহা হউক লোহার তৈয়ারী দ্রব্যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতে থাকিল। জাতি বা জাতিসত্ত্ব নগর নির্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইল। পাথর বা টালির ঘর পাথরের দেওয়ালে ঘেরা শহর,—এই ছিল সে যুগের বাস্তবীতি। বয়ন কার্য, ধাতু শিল্প ইত্যাদি সকল প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টায় নিত্য নতুন শাখা প্রশাখা বাহির হইতেছিল। স্বকুমার কারুকার্যও প্রত্যেক শিল্পেরই সহচর ছিল। কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিত একমাত্র শস্ত নয়। মদ তৈয়ারী করিবার সম্বন্ধও উঠিতেছিল। মানব জাতি ধন-দৌলতের হিসাবে প্রাচুর্য্য ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইল।

লোহার যুগের প্রথম প্রথম আর একটা বড় কথা এই যে, কৃষিকার্য্য হইতে শিল্পকর্ম পুরাপুরি আলাদা হইয়া গিয়াছিল। ধনসৃষ্টির নেশায় পড়িয়া মানুষ নূতন নূতন মজুব ঢুটিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ববর্তী যুগে গোলামী আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই প্রথাই এখন আরও ফুলিয়া উঠিল। চাষআবাদে কারখানায় সর্বত্রই গোলামের শ্রম এই যুগে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চাষের ফলে আর শিল্পের ফলে অদলবদল পুরামাত্রায়ই সাধিত হইতেছিল। এক কথায় বিনিময়ের যুগে এখন জোয়ার চলিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কি সাগর ডিঙাইয়া পর্য্যন্ত জীবন-শ্রোত দেখাইতেছে। সাবেক কালের জানোয়ার-মুজা ক্রমে ক্রমে মাছাতার আমলে পরিণত হইতেছিল। তাহার ঠাইয়ে আসিয়া

দাড়াইতেছিল ধাতুর মূর্ত্তা। সোণারূপা ওজন হিসাবে,—
মোহর হিসাবে নয়,—বিনিময়ের মাপকাঠি বিবেচিত হইতেছিল।

এতদিন সমাজে চলিতেছিল মনিব-গোলাম ভেদ। এখন
হাজির হইল ধনী-দরিদ্র ভেদ। পরিবার-নায়কদের সম্পত্তি-
সাম্য আর বজায় ছিল না। উনিশ বিশ, কম বেশি, উচু
নীচু দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-সমবায় উঠিয়া যাইতেছিল।
কাজেই গোটা সমাজের জন্ত যৌথ চাষ আর যুগোপযোগী ছিল
না। চাষবাসের জমিগুলা প্রত্যেক পরিবার নিজস্বরূপে
পাইতে থাকিল। প্রথম প্রথম এই নিজস্বভোগ চলিত কিয়ৎ-
কালের জন্ত। পরে নিজস্বগুলা স্থায়ী পারিবারিক সম্পত্তিতে
পরিণত হয়। “মনগেমি” বা এক-পত্নী-পতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে
নিজস্বপ্রথা সমাজে পাকা ঘর করিয়া বসে।

গোষ্ঠী-নীতির ক্রমিক লোপ

ধনবৃদ্ধি এবং লোকবৃদ্ধি এক সঙ্গে চলিতেছিল। কাজেই
দুস্মন হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও বাড়িতেছিল। নিকট-
আত্মীয় স্বরূপ টাইব বা জাতিগুলা এই কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে
থাকে। জাতিগুলার সম্মেলনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জনপদ
একত্রে বিশাল দেশে পরিণত হইয়াছিল। সমর-সর্দার—“রেক্স”
নামেই হউক, বা “বাসিলিউস” নামেই হউক অথবা “থিউড্যান্স”
নামেই হউক,—সর্বত্রই অতি প্রধান বিবেচিত হইতেছিল।

যেখানে যেখানে সার্বজনিক-সভা নামক প্রতিষ্ঠান ছিল
না, সেই সকল স্থানে এই কেন্দ্র কায়েম করা হইয়াছিল।
তাহা ছাড়া সমর-সর্দার (বা রাজা) এবং সর্দার-পরিষৎ ত

আছেই। এই তিন কেন্দ্রে মিলিয়া সাবেক কালের গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের স্থান পূরণ করিল। এই প্রথাকে রাজতন্ত্র না বলিয়া সামরিক-গণতন্ত্রই বলা কর্তব্য। জনগণের সাম্য তখনও বজায় ছিল।

“সামরিক” বলা হইতেছে এই জন্ত যে লড়াই সে যুগের নিত্যকর্মপদ্ধতি বিশেষ। “বার্কারে”রা পরস্পরের ধনদৌলতের উপর লোভ করিতেছিল। সাবেক কালের লড়াই ছিল গোষ্ঠী-ধর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রকার দুরাচরণের সাজা বিশেষ। কিন্তু এই যুগে লড়াই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল লুটপাটের ফিকির।

নগরগুলার দেওয়াল সেই যুগেই ডাকাইত-বীরদের বিরুদ্ধে সাক্ষী। নগর-দুর্গের চারিধারকার খালের ভিতর গোষ্ঠী-ধর্মের “ভাই ভাই এক ঠাই” নীতির কবর দেখিতে হইবে। আর দুর্গ-চূড়ার মাথাগুলো গিয়া ঠেকিতেছিল “উৎকর্ষের” যুগের উন্মায়।

লড়াইয়ের ফলে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থায়ও নবরূপ দেখা দেয়। সমর-সদ্যার (বা রাজা) এবং তাহার পেটোআ স্বরূপ সেনাপতি ও অন্যান্য রণনায়ক দেশের ভিতর জ্বরদন্ত হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম সদ্যার বাছাই হইত কোন নির্দিষ্ট পরিবার হইতে। পরে এই পদ বংশানুক্রমিক দাঁড়াইয়া যায়। বংশগত “রাজ্য” লাভ জনগণের পছন্দসই ছিল না। কিন্তু কালক্রমে একটু একটু সহিতে সহিতে তাহাদের হাড় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল। তাহারা বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করিলে রাজপুত্র স্বয়ংই স্বেচ্ছায় আসিয়া বসিত। রাজতন্ত্র, কোলীগ্র, আভিজাত্য ইত্যাদি অস্থান জন্মের অধিকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হইল। বিলকুল এক বিপরীত

“বার্কার” জীবন ও “উৎকর্ষ” ২৮১

প্রাচীন তাহার স্থান অধিকার করিল। গোষ্ঠীর আমলে ট্রাইব বা জাতি এবং জাতিসমূহ ছিল স্বাধীনতা বিকাশ এবং স্বাধীন শাসনের যন্ত্র। সেই কেন্দ্র এখন হইল পরজাতি-পীড়ন এবং পরের ধন লুটিয়া আনিবার কৌশল।

গোষ্ঠীর কেন্দ্রগুলি আগে ছিল সার্বজনিক গোষ্ঠীমতের সেবক। এখন হইল সেইগুলি “স্ব”-তন্ত্র শাসনকেন্দ্র। তাহার প্রভাবে স্বগোষ্ঠীর লোকজনই শোষিত এবং নির্যাতিত হইতে থাকিল।

সমাজে ধনদৌলতের লোভ না ঢুকিলে এই যুগান্তর ঘটিত না। কেন না এই লোভেই গোষ্ঠী-সমাজে ধনীনিধন ছোট-বড় ভেদ সৃষ্ট হয়। কার্ল মার্কস বলেন :—“সম্পত্তির অসাম্যেই সাবেক কালের যৌথ-গোষ্ঠী-গত-স্বার্থের ঐক্য ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার স্থানে দেখা দিয়াছিল স্বার্থের দলাদলি, নানা শ্রেণীর লোকের নানা স্বার্থ।”

এই যুগান্তর সাধনের পথে আর একটা কারণও কাজ করিয়াছে। সে গোলামী বা দাসত্ব প্রথা। এই প্রথার প্রভাবে গায়ে খাটিয়া খাওয়া সমাজের স্বাধীন লোকের মহলে নিন্দনীয় বিবেচিত হইত। ডাকাইত্ব করিয়া পরের ধন লুটিয়া খাওয়া মেহনৎ করিয়া অন্ন সংস্থান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর,—এইরূপ চিন্তা জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে ঘুণ ধরিয়াছিল।

বিনিময় ও শ্রমবিভাগ

গোষ্ঠী ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে “বার্কার” ও “উৎকর্ষের” যুগের “সন্ধিক্ষণ” উপস্থিত। “উৎকর্ষ” বা “সিভিলিজেশানে”র স্তরে

মানব-সমাজ পা দিতে দিতে এক নতুন ধরণের শ্রমবিভাগ প্রকটিত হইয়াছিল।

“বার্কার” সভ্যতার প্রথম স্তরে ধনদৌলত উৎপন্ন হইত একমাত্র সমাজের লোকের স্বভোগের জন্ত। ভোগের পর “উদ্ধৃত্ত” কিছু থাকিত না। থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ। এই যৎকিঞ্চিৎ মাল অস্ত্র সমাজের ধনদৌলতের সঙ্গে অদলবদল করা হইত।

ভেদ ও বিনিময় ছিল নেহাৎ আদিম বা নগণ্য।

উচ্চতর স্তরে উঠিয়া “বার্কার” নরনারী জানোয়ার-ধনের মালিক হিসাবে বহুবিধ এবং প্রচুর পরিমাণে “উদ্ধৃত্ত” মাল সৃষ্টি করিত। এই সকল “উদ্ধৃত্ত” মাল লইয়া যাইয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পমত (গোধনহীন) জাতিদের সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা করিত।

“বার্কার” সভ্যতার উচ্চতম স্তরে বিনিময় এবং শ্রমবিভাগ আরও বিস্তৃত এবং গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষি এবং শিল্প এই দুই শ্রেণীর আর্থিক প্রচেষ্টায় সেই স্তরের লোক ভাগাভাগি থাকিত। স্বভোগের জন্ত মাল সৃষ্টি করা তখন আর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। “বিনিময়”ই ধনোৎপাদনের কেন্দ্রস্থলে দেখা দিতেছিল।

তাহার পর “উৎকর্ষের” যুগ। এই যুগে পূর্ববর্তী “বার্কার” স্তরগুলার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ফূট হইতে থাকে। অধিকন্তু শ্রম-বিভাগ এবং বিনিময়-প্রথা শহর ও পল্লী এত দুই শ্রেণীর কেন্দ্রে বিশিষ্টতা লাভ করে। শহর ও পল্লীর পরস্পর সম্বন্ধে ইতিহাস দুই স্তর দেখাইয়াছে। প্রাচীনতর—গ্রীক-রোমান-যুগে শহর ছিল পল্লীর জীবন-নিয়ন্তা। পরবর্তী কালে—মধ্যযুগে পল্লী বা মফঃস্বলই শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করিত।

“উৎকর্ষের” যুগোত্তর আর এক শ্রমবিভাগ প্রকটিত হয়। ধনের উৎপাদনকারী—অর্থাৎ কৃষক ও শিল্পীরা হইল এক শ্রেণী। আর যাহারা ধনের উৎপাদনে যোগ দেয় না, পরন্তু ধনের বিনিময় লইয়াই জীবন কাটায়, এই ধরণের এক শ্রেণীর লোক সমাজে গড়িয়া উঠিল। এইরূপ বিনিময়-সাধক লোককে বলে ব্যাপারী, ব্যবসাদার বা বণিক।

জগতে এতদিন যে সকল শ্রেণীবিভাগ চলিতেছিল—তাহাতে ধনের “উৎপাদনকারী”দের ভিতরই দল, জাতি ইত্যাদি কেন্দ্র সৃষ্টি হইতেছিল। ধন-স্রষ্টাদের কেহ হইত পরিচালক, কেহ হইত হকুম তামিল করিবার লোক। কেহ বা বড় বড় ধনস্রষ্টার মালিক, কাহার তাঁবে বা অল্প মাত্র মাল তৈয়ারী হইত; ইত্যাদি। কিন্তু বণিক, ব্যবসায়ী বা ব্যাপারী শ্রেণীর উৎপত্তিতে সমাজে একদম নতুন লক্ষণ উপস্থিত হইল। সমগ্র ধনস্রষ্টা শ্রেণীটাই এই নতুন শ্রেণীর লোকের তাঁবে আসিয়া পড়িল। অথচ ইহারা নিজে ধনস্রষ্টার কোনো কাজে বহাল নয়।

এই লেনদেন সহায়ক বিনিময় সাধক বণিক শ্রেণীর কার্য বিচিত্র। ইহারা ছুই ভিন্ন ভিন্ন ধনস্রষ্টার মধ্যে আনাগোনা করিয়া প্রত্যেককে সাহায্য করিবার ছলে পরস্পরকে পরস্পর হইতে আলাদা করিয়া রাখে। ইহারাই প্রত্যেক ধনস্রষ্টার মাল ছুনিয়ার দেশ বিদেশে বিনিময়ের জন্ত পাঠাইয়া নিজেদেরকে সমাজের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতাপশালী করিয়া তুলে।

ইহাদের মেহনৎ সামান্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই “পর-গাছা” গুলি ধনস্রষ্টাদের মেহনতের উপর চড়াহারে ভাগ বসাইয়া থাকে। এইরূপে “বিনাশ্রমে” ধনের অধিকারী জাতি

নিজের ভুঁড়ি মোটা করিতে করিতে সমাজের ধনস্বষ্টি কাণ্ডটাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতে সমর্থ হয়।

ফলতঃ শিল্প কারখানায় কাজকর্মে প্রত্যেক কয়েক বৎসর পর পর এক একবার মহা দুর্ধোগ ঘটাইয়া তুলে এই “পরের ধনে পোন্ধার” মহাশয়দের কৃতিত্ব। “উৎকর্ষে”র যুগের আর্থিক তথ্য সমূহের ভিতর এই সব দুর্ধোগ এক বড় কথা। এই অবশ্য আধুনিকতম কালের চরম বিকাশ সম্বন্ধে খাটে।

মুদ্রার আবির্ভাব

“উৎকর্ষে”র যুগে প্রথম প্রথম বণিক শ্রেণী সবে মাথা তুলিয়াছিল মাত্র। তখন তাহারা তাহাদের চরম পরিণতির প্রতাপ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। কিন্তু তখনই তাহারা নিজ ক্ষমতা খাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিল ঢের। সেই সময় ধাতুর মুদ্রা প্রথম দেখা দেয়। এক “অদ্ভুত চীজ” সকল ধনের ধন স্বরূপ এই মুদ্রা অনেকটা বাহুমন্ত্রের মতন কাজ করিত। যাহারই হাতে মুদ্রা থাকুক না কেন সে অত্যাশ্চর্য সকল লোকের ধনের উপর কর্তৃত্ব করিতে অধিকারী। বলা বাহুল্য এই বস্তু বেশি পরিমাণে থাকিত বণিক জাতিরই পেটরায়।

মুদ্রার মালিক বণিকেরা অত্যাশ্চর্য ধনের স্রষ্টাদিগকে নিজ মুঠার ভিতরে রাখিতেছিল। মুদ্রার ধ্যান, মুদ্রার পূজা, মুদ্রার সেবা অত্যাশ্চর্য ধনীদেব পক্ষে একটা নিত্যকর্মে পরিণত হইয়াছিল। কেননা মাল না বেচিলে তাহাদের গত্যস্তর নাই। বণিক শ্রেণী এই অবস্থা বেশ বৃদ্ধিত এবং ধনীদিগকে নাকের জলে চোখের জলে বুকাইয়াও ছাড়িত।

“বার্বার” জীবন ও “উৎকর্ষ” ২৮৫

মাল বেচাকেনাই মুদ্রার একমাত্র কাজ নয়। মুদ্রা কর্জ দেওয়া কর্জ লওয়াও সংসারী লোকের মামুলি রেওয়াজ। কাজেই সুদের ব্যবসাও বণিক মহলে একটা মোটা ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সুদখোরদের কবলে ঋণগ্রস্ত নরনারীর বিরূপ নির্যাতন সম্ভব তাহা প্রাচীনতম গ্রীক এবং রোমান কানুনে ধারায় ধারায় লিখিত আছে। “উৎকর্ষ”র যুগ এইরূপেই জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

মালগুলা—পশুজ, কৃষিজ, শিল্পজ—ছিল ধনদৌলতের প্রথম রূপ। তাহার পর অথবা সঙ্গে সঙ্গে গোলাম নরনারী ধনদৌলতের তালিকায় ঠাই পায়। এই দুই প্রকার ধনদৌলত “উৎকর্ষ”র যুগে মানুষকে প্রাচুর্য্য ভোগের সুযোগ দিয়াছিল। সেই প্রাচুর্য্যই আরও ফুলিয়া উঠে মস্ত মস্ত জমিজমার দখল ফলে।

ব্যক্তিগত ভূমিসম্পত্তি “উৎকর্ষ”র যুগের এক বড় প্রতিষ্ঠান। গোষ্ঠী বা জাতির এক্টিয়ার এবং ভোগস্বত্ব উঠিয়া গিয়াছিল। ব্যক্তির যৌথস্বত্বের আক্সা হইতে মুক্তি লাভ করিল। ভোগ এবং অধিকার দুইই পূরাপুরি ব্যক্তির হাতে আসার ফলে জমিজমা কেনাবেচা করিবার ক্ষমতাও তাহার অধীন হইল।

এতদিন জমির সঙ্গে গোষ্ঠীর জাতির (এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মাত্রেই) একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। সেই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলা নরনারীর পক্ষে অসাধ্য বিবেচিত হইত। কিন্তু জমিজমা সম্বন্ধ হইতে স্বাধীন হইবামাত্রই ব্যক্তিও জমিজমা হইতে মুক্ত হইল। গোষ্ঠী হইতে স্বাধীনতা লাভ করা এবং জমি হইতে স্বাধীনতা লাভ করা দুইই ব্যক্তির পক্ষে এক সঙ্গে ঘটিয়াছে। দুইই “উৎকর্ষ”র যুগের আর্থিক তথ্য।

মুদ্রার প্রভাবে জমিজমা কেনাবেচা সহজসাধ্য ছিল। কর্কজ দেওয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লগ্নি কারবার এবং বন্ধক রাখাও প্রচলিত ছিল। আর্থেনিয় সমাজে জমি বন্ধক রাখার প্রথা সুবিদিত। জমিজমার স্বাধীনতা লাভ করার মতলবই এই। এক-পত্নী-পতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যেমন “হেতেরে” প্রথা এবং বৈশ্বাবৃত্তি স্বাভাবিক রূপেই দেখা দিয়াছে সেইরূপ গোষ্ঠী হইতে এবং জমি হইতে স্বাধীন হইবামাত্রই ব্যক্তি জমি লইয়া ব্যবসা সুরু করিয়াছে। তাহারই এক লক্ষণ জমি বন্ধক।

নানা দিকে ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিল। আর ধনবৃদ্ধির ফল গুলা আসিয়া মজুত হইতে লাগিল একটা ছোটখাটো দল বা শ্রেণীর হাতে। এই ছোট নতুন ধনীর দল সাবেক কালের প্লেস্টী-কুলীনদিগকে নিস্প্রভ করিয়া ছাড়িল। কি আর্থেনিয়, কি রোমান, কি জার্মান সকল সমাজেই পুরাণো অভিজাতদের ঠাইয়ে নবীন কুলীন উপস্থিত হইল।

অপর দিকে সমাজের অবশিষ্ট নরনারী শোষিত ও নির্যাত্ত হইতে থাকিল। তাহাদের দারিদ্র্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গ্রীসে এই সঙ্গে গোলাম নির্যাতন দেখা দিল। গোলাম সংখ্যা বাড়িয়াও গিয়াছিল খুব বেশি। আথেন্সে ছিল ১৬৫,০০০ গোলাম, কোরিন্থের গোলাম সংখ্যা ৪৬০,০০০ এবং এজিনায় ৪৭০,০০০। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তখন আসল স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ। এই গোলাম-তন্ত্রের উপর ভর করিয়া গ্রীক সমাজের তথাকথিত গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করিতে থাকে।

সমাজে নবশক্তি

এই অবস্থায় গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান কি আর টিকিয়া থাকিতে পারে? গোষ্ঠী ধর্মের গোড়ার কথাই এই যে, সমরক্তশীল লোকেরা একই জনপদে ঘোঁষভাবে বসবাস করিবে। তাহাদের “কোঠে” কোনো বিদেশীর পা মাড়ানো চলিবে না। সে ত আজ বহু কালের কথা।

দেশী, বিদেশী, গোলাম, মস্কল, ব্যাপারী ইত্যাদি সকল প্রকার নরনারী “উৎকর্ষের” যুগে একত্র বাস করিতেছিল। “বার্কার” সভ্যতার মধ্যস্তরে লোকেরা গৃহস্থ হইতে শিখে। কিন্তু এখন ব্যবসাবাণিজ্যের হিড়িকে পড়িয়া মাহুষেরা বাস্তবিকভাবে যেখানে যখন সুবিধাজনক তখন সেখানে কায়েম করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল।

গোষ্ঠীর লোকেরা এই যুগে একত্র হইয়া গোষ্ঠীগত কাজকর্ম সামলাইবার সুযোগই পাইত না। খাঁওয়ারপারার ধাক্কায় সমরক্তের নরনারী ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জীবন যাপন করিতে বাধ্য ছিল। বড় জোর ধর্মকর্ম ইত্যাদি নেহাৎ নগণ্য বিষয়ে বোধ হয় ইহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া উৎসবাদি চালাইতে সমর্থ হইত।

অধিকন্তু এখন মাহুষের জীবনে নতুন নতুন আকাজক্ষা জাগিয়াছে। শিল্পগুলা সাবেককালের গোষ্ঠীতে জানা ছিল না। শহর নামক কেন্দ্র গোষ্ঠী ধর্মে অবিরুদ্ধ। এই সকল নতুন জীবন কেন্দ্র, এবং নতুন জীবন যাপনের প্রভাবে মাহুষ আর গোষ্ঠীকে “আমল” দিবে কি করিয়া? অধিকন্তু প্রত্যেক নয়া

জীবন কেন্দ্রে এবং নয়া কর্তব্য সাধনায় ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির লোক সখ্যমুখে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদানপ্রদান চালাইতে অভ্যস্ত ছিল। এই সকল নবজীবনের স্বার্থের জন্য নব নব শাসন কেন্দ্রের উৎপত্তি অবশ্যজ্ঞাবী। এইগুলার সঙ্গে পুরাণে গোষ্ঠীর সংস্রব না থাকাই স্বাভাবিক।

গোষ্ঠীর বাহিরে নবীন নবীন জীবন-কেন্দ্রে গড়িয়া উঠার অর্থ এই যে গোষ্ঠী প্রথার শত্রুগুলা মানব-সমাজে দাঁড়াইয়া গেল। এই সকল কেন্দ্রে ধনোনিধনের সমস্তা মীমাংসা, উত্তমৰ্ণ অধমর্ণের সমস্তা মীমাংসা ইত্যাদি গোষ্ঠী ধরণের অজানা নতুন ধরণের সমস্তাগুলার মীমাংসা সম্ভবপর হইত। এই সকল কেন্দ্রেই “অজ্ঞাত কুলশীল” বিদেশীদের অধিকার এবং এক্টিয়ার ভোগের ক্ষেত্রও স্রুটিত।

গোষ্ঠী ছিল সাম্য ধর্মের প্রতিমূর্তি। নরনারীর গণতন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানের শাসন রক্ত। কিন্তু এখন সমাজে পয়সাওয়ালাদের প্রতাপ, বিদেশীদের প্রভাব ইত্যাদি নতুন লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাহার উপর গোলাম স্বাধীন প্রভেদ ত আছেই। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার পরস্পর বিবাদ ও খাওয়াখাওয়ি নিবারণ করিতে পারে কে? এমন একটা শক্তি বাহ্য প্রত্যেক শ্রেণীর উপর থাকিয়া প্রত্যেকের প্রতিই নিরপেক্ষ বিচার চালাইতে সমর্থ। সেই শক্তির নামই সার্বজনিক-দণ্ড-কমতাশীল-রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র কাহাকে বলে?

সর্বত্রই দেখা যায় যে, গোষ্ঠীর চিতাভ্রমের উপর রাষ্ট্রের জন্ম

হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই জন্মকথা কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছিল।

(১)

আথেনিয় সমাজে গোষ্ঠীর ভিতর শ্রেণী বিবাদ শুরু হয়। সেই শ্রেণীগুলো হইতেই রাষ্ট্র মাথা তুলিয়াছিল।

রোমান-সমাজে বিদেশী “প্রেবল্” শ্রেণী গোষ্ঠীর ভিতর প্রবেশ করিবার এবং গোষ্ঠী ধর্মের অধিকার ভোগ করিবার জন্ত লড়াই শুরু করে। এই দু’য়ের দেশী বিদেশীয়—সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় রাষ্ট্র যাহার আওতায় গোষ্ঠী-সমাজ এবং প্রেবল্-সমাজ দুইই কাবু হইতে থাকে।

জার্মান-সমাজে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল বহুসংখ্যক সুবিস্তৃত রোমান জনপদ দখল করিবার ফলে। গোষ্ঠী ধর্মের দ্বারা বিজিত সমাজগুলো শাসন করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই একটা নতুন জীবনকেন্দ্রের উৎপত্তি অবশ্যস্বাভাবী হইয়াছিল। তঁবে এই অবস্থায় বিজেতা বিজিত দুই সমাজের আর্থিক জীবন প্রায় এক স্তরেরই প্রতিষ্ঠান ছিল। এই কারণে জার্মান শাসিত রোমান প্রদেশে প্রদেশে সাবেক গোষ্ঠীর নিদর্শন অনেক কাল বাচিয়া গিয়াছিল। “মার্ক” বা পল্লী সমবায়ের আসরে সেই গোষ্ঠী ধর্মের জীবনলীলা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। অধিকন্তু অভিজাত কুলীন বা পাত্রিশিয়ান বংশে গোষ্ঠী-নীতির পুনর্জীবনও দেখা গিয়াছিল। এই পুনর্জীবনের চিহ্ন এমন কি কিয়দংশ সমাজেও দেখিতে পাই। “ভিন্নমাসিয়া” নামক প্রতিষ্ঠান কুমাণ পরিবারে গোষ্ঠী জীবনের সাক্ষী।

না কেন নরনারীরা নিজ নিজ বাস্তবতা অনুসারে দেশগত কেন্দ্রে সার্বজনিক কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য হইল। দাবীদাওয়া যা কিছু সবই তখন হইতে স্থানীয় বা দেশিক। এই নিয়ম আজকালকার নরনারীর পক্ষে একটা মামুলি কথা। কিন্তু কি আথেসে, কি রোমে এই নিয়ম জারি হইতে মাথা ফাটাফাটির দরকার হইয়াছিল। রক্তের টানে সামাজিক কর্তব্য অধিকারের স্বধর্ম বড় সহজে পরাজয় স্বীকার করে নাই।

রাষ্ট্রের আর একটা বড় কথা এই যে, দণ্ডের ক্ষমতা একটা নতুন কেন্দ্রের অধীন। সে সাবেক কালের গোটা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। গোষ্ঠীর আমলে সকল নরনারীই ছিল দেশের শৃঙ্খলা বিধানে এবং দেশরক্ষায় অধিকারী। কিন্তু পরে গোলাম দেখা দেয়। আথেসের ৯০,০০০ স্বাধীন জীব ৩৬৫,০০০ গোলামের মনিব। এই অবস্থায় গোটা সমাজ শাস্তি-রক্ষক বা পল্টন হইতেই পারে না। কাজেই একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তোলা দরকার হইয়াছিল। তাহার দ্বারা গোলাম গুলাকে দাবিয়া রাখা চলিত। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন নরনারীর ভিতরই শৃঙ্খলা ও শাস্তি কায়েম করা সম্ভব হইত। জেলখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই স্বতন্ত্র দণ্ড ক্ষমতারই প্রতিমূর্তি। গোষ্ঠীর আমলে এই সবার দরকার হইত না।

দণ্ডক্ষমতার কেন্দ্রকে কোথায়ও কথঞ্চিৎ ছোট আকারে দেখিতে পাই। কোথায়ও বা ইহার আকার প্রকার যারপরনাই বড়। যেখানে যেখানে শ্রেণী বিবাদ, ঘরোয়া কামড়াকামড়ি এবং বিদেশী হুমুনের আওতা কম,—যথা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অঞ্চলে,—সেখানে রাষ্ট্রের দণ্ড-কেন্দ্র বিশেষ নগণ্য।

কিন্তু বর্তমান ইয়োরোপে দেখিতে পাই বিপরীত অবস্থা। আন্তর্জাতিক লড়াই এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ ইয়োরোপের প্রায় রাষ্ট্র-জীবনে এত বেশি যে এখানকার দেশগুলার পুলিশ পল্টনই রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গের বড় তথ্য। সমাজ এই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় দণ্ডকর্মতার বশে জর্জরিত।

(৪)

“সমাজে” ও “রাষ্ট্রে” যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইতেছে গোষ্ঠী ধর্মের আয়োজনে সে সব লক্ষ্য করা অসম্ভব। কেননা সে ব্যবস্থায় সমাজই সব। বস্তুতঃ রাষ্ট্র তখন জন্মেই নাই। আর একটা প্রভেদও অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলোকে বজায় রাখিবার জন্য খরচপত্র আবশ্যিক। এইগুলো তোলা হয় জনগণের নিকট হইতে ট্যাক্স বা খাজনা আকারে। “উৎকর্ষের” যুগ যেমন যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তেমন তেমন এই সব রাষ্ট্রীয় আদায়ের সীমানাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমে খাজনা মাত্রে আর সানায় নাই। ভবিষ্যৎ সমাজের উপর চাহিদা চালাইতেও বর্তমান সমাজ শিথিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সরকারী ঋণ লইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কি ট্যাক্স, কি ঋণ এই সব গোষ্ঠী-ধর্মের অবিদিত।

রাষ্ট্র সমাজ হইতে নানা উপায়ে এবং নানা দিকে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রে সমাজে পার্থক্যটা লোক চক্ষুর পক্ষে সহজ করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র একটা ফিকিরও চুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। গোষ্ঠীর আমলে ছিল সার্বজনিক-জীবন-কেন্দ্রগুলো নগরকারীর প্রকার পাত্র। লোকে লোকে উনিশ বিশ করা দরকার হইত না। কিন্তু রাষ্ট্রের আমলে সরকারী কর্মচারীরা

“বার্কার” জীবন ও “উৎকর্ষ” ২৩৩

ব্যক্তিগত হিসাবে সমাজের নিকট বিশিষ্ট রূপে সম্মান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রে সভাপতিকে অন্তান্ত সরকারী কর্মচারী হইতেও অতিমাত্রায় বেশি পদযোগ্যরূপে ইচ্ছা দেওয়া হইয়াছে। এমন কি রাষ্ট্রীয় সভ্যতার বিধানে পুলিশ বিভাগের নিম্নতম পেয়াদা, দফাদার বা বরকন্দাজও গোষ্ঠী-সভ্যতার সকল শাসন কেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি এক্টিয়ারই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মজার কথা এই যে, গোষ্ঠী-কেন্দ্রের নিম্নতম জননায়কও আজকালকার উচ্চতম সরকারী কর্মচারী বা রাজরাজড়া অপেক্ষা সমাজের আন্তরিক ভক্তি বেশিই পাইত। গোষ্ঠীর কর্মচারীরা ছিল “সমাজের” ভিতরকার, সমাজের “আপন” লোক। আর রাষ্ট্রের কর্মচারীরা সমাজের বাহিরকার সমাজের উপরকার পাহারাওয়াল। বিশেষ।

অসাম্য ও ধন-ভ্রমের ইতিহাস

যাহাহউক, শ্রেণী-বিবাদ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু যে সময়ে এই বিবাদ চলিতেছিল সেই সময়েই বিবাদের ভিতর হইতে ইহার জন্মে ঘটে। কাজেই রাষ্ট্রটা সমাজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আর্থিক শ্রেণীরই কর্মক্ষেত্র। আর্থিক ক্ষমতার জোরে এই শ্রেণী রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল প্রভাব এক্কেটিয়া করিয়া বসে। কাজেই রাষ্ট্রকেন্দ্র ধনবানের যথেষ্ট লীলার এবং নির্ধনের নির্ধ্যাতন ভোগের যন্ত্রমাত্র রূপে দেখা দেয়।

প্রাচীন ইয়োরোপের রাষ্ট্র ছিল গোলাম মালিকদের জীবন কেন্দ্র। গোলামগুলোকে স্ববশে রাখা ছিল এই কুলীনদের উদ্দেশ্য।

২৯৪ পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

সেই রাষ্ট্রে গোলামদিগকে নিপীড়ন এবং শোষণ করিবার কন্দিট মূর্ত্তি পাইয়াছিল।

মধ্য যুগের রাষ্ট্র ছিল জমিদার নামক কুলীনদের লীলাক্ষেত্র। ভূমি-গোলাম এবং অস্বাধীন ছোটখাটো কৃষাণদের নিষ্পেষণ ছিল এই রাষ্ট্রের স্বধর্ম।

বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্র অল্প এক শ্রেণীর কুলীনদের নবাবী সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে প্রতিনিধি-তন্ত্র বলে। আসল কথা এই জীবনকেন্দ্রে পূঁজিপতিরা শ্রমজীবীদিগকে শাসন-শোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে মাত্র।

কোনো কোনো যুগে লড়াই-শীল শ্রেণীগুলি ক্ষমতায় প্রায় সমান সমান। সেই অবস্থায় রাষ্ট্র কেন্দ্র এই সকলের ভিতর মধ্যস্থতা করিতে গিয়া কোনো একদিকে চলিয়া পড়িতে বাধ্য হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অনেকটা নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইয়োরোপের সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দৃশ্য দেখা গিয়াছে। তখনকার দিনে জমিদার এবং নগর জীবনের মাতঙ্গর স্থানীয় লোকেরা প্রায় সমান সমান ছিল। এই দুই শ্রেণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাইয়া সে যুগের নরপতিরা নিজ এক্তিয়ার বাড়াইতে সমর্থ হইত। এ অবস্থা আবার “যথেষ্ট” ডেম্পটিজম বা একচ্ছত্র রাজত্বের যুগ।

নেপোলিয়ানও এই নীতির মর্ম বোধ করিতেন। নগরের মাতঙ্গরদিগকে মজুরদের বিরুদ্ধে খেলাইতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। সেদিনকার তৃতীয় নেপোলিয়নও “বুজের্‌আ” “প্রোলেটারিয়াট” এই দুই শ্রেণীর “ভদ্র” ইতরের “মেড়ার লড়াই” হইতে মুনাকা উঠাইতে সচেষ্ট ছিলেন।

আজকালকার জাম্মানিতে সেই যথেষ্টাচারশীল একচ্ছত্র রাজত্ব নীতিরই জের চলিতেছে। পুঁজিপতি এবং মজুর এই দুই শ্রেণীকৃত বিস্মার্কের রাষ্ট্র পরম্পরের বিরুদ্ধে খেলাইয়া রাজশক্তিকে ফুলাইয়া তুলিতেছে। ফলতঃ দুই শ্রেণীকেই ঠকাইয়া প্রশিয়ার “যুকার” জমিদারগুলা নিজেদের গহিত ভুঁড়ি মোটা করিতে করিতে গোঁফে চাড়া মারিতে সমর্থ হইতেছে। এ এক অতি লজ্জাজনক দৃশ্য।

হুনিয়ার সকল রাষ্ট্রেই ধনদৌলতের পরিমাণ হিসাবে জনগণের দাবীদাওয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা পনহীনদিগের হিংসা ও আক্রমণ হইতে ধনবানদিগকে বাঁচাইবার জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম। আথেন্স এবং রোম উভয় রাষ্ট্রেই আয় হিসাবে জনগণকে শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত। মধ্য যুগের রাষ্ট্রেও জমিদারীর পরিমাণ যাহাদের বেশি তাহারাই কর্তামি করিতে পারিত। বর্তমান যুগের প্রতিনিধি-তন্ত্রেও পয়সার জোর যাহাদের তাহারাই ভোট দেয় এবং প্রতিনিধি হয়।

কিন্তু ধনদৌলতের অসাম্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। এই অসাম্য খোলাখুলি স্বীকার না করিলেও চলিতে পারে। বস্তুতঃ নেহাৎ শিশু বা অবনত বা উদীয়মান রাষ্ট্রেই এই আর্থিক তারতম্য শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগির কারণ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। উচ্চতম পরিণতিশীল রাষ্ট্রে আর্থিক অসাম্য সম্বন্ধে কোনো প্রকার আলোচনাই করা হয় না।

তথ্য-কথিত গণ-তন্ত্র

বর্তমান যুগের গণ-তন্ত্রের আইনকাহ্নে প্রকাশ্য রূপে সম্পত্তি বিষয়ক ছোট বড় প্রভেদ স্বীকার করা হয় না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। আইনের চোখে ধনদৌলতের প্রভাব অবজ্ঞেয় কিন্তু ভিতরকার কথা এই যে, এই ধরনের তথ্যকথিত সাম্যনীতির আওতায় চলিতেছে “ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ”। ধনদৌলতের দৌরাভা এই আওতায়ই অতি নির্বিবাদে এবং প্রবলভাবে রাজত্ব করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র একটা নবীনতম সাম্যশীল গণ-তন্ত্রের চরম দৃষ্টান্ত। এখানে প্রায় সকলেই ভোট দিতে অধিকারী একথা স্বীকার করা চলে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মজুর নিগ্রো এবং দরিদ্র লোকেরা এই একুতিয়ার ভোগ করিতে অসমর্থ। তাহা সত্ত্বেও “সার্বজনীন বাছাই” নীতির আমল ইয়াকি মুহূর্তে চলিতেছে বলিতেই হইবে।

কিন্তু পয়সাওয়ালাদের প্রভাব এখানে কম কি? সরকারী কর্মচারীদিগকে ঘুষ দিয়া করানো যায় না এমন কোনো কাজ এদেশে নাই। অধিকন্তু পয়সাওয়ালার লোকেরা সজ্জবদ্ধভাবে ব্যাঙ্ক হিসাবে গবর্নমেন্টকে উঠিতে বসিতে স্ববশে রাখে। গবর্নমেন্ট সরকারী কাজের জন্য টাকা কজ্জ লইতে বাধ্য। দেশের রেলপথগুলো এবং বড় বড় শিল্প কারখানা ও কৃষিক্ষেত্র সমূহও ধনপতিদের আড্ডা ব্যাঙ্কের শাসনে চলিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা “ষ্টক এক্সচেঞ্জ” নামক মাল ও টাকার বাজারে ফল টিপিয়া গোটা দেশকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্নমেন্টকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়ে।

সরকারের উপর ব্যাকের অত্যাচার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন, ক্রান্তি-
তেমন, এমন কি নবীন ছনিয়ার সর্ব প্রাচীন গণ-তন্ত্র হুইট-
জারল্যান্ডেও তেমন অর্থাৎ গবর্মেণ্টে আর ধনদৌলতওয়ালার
শ্রেণীতে গলায় গলায় ভাব জগতের সকল “সাম্যনীতি” প্রবর্তিত
রিপাবলিকে চলিতেছে। তাহা ছাড়া কি ইংল্যান্ড, কি জার্মান
সকল রাজতন্ত্র শাসিত দেশেও রাষ্ট্রের উপর ব্যাক এবং ষ্টক
এক্সচেঞ্জের প্রভাব সুবিদিত। অর্থাৎ “সার্বজনীন বাছাই”
অর্থাৎ ধনদৌলতের কথা মুখে না আনিয়া রাষ্ট্র শাসনে অধিকার
দেওয়ার নীতি এই পাঁচ দেশেই কম বেশি সমানভাবে প্রচলিত।

“সার্বজনীন বাছাই” নীতির ফলে রাষ্ট্রে সাম্য আসিয়াছে
কি? একদম না। ধনদৌলতওয়ালারাই রাষ্ট্রের উপর মোড়লি
করিতেছে। নিধন মজুরেরা ধনপতিদের নেজুর রূপে কোনো
মতে জীবন ধারণ করিয়া চলিতেছে। আর্থিক স্বাধীনতা
যতদিন ইহাদের ভাগ্যে না জুটে ততদিন এই সকল নির্যাতিত
লক্ষ লক্ষ নরনারী বর্তমান অবস্থাকে সনাতন রূপেই স্বীকার
করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু যেই ইহারা আর্থিক
স্বরাজ লাভ করিবে তখনই ইহারা ধনপতিদের আওতা ছাড়াইয়া
নিজেদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দল কায়েম করিয়া বসিবে
এই দলই মজুর-নায়কদিগকে রাষ্ট্রশাসনে নিজেদের প্রতিনিধি
স্বরূপ মোতামেন রাখিতে অভ্যস্ত হইবে।

আর্থিক স্বাধীনতার যুগ

“সার্বজনীন বাছাই”এর ফলে একদিন সমাজ চরমে আসিয়া
ঠেকিবে। আত্মবিধ্বাসশীল মজুর-নায়কেরা যেদিন পুঁজি-

পতিদের সামনাসামনি দাঁড়াইয়া তথাকথিত সাম্যনীতিকে কাজে পরিণত করাইতে অগ্রসর হইবে সেইদিন রাষ্ট্রীয় জীবনের তাপমান যত্ন জল ফুটাইবার মাত্রায় আসিয়া হাজির হইবে। তখন শ্রমজীবী এবং ধনজীবী উভয়েই নিজ নিজ কর্তব্য ঠাওরাইতে পারিবে।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানটা মানবজাতির পক্ষে একটা অনাদি সনাতন বস্তু নয়। রাষ্ট্রহীন সমাজ ছনিয়ায় ছিল অনেক। সমাজে শ্রেণী ভেদ বা মাৎস্যহ্যায় হুকু হইবার ফলে ক্রমে এই শাসন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে ছনিয়ায় এক নবীন অবস্থা। আজকালকার দিনে শ্রেণী ভেদ থাকার কোনো প্রয়োজনই নাই। আর্থিক সুখস্বচ্ছন্দতার উপায় সৃষ্টি করিবার পক্ষে এক কথায় ধনোৎপাদনের পক্ষে আজকাল শ্রেণী-বিভাগ একটা অন্তরায় বিশেষ। কাজেই শ্রেণীগুলো একদিন উঠিয়া যাইবে। কাজেই শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে যে রাষ্ট্র কায়ম হইয়াছে তাহার আয়ুও ফুরাইয়া আসিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র অনাদিও নয় অনন্তও নয়।

ধনোৎপাদনকারীরা আবার সমান ও স্বাধীনভাবে সম্মুখ হইতে থাকিবে। এই ধরণের ধন-সৃষ্টির যুগে রাষ্ট্র “পটল তুলিবে”। সূতা কাটার চরুখা এবং পিতলের কুড়াল যেমন আজকাল কেবলমাত্র মাস্কাতার আমলের সামগ্রীরূপে প্রত্ন-তত্ত্বের সংগ্রহালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় রাষ্ট্রও সেইরূপ পুরাতত্ত্বের অমুসন্ধানকারীদের গবেষণার সামগ্রী মাত্র থাকিবে। রাষ্ট্রকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়া “উৎকর্ষ” বা সিভিলিজেশানের যুগও মানব-সমাজ হইতে বিদায় লইবে।

“উৎকর্ষ”র ধন-নীতি

“উৎকর্ষ”র যুগে মাল তৈয়ারী হইতে সুরু করিয়াছে ধনোৎপাদনকারীদের স্বভোগের জন্ত নয়,—বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বাজারে অদলবদলের জন্ত। পূর্ববর্তী সকল যুগে ধন-স্রষ্টারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ তৈয়ারী মালের শেষভাগ পর্যন্ত দেখিতে পাইত। “উৎকর্ষ”র যুগে স্রষ্টায় ভোক্তায় ভেদ কায়েম করিয়াছে। শ্রমবিভাগ এবং বিনিময় এই আমলের প্রধান আর্থিক তথ্য।

কোথায় সেকালের যৌথ-সৃষ্টি এবং যৌথ-ভোগ আর কোথায় একালের মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত মধ্যস্বরূপ-বণিক-নিয়ন্ত্রিত, আমদানি-রপ্তানি-প্রাণ, কেনাবেচা-ধর্মী বিনিময়ের বাজার। আজকালকার স্রষ্টারা জানে না কেনই বা মাল তৈয়ারী হইতেছে, কোথায়ই বা মাল যাইতেছে। কেনই বা অমুক পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইতেছে। ধনের উৎপাদন স্রষ্টাদের তরফ হইতে একদম অনিশ্চিত দৈবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল দৈবকে বশে আনিতে শিক্ষা করা “উৎকর্ষ”র যুগের নরনারীর পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। বর্তমান জগৎ অগ্ন্যাগ্ন কর্মক্ষেত্রের “দৈব” বিষয়ক গতিবিধি আটিয়া উঠিতে পারিয়াছে। কিন্তু ধন-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে দৈব চলিতেছে তাহার কিনারা করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। মাঝে মাঝে আর্থিক “হুয়োগ” ঘটিয়া মানব সমাজকে দৈবশক্তিটা কাণে ধরিয়া দেখাইয়া দেয় মাত্র।

“উৎকর্ষ”র যুগে আর একটা বড় কথা মাহুষ বিনিময়। বিনিময় প্রথার সাহায্যে মালে মালে অদলবদল প্রথম সুরু হয়। কিন্তু অল্পকালের ভিতরই মাহুষের বদলে মাহুষ অথবা ধন

সম্পত্তি অদলবদল হইতে থাকে। অর্থাৎ মানুষই মালের শ্রেণীতে পরিণত হয়। দাসত্ব বা গোলামী-প্রথা মানুষ সেবক হিসাবে জ্ঞানোত্তর বা যন্ত্রপাতি মাত্র।

দাসত্ব-প্রথা “উৎকর্ষের” যুগে নির্ধ্যাতনকারী কুলীন এবং নির্ধ্যাতিত পেরিয়া এই দুই শ্রেণী সৃষ্টি করে। প্রাচীন ইয়োরোপে এই ধরনের শাসনশোষণ পুরা মাত্রায় দেখা গিয়াছে। সেই শ্রেণী-নির্ধ্যাতন মধ্যযুগে দেখা গিয়াছে জমিদার আর “সাক” বা ভূমি-গোলামের সম্বন্ধে। বর্তমান যুগে সেই গোলামীই চলিতেছে মজুরদের জীবনে। বর্তমান জগতের গোলামীটা প্রকাশ্য নয়। কিন্তু গোটা “উৎকর্ষের” যুগ ভরিয়াই নানারূপে বহু সংখ্যক মানুষ মালমাত্ররূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

মুক্তা, বণিক, নিজস্ব এবং গোলামী এই চার তথ্য বিনিময় মূলক “উৎকর্ষ-সভ্যতা”র আর্থিক ভিত্তি। ইহার সামাজিক ভিত্তি হইতেছে এক-পত্নী-পতিত্ব এবং নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য। এইরূপ ধন-জন-কেন্দ্রের শাসন যন্ত্রকে বলে রাষ্ট্র। এই যন্ত্রে ধনহীন নরনারী ধনবানদের কর্তৃক নির্ধ্যাতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নগর জীবন মফঃস্বলকে ছাপাইয়া উঠে।

এই সকল কথার সঙ্গে “উৎকর্ষের” আর একটা লক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। সে মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগবাটোআরা কিরূপ হইবে সেই বিষয়ে সম্পত্তিশালী ব্যক্তির উইল করিয়া যাইবার ক্ষমতা। গ্রীসে সোলোনের আমল পর্যন্ত এই ক্ষমতা দেখা যায় নাই। কিন্তু রোমের উইল করার প্রথা অতি প্রাচীন কালেই বিকশিত হইয়াছিল। জার্মান সমাজতত্ত্ববিৎ লাসাল

বলেন যে, রোমানরা চিরকালই উইল প্রথা চালাইয়া আসিয়াছে। উইলহীন যুগ রোমাণ সমাজে কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু লাসালের এই মত স্বীকার করিবার স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি নাই। তিনি হেগেলপন্থী দার্শনিক! খাটি নিরেট তথ্যের উপর ভর না করিয়া লাসাল একমাত্র উইল প্রথার “দার্শনিক” ভিত্তি হইতে সুপ্রাচীন কালেও ইহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। যাহা হউক উইল করার ক্ষমতা রোমে “উৎকর্ষে”র যুগের এক প্রধান ক্ষমতা।

জার্মাণ সমাজে উইল করা সুরু হয় পুরোহিতদের প্ররোচনায়। ধর্মভীরু জার্মাণ যাহাতে নিজ নিজ সম্পত্তি “দেবোত্তর” রূপে গির্জার হাতে দান করিয়া যাইতে পারে সেদিকে ধর্মগুরুদের নজর বেশ তীক্ষ্ণই ছিল।

“উৎকর্ষে”র যুগ প্রথম হইতেই মানুষের অতি জঘন্য পাশবিক বৃত্তিকেই প্রোথ্রয় দিয়াছে। মানুষের সুপ্রবৃত্তিগুলোকে দাবিয়া রাখিয়া ধনলিপ্সা, স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজের পেট মোটা করার দিকে “উৎকর্ষ-সভ্যতা” নরনারীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। এই যুগের মূলমন্ত্র প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত এক :—ধনদৌলত ধনদৌলত ধনদৌলতই জীবনের একমাত্র সার। আবার এই ধনদৌলতও সমাজের, জাতির বা দেশের ধনদৌলত নয়, একমাত্র নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া অত্ন কিছু “উৎকর্ষে”র যুগে লোকেরা চিন্তা করিতে পারে না।

আধুনিক সভ্যতার সু-কু

তাহা সত্ত্বেও জগতে বিজ্ঞান এবং শিল্পের বিকাশ যুগে যুগে

ঘটিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, ধনদৌলতওয়ালা স্বার্থান্ধ পিশাচেরা এইগুলো দিয়া নিজেরদের পাশবিক ও গর্হিত চরিত্র ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ধনবানদের পক্ষে আত্মসম্মতিরই এক কৌশল বিশেষ।

ধনোৎপাদনের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির প্রভাবে অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। “উৎকর্ষ”র যুগে এই অঘটনগুলো মানব বিকাশের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সব তথ্য মানবজীবনে উন্নতিরই সাক্ষী। কিন্তু এই সকল উন্নতির অপর পিঠে কি দেখিতে পাই? ধনহীন নির্যাতিত নরনারীর ক্রমিক অধোগতি। সম্পত্তিশালী লোকেরাই ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে। তাহারা গুণ্ঠিতে নগণ্য। কিন্তু ক্রোর ক্রোর নরনারীর ক্রন্দন এই উন্নতিশীল “উৎকর্ষ”র যুগে জগতের আকাশ ছাইয়া রাখিয়াছে।

ফলতঃ একশ্রেণীর লোকের যেখানে পোষ মাস অপর শ্রেণীর লোকের পক্ষে সেখানে সর্বনাশ। একের স্বাধীনতায় অপরের পরাধীনতা ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গেসঙ্গেই কোনো না কোনো কেন্দ্রে অবনতি ঘর করিয়া বসিতেছে। শিল্পকর্মে বহুপাতি কায়েম হইবার ফলে জগতের ধনসম্পদ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। মানবজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বাড়াইবার উপায় শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সমাজের অতি নগণ্য সংখ্যক লোকই সেই সকল সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছে। একথা কাহারও অজানা নাই।

“বার্কার”-সভ্যতার আমলে কর্তব্য ও অধিকার নামক দুইটা স্বতন্ত্র বাস্তব জ্ঞান নরনারী মহলে প্রচলিত ছিল না। “উৎকর্ষ”-

সভ্যতার বিধানে এই দুই বস্তু স্বতন্ত্ররূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু কর্তব্যগুণা জুটিয়াছে এক শ্রেণীর লোকের কপালে আর অধিকার ভোগ ঘটিতেছে আর এক শ্রেণীর ভাগ্যে। নেহাৎ আনাড়ি লোকও এই প্রভেদ মর্মে মর্মে বুঝিতেছে।

কিন্তু এই সকল প্রভেদের কথা সাধারণ্যে স্বীকৃত হয় না। শাসক সম্প্রদায় ধনপতি-শ্রেণী জন-নায়েকের দল বা “ভদ্র লোকের সমাজ” ইত্যাদির পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহাই গোটা দেশের পক্ষে বা জাতির পক্ষেও অমঙ্গলকর এই ধরনের মত প্রচার করা বাজারের দস্তুর। খাঁটি সত্য চোখ খুলিয়া দেখিবার সাহস প্রায় লোকেরই নাই।

“উৎকর্ষ”-সভ্যতা যেমন যেমন বাড়িতেছে মিথ্যা যুক্তি এবং কুসংস্কারগুলাও তেমন তেমন প্রসার লাভ করিতেছে। এ যুগের “কু” গুণা হয় কিছু কিছু দানখয়রাতির সাহায্যে ধামাচাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইতেছে। অথবা বর্তমান জগতে কোনো প্রকার অত্যাচার দুর্নীতি, পরনিপীড়ন, গোলামনির্যাতন বা দরিদ্রনিপীড়ন চলিতেছেই না এইরূপ বুঝিবার এবং বুঝাইবার লোকও সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পরাধীন, গোলাম ও অগ্নাগ্ন নির্যাতিত নরনারীদিগের মঙ্গলের জন্তই শাসক সম্প্রদায়, শোষক সম্প্রদায়, পুঁজিপতি সম্প্রদায়, মনিব সম্প্রদায় তাহাদের শাসন শোষণ নীতি চালাইতেছে, এই মত পণ্ডিত মহলে এবং বাবু সমাজে এক প্রকার অ, আ, ক, খ স্বরূপ। এই অবস্থায় যদি পরাধীন, গোলাম এবং অগ্নাগ্ন নির্যাতিত জাতিরা বিদ্রোহী হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি রূপে গালি দেওয়া সকল ভদ্রলোক এবং শাসক নরনারীর স্বধর্ম।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ

ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ ফুরিয়ে, “উৎকর্ষ”-সভ্যতার কু-গুণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতগুলা মর্গ্যান এবং মার্ক্সের মতের সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা করিলে বর্তমান গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলা আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। তাঁহার কথায় “উৎকর্ষ”-সভ্যতায় নিধনের বিরুদ্ধে ধনীর লড়াই প্রধান তথ্য। এই যুগে এক-পক্ষী-পতিত্বের পরিবার এমং জমিজমায় নিজস্ব প্রথা মানব-সমাজের বিশেষত্ব। পরিবারগুলাকে পরস্পর স্বাধীন এবং স্ব স্ব প্রধান করিয়া দিয়া মানব-সমাজ জগতে শ্রেণীবিবাদ, জনগণের মাংশ্রান্তায় ও খাওয়াখাওয়ি সৃষ্টি করিয়াছে। জীবন-কেন্দ্র রচনায় এরূপ অনর্থ ঘটানো যৌথ-সম্পত্তি-মূলক “বার্কার” সভ্যতার ধাতের বিপরীত।

এইবার মর্গ্যানের কথায় গ্রন্থ শেষ করা যাউক। মর্গ্যান বলিতেছেন:—“উৎকর্ষের” যুগ শুরু হওয়া অবধি সম্পত্তি বিপুলায়-তন হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন সম্পত্তির বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা বাড়িয়া গিয়াছে। ধনবানরা নিজেদের স্বার্থে ধনদৌলত সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করিবার পক্ষে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ফলতঃ জনসাধারণ এই ধন-শক্তির চাপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মানবজাতি তাহার নিজ সৃষ্টিরই সম্মুখে নিজেকে হতস্বস্ত দেখিতে বাধ্য হইতেছে।

“কিন্তু মানব চিন্তের উপর ধনদৌলতের প্রভাব চিরকাল এইরূপ থাকিবে না। মানুষ নিজ বুদ্ধি খাটাইয়া ধনদৌলতকে স্বল্পে আনিতে সক্ষম হইবে। ধনদৌলতও উহাদিগকে রাষ্ট্র কি

কি উপায়ে কাবু করিবে, ধনদৌলতওয়ালারা সমাজের প্রতি কোন কোন বিষয়ে জ্ঞানী এই সকল কথা আলোচনা করিয়া বাহির করা মানবজাতির পক্ষে সম্ভবপর হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সমাজগত স্বার্থ বড় এই কথা মনে রাখিয়া সমাজে ও ব্যক্তিতে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় মানব চিন্তা কার্য্যকরী হইবে।

“সম্পত্তি ভোগের জীবনলীলাই মানবজীবনের চরম কথা নয়। অতীতে মানব সমাজ যে সকল উন্নতি দেখাইয়াছে সেই সকল উন্নতিই যদি ভবিষ্যতেও বাড়াইয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে সম্পত্তি ভোগের অতিরিক্ত অনেক কিছু মানবজাতিকে দেখাইতেই হইবে। সেই যুগ আসিতেছে। “উৎকর্ষ-সভ্যতার” জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত মানব সমাজের যে কয় শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে তাহা মানবেতিহাসের প্রাচীন কালের তুলনায় অতি নগণ্য। ভবিষ্যতে যে সকল যুগ আসিবে তাহার তুলনায়ও এই শতাব্দীগুলো এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

“সম্পত্তি ভোগমূলক সভ্যতার স্তর সমাজকে ভাঙনের দিকে লইয়া যাইতেছে। মানবজীবন এক উন্নততর কোঠায় পা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সেই কোঠায় দেখা দিবে শাসনে স্বরাজ, সমাজে ভ্রাতৃত্ব, দাবীদাওয়ায় সমতা এবং শিক্ষায় সার্বজনীন অধিকার। অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞা বুদ্ধি এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশের ফলে মানবজাতি এই যে এক যুগান্তর ঘটাইয়া তুলিতেছে সেই যুগান্তর প্রবর্ত্তিত সমাজে “বার্কার”-সভ্যতার গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব এক উচ্চতর আকারে দেখিতে পাইব।”

